



১৯৭১

ইতিহাস



সম্পাদক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক :

শ্রী রামশচন্দ্র মজুমদার

শ্রী নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

৪৭-এ, একডালিয়া রোড :: কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
কর্মকর্তামণ্ডলী

সভাপতি

শ্রী স্বরেন্দ্রনাথ সেন

সহ-সভাপতি

শ্রী ইন্দুব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী সুশোভন সরকার

কর্মসচিব

শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ-কর্মসচিব

শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রী অরুণকুমার দাসগুপ্ত

কোষাধ্যক্ষ

শ্রী শিবপদ সেন

P29216

৭০৫
১৫৬

১-৭

ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড

৫৫০০৩

১৩৬১-৬২

বার্ষিক নৃচী

ইতিহাসের রীতি	১৪১
অকুলচন্দ্র গুপ্ত	
ইবনবতুতার ভারতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত	২৩৪
ডাঃ মহদী হুসেন	
ইসলামিক ইতিহাস চর্চায় নবজাগরণ	৭৩
আচার্য যদুনাথ সরকার	
উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু-নবজাগরণ	৫০
অমিত্যভ যুথোপাধ্যায়	
ঐতিহাসিক ননীগোপাল বজ্রমল্লার	৬
চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত	
ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত	১৫৭
ভড়িংকুমার যুথোপাধ্যায়	
শৈব-সংস্কৃতির কয়েকটি দিক	৮২
কমলেশ্বর ভট্টাচার্য	
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসান	১
দীনেশচন্দ্র সরকার	
গোড়কবি ত্রিহর্ষ	১২৩
মলিনীনাথ দাশগুপ্ত	

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস

অষ্টাদশ অধিবেশন

এবংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনে ৩০শে ডিসেম্বর—১লা জানুয়ারী ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সভ্যদের সম্বর্ধনা জানাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিঙ্হাস্ত্র।

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সর্দার কে. এম. পানিক্কার। বিভিন্ন যুগশাখায় সভাপতিত্ব করবেন যথাক্রমে ডাঃ এইচ. ডি. সাহালিয়া (প্রাচীন যুগ ১ম); ডাঃ রাজাবলী পাণ্ডে (প্রাচীন যুগ ২য়); শ্রী এন. এস. বেস্ট্রে (মধ্যযুগ ১ম); ডাঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার (মধ্যযুগ ২য়); অধ্যাপক আর. ভি. ওতুরকর (আধুনিক কাল)।

সেনেট হলে একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর (প্রাচীন শিল্প নিদর্শন, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় প্রদর্শনীটি সাধারণ দর্শকদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হবে।

কংগ্রেসে যোগদান করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তিই সম্বর্ধনা সমিতির সভ্য হতে পারেন। সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবপদ সেন, ৫৫এ মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-২৯ এই ঠিকানায় চাঁদা পাঠিয়ে দিলেই সভ্য করে নেয়া হবে। কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মসচিব (Local Secretary, Indian History Congress) আশুতোষ বিন্দিং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র দিলেই অধিবেশন সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ জানা যাবে।

অনেকের স্মরণ থাকতে পারে ১৯০৯ সালে কলিকাতায় ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজ বোলো বৎসর পরে আবার সেইখানে অষ্টাদশ অধিবেশন বসছে। অধিবেশন যাতে বেশ স্রুষ্কভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য বাংলার ইতিহাসস্নহরাঙ্গী ব্যক্তি মাত্রেয়ই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

জাভিলের ভারত-স্থিতি	২৬
চতিকাশ্রমার বন্দোবস্ত	
জাতীয় আন্দোলনে অগ্রবৃগের ভূমিকা	১২২
নীতীশ সেনগুপ্ত	
ভবুবোহিনী সভা ও দেবেশ্রনাথ ঠাকুর	৩১, ১৬৪, ২৪২
দিলীপকুমার বিশ্বাস	
দিগ্‌দর্শন পত্রিকা	২০
ভবতোষ দত্ত	
দেবী চন্দ্রগুপ্ত	২০৩
বিক্রমদত্ত ভট্টাচার্য	
পুস্তক পরিচয়	৬২, ১৯৮
প্রাচীন কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম	২২৬
কমলেশ্বর ভট্টাচার্য	
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ	৭০
বাংলার ঐতিহাসিক দলিলপত্র	৬৪
নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ	
বাংলায় ইতিহাস রচনার আদিবৃগ	৬১
মনোবোহন ঘোষ	
মেদিনীপুরের লবণ শিল্প	১৮০
রসালিৎ গুহ	
সোভিয়েত-এ ভারতীয় ইতিহাস চর্চা	২৬২
স্বদেশতোষ বগল	
হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস	১০৪
অমলেন্দ্র ত্রিপাঠি	

ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড]

ভাদ্র—কার্তিক ১৩৬১

[প্রথম সংখ্যা]

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসান

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সমাপ্তির দিকে উত্তর ভারতের বিরাট অঞ্চল-
ব্যাপী বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। মধ্যপ্রদেশের সাগর
জেলায় অন্তর্গত এরণ গ্রামে প্রাপ্ত ১৬৫ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের
একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে পূর্ব মালবে গুপ্তবংশীয়
সম্রাট বৃহৎপ্তের (৪৭৭-৯৫ খ্রিঃ) অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু এই স্থানে
প্রাপ্ত অপর একখানি লিপিতে দেখা যায়, বৃহৎপ্তের পরেই ষষ্ঠ শতাব্দীর
মুচনার দিকে উক্ত অঞ্চলে হুণরাজ তোরমানের (আনুমানিক ৫০০-১৫ খ্রিঃ)
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লিপিতে তোরমানের রাজত্বের প্রথম বর্ষের
তারিখ উল্লিখিত আছে। আবার তোরমানের পুত্র মিহিরকুলের (আঃ ৫১৫-
৩৫ খ্রিঃ) পঞ্চদশ রাজ্যবর্ষের একখানি লিলালিপি গোয়ালিয়ারে পাওয়া
গিয়াছে। এই সময়ে পশ্চিম মালব হইতেও গুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাদ্রগুপ্তের রাজত্বকালীন ১৯১ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ
৫১০ খ্রীষ্টাব্দের এরণ লিপি হইতে জানিতে পারি, গুপ্তবংশীয়েরা পূর্ব মালব
কিংবা উহার কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু
পশ্চিম মালবে গুপ্ত-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়
পাদে এই অঞ্চলে ঐলিকর বংশীয় যশোধর্মার (আঃ ৫১৫-৩৫ খ্রিঃ) স্বাধীন

রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যশোধর্ম্ম দাবী করিতেন যে, গুপ্ত এবং হুনবংশীয় সম্রাটেরা যে সকল অঞ্চল অধিকার করিতে পারে নাই, উভাতেও তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে পূর্ব মালবের তথাকথিত উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহারা প্রথমে গুপ্ত সম্রাটগণের সামন্ত ছিলেন; পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কাঠিয়াবাদের মৈত্রকবংশীয় বলভীরাজগণ ১৮৩ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তসম্রাটদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন বলিয়া বোধ হয়; ক্রমে তাঁহারাও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অঙ্গ হইতে পশ্চিমভারতীয় অঞ্চলগুলি এইরূপে বিচ্যুত হইয়া যায়।

যে সকল সামন্ত বংশের অত্যাখানের ফলে পরাক্রান্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন ঘনাইয়া আসিতেছিল, তদ্ব্যতীত পূর্ব মালবের উত্তরকালীন গুপ্তগণ ব্যতীত বিহার ও উত্তর প্রদেশের মোখরি বংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার গোড়জাতি সম্রাটেরা উল্লেখযোগ্য। মোখরির প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বাস করিত। তাঁহাদের মধ্যে ঈশানবর্ম্ম সর্বপ্রথম স্বাধীন নরপতি। উত্তর প্রদেশের জৈনপুরে এবং বড়ো বাকী জেলার অন্তর্গত ভরাহাগ্রামে তাঁহার লিপি পাওয়া গিয়াছে। ভরাহা লিপি হইতে জানা যায় যে, ৬১১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মোখরি ঈশানবর্ম্ম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে উত্তর প্রদেশ হইতে গুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিহার অর্থাৎ গুপ্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের চতুর্দিকস্থিত অঞ্চল ঈশানবর্ম্মর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তবে দেওবরনাক গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপিতে দেখা যায়, বিহারের শাণাবাদ জেলা ঈশানবর্ম্মর পুত্র সর্ববর্ম্ম এবং পৌত্র অবন্তিবর্ম্মর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার দক্ষিণ কোশলের পাণ্ডুবংশীয় নরপতি শিবগুপ্তবালার্জুনের একখানি লিপিতে মোখরিরাজ ঈশানবর্ম্মর পুত্র নৃধ্যবর্ম্মকে মগধের আধিপত্যসম্বন্ধ বর্ম্মাদিগের বংশ-জ্ঞাত বলা হইয়াছে। নৃধ্যবর্ম্ম তদীয় পিতার সামন্ত মাত্র ছিলেন। সুতরাং ঈশানবর্ম্ম মগধ বা বিহারে মোখরি অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। গয়া জেলার অন্তর্গত অমৌবা গ্রামে মন্দননামক ঐনৈক সামন্তরাজের প্রদত্ত একখানি ভাস্কর্য্যসম পাওয়া গিয়াছে। উহার তারিখ ২৩২ গুপ্তাব্দ বা ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দ। আন্দ-

ধোর বিষয়, এতে শাসনে নন্দনের অধিবাসীর কোন উল্লেখ নাই। উভাতে মনে হয়, সেসময় মগধে গুপ্ত-অধিকার বিলোপ জনিত সাময়িক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

আমি পূর্বে মনে করিতাম, গোড়রাজগণই মগধ চট্টতে গুপ্ত অধিকার উৎখাত করিয়াছিলেন এবং পরে মোখরিতা উক্ত অঞ্চল চট্টতে গোড়দিগকে বিভাজিত করে। ইহার কারণ এই যে, তরাহা লিপিতে ইশানবর্ষার কীৰ্ত্তি-কলাপ বর্ণনার প্রসঙ্গে তৎকর্তৃক গোড়দিগকে পরাজিত করিবার উল্লেখ আছে, কিন্তু গুপ্ত সম্রাটের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কোন উল্লেখ নাই। আবার গোড় সিংহাসন অধিকারের পূর্বে শূদ্রপ্রসিদ্ধ শশাঙ্ক জনৈক গোড়েরই সামন্তরূপে কিয়ৎকাল বিহারের শাস্তাবান জেলা শাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রমাণাবলী চাইতে মনে হয়, বিহার হারাধিবার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত বাংলা এবং উড়িষ্যা গুপ্ত-অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। গোড়দিগের দ্বারা মগধ চট্টতে উৎখাত হইবার পর উভাদেরই বাসভূমিতে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা গুপ্তদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। তাই এখন আমার মনে হয়, মোখরিতা মগধ চট্টতে গুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত করিবার পর ঐ অঞ্চলে গোড়-রাজগণের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল।

জ্ঞানচন্দ্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ৭০৫ শকাব্দে অর্থাৎ ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জিনসেনের ত্রিবিংশপুরাণে উল্লিখিত একটি জৈন কিংবদন্তীর প্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই কিংবদন্তী অনুসারে :—

গুপ্তান্যস্ত শতদ্বয়মেকত্রিশেক বর্ষাণি

কালবিত্তিরুদাহৃতম্.....

অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ ২৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দেখাইয়াছিলেন যে, ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে (অথবা ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে) গুপ্তাব্দের আরম্ভ হইতে ২৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে (অথবা ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে) গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। মোখরিতা লিপিসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে অপর একটি বিষয়ের বিবেচনা প্রয়োজন।

২২৪ গুপ্তান্দ অর্থাৎ ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর বাংলায় গুপ্ত-অধিকার স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে; কিন্তু মোখরিরী উত্তর বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহার কোনট প্রমাণ নাই। বরং বাংলা দেশ হইতে গোড়রাই গুপ্ত অধিকার বিলোপ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যজ্ঞস্রীমূলকর হইতে জানিতে পারি, উত্তর বাংলার শাসনকেন্দ্র পৌণ্ডবর্ধন নগরে গোড়েশ্বর শাসকের অধিকার স্বীকৃত হইত। কথা এট যে, ঠিক একই সময়ে মোখরিরী বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এবং গোড়েরা বাংলায় গুপ্ত-অধিকার উচ্ছেদ করে, চলা বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ মোখরিরীজ টশানবর্ষ। স্বাধীন ভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিবার অনেক কাল পরেও উড়িষ্যা গুপ্ত-সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকৃত হইতে দেখা যায়। বিহার চারাইবার পর গুপ্তবংশীয়েরা সম্ভবতঃ বাংলাদেশ হইতেই উড়িষ্যার আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার অশুর্গত শুমণ্ডল গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায়, ১৫০ গুপ্তান্দ অর্থাৎ ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঞ্জাম অঞ্চলের অধিপতি গুপ্ত-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই প্রসঙ্গে অপর একটি জৈন কিংবদন্তীর প্রতি আমরা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

জদি-বসন্ত বা যতি বৃগভের তিলোয়পন্নসি বা ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তিসংজ্ঞক একখানি জৈন গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। জীযুক্ত হীরালাল জৈন এবং আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যয়ে গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের একটি গাথায় বলা হইয়াছে :—

ততো গুতা ভাণং রজ্জ দোণি সয়াণি ইগিতীস।

অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা ২৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কিংবদন্তীটি জৈন হরিবংশের পূর্বোক্ত কিংবদন্তীর সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। কিন্তু তিলোয়পন্নসির একটি পূর্ববর্তী গাথায় এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিংবদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে। উহা এই :—

জাদো ব সগণরিন্দো রজ্জং বংসসূস হুসয়বাদালা

দোণি সদা পণবল্লা গুতাণং.....

অর্থাৎ শকবংশীয় রাজগণ ২৪২ বৎসর এবং গুপ্তসম্রাটগণ ২৫৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। শকরাজগণের রাজত্বকাল ২৪১ বৎসর চলিবার

কারণ এট যে, শকাব্দের ২৭২তম বর্ষ এবং খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বর্ষ সমকালীন। যাচাইটুক, এট কিংবদন্তী অনুসারে গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা ২৫৫ খ্রীষ্টাব্দ অব্দে ৫৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। একই প্রকারে গুপ্তবংশের শাসনকাল সম্পর্কে দুইটি পরস্পর বিরোধী অস্তিত্ব কিংবদন্তী দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ গ্রন্থকার প্রাচীন কোন যত্ন হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি গুপ্ত সম্রাটগণের আদিপতা ৫৫২-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার হইতে এবং ৫৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যা হইতে উৎখাত হইয়াছিল একরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি জৈন কিংবদন্তীর মিলেট সত্য প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, মৌখরির ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে মগধ হইতে গুপ্ত অধিকার বিলোপ করিয়াছিল, একরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে কিছু প্রমাণ আছে। উড়িষ্যা হইতে ৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষেই গুপ্ত সম্রাটগণের প্রকৃত বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোনট সম্প্রদায় নাই। কারণ ঐ বংশের মানবংশীয় শত্ৰুযশা স্বাধীনভাবে উত্তার সোত্রো তাম্রশাসন লান করিয়াছিলেন গুপ্তোত্তর উড়িষ্যায় উহাষ্ট সম্প্রদায় স্বাধীন নরপতি প্রদত্ত রাজশাসন।

বাংলাদেশ হইতে দিক কবে গুপ্ত-প্রকৃত বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব এবং জয়নাগ নামক চারজন স্বাধীন রাজা বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মাদিত্যের আদিভা-নামক হইতে তাঁহাকে গুপ্তবংশীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। কিন্তু গোপচন্দ্র, সমাচারদেব এবং জয়নাগ সম্ভবতঃ গৌড়জাতীয় ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর সুবিখ্যাত গৌড় রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর হইতেই জয়নাগের তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যদি বাংলাদেশ হইতে ৫৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তবে ঐ তিনজন গৌড়নরপতি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপক্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ বাংলা হইতে গুপ্ত-প্রকৃত উৎখাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উড়িষ্যার সামন্ত রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ের সম্রাট উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্বভারতে গৌড়ের আপনাদিগকে গুপ্তদিগের উত্তরাধিকারী মনে করিত বলিয়াই

বোধ হয় গোড়েনর উড়িয়া বিজয়ের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। অবশ্য উড়িয়ার মান এবং বিগ্রহ-বংশীয় রাজগণের পারস্পরিক বিবাদ গোড়েনিকে উড়িয়া বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিল ভাঙতে সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিলোয়পন্নতির দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক উপাধো মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গঙ্গখানি ৪৭৫—৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, তিলোয়পন্নতির রচনা কাল ৫৭৪—৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। যতি বৃহত্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান সম্প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কিংবদন্তীর পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য না করিয়া অন্ধের মত উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার দীর্ঘকাল পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার

শ্রীচরু চন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস যে এক সুসভ্য জাতির গৌরবময় ইতিহাস তাহা বহুকাল হইতে জানা ছিল। কিন্তু ইহা গঠন করিবার ক্ষমতা যে কতকগুলি উপাদান ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে প্রায় অজ্ঞাত ছিল বলিলেট চলে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কতকগুলি যুরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করে। এই সব জাতির মধ্যে ইংরাজ জাতির প্রবেশেতে কলিকাতাতে ভারতীয় বিষয় সহিয়া গবেষণা করিবার ক্ষমতা এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় এই সমিতির বেশীর ভাগ সভ্য ছিলেন ইংরাজ, অল্পসংখ্যক সভ্য ছিলেন ভারতীয়। এই সমিতির সভ্যগণ দ্বারা

নানা বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা শুরু হইল। এই সব বিষয়ের মধ্যে একটি হইতেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস। যে সমস্ত যুরোপীয় পণ্ডিত এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্কার উইলিয়ম ফোল্, হেন্স প্রিন্সেপ্ ও স্কার আলেকজান্ডার কানিংহামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগে যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত ইহাতে যোগদান করিলেন তাঁহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহাত্মাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এক বাদান্ধী মনীষী নিকের গবেষণার দ্বারা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার। মাত্র চরিত্র বৎসর বয়সে তিনি সিন্ধু প্রদেশে দাছ জেলাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় ডাকাতে গুলিতে নিহত হন; এত অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি তাঁহার গবেষণার দ্বারা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

ননীগোপাল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত দেবরাজপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বন্দ্যোপাধ্যায় মজুমদার। অতি অল্পবয়স হইতেই তিনি ভাত্রে হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তখনই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বালক উত্তর কালে বিশেষ যশস্বী হইবে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময় স্কার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে কতকগুলি নূতন বিষয় পাঠনের ব্যবস্থা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় হইতেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এই বিষয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন প্রথিতযশা ডক্টর দেবদত্ত রায়চৌধুরী ভাণ্ডারকর। ননীগোপাল এই বিষয়ে এম-এ ক্রাশে ভর্তি হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ডক্টর ভাণ্ডারকরের বিশেষ প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তূর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-কাৰ্য্যে ব্যাপৃত হন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রাফিখ পুরস্কার লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি যে সব পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় চরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কালীপ্রসাদ ত্রয়বাল। বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম. এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কার্যে তিনি প্রায় চার বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরবঙ্গে রাজসাহী শহরে অবস্থিত বরেন্দ্র অঙ্গুসন্ধান-সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এট পদে সমাসীন ছিলেন। এই কয়েক বৎসর তিনি গবেষণা লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণার দ্বারা তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময়কর্তা স্থান ছন্ন মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মার্শাল সাহেবের ডাককে ১৯২৫-২৭ বৎসরের মধ্যে তৃতবার সিদ্ধ-প্রদেশে দারকানা জেলার অধূর্ণঃ মহেঞ্জোদাড়োতে খননকার্য করিবার জগ্য লইয়া যান এবং এত কার্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন

খনন-কার্যে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়াতে ভারত-সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। এষ্ট সময় হইতে তাঁহার জীবনের সঙ্গোষ্ঠ ও সর্বপ্রধান কার্যের আরম্ভ হয় অর্থাৎ সিদ্ধ প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলিতে খনন-কার্য। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সিদ্ধ প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে খনন-কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন সেগুলি তাঁহাকে চিরকাল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাতে অবস্থিত ভারতীয় চিত্রশালা ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব পাখার সহকারী কর্মাধ্যক্ষ রূপে তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বিভাগের কর্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খনন কার্যে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হন। এষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে তিনি সিদ্ধ প্রদেশে দাছ জেলাতে প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য করিতে যান। সেই স্থানগুলিতে তিনি অনেক

মূল্যবান উপাদান আবিষ্কার করিতেছিলেন। একদিন প্রত্যবে তিনি যখন একস্থান হইতে অতৃষ্ণানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ ছর ছর্প্তগণ অর্পের লোভে তাঁহাকে নিকটবর্তী পাহাড় হইতে গুলি করে। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই নভেম্বর)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। এইভাবে অকালে এক অতি মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটিল। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্বময়কর্তা নিবৃত্ত হইতেন। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সম্মানীয় সভ্য বা ফেলো নির্বাচিত হন। এত অল্প বয়সে এই সম্মান খুব কম লোকের তাগোই ঘটিয়াছে।

অকালে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে পরলোক গমন করিলেও তিনি তাঁহার অপূর্ণ গবেষণার দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস-রচনা-ক্ষেত্রে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা-কাণ্ডে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অতুর্গত নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাক্-ইতিহাস, অশ্বশাসন, প্রত্নলিপিতত্ত্ব, মন্দিরতত্ত্ব, মূর্ত্যতত্ত্ব, ও সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ঐচ্ছিক সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এই নিদর্শন গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই স্থানে কয়েক বৎসর খননকার্য্য চালান হয় এবং তাহার ফল কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তকে নিবিষ্ট হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে স্তার জন মার্শালের সম্পাদিত Mohenjo-daro and the Indus Civilisation গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সময়ে পাক্ষবে মর্টেগোমারী জেলাতে হরপ্পা নামক স্থানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন-কার্য্য চালান এবং তাহার ফলে ক্রীমাধবস্বরূপ বৎস কর্তৃক Excavations at Harappa নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়।

যখন মহেঞ্জোদাড়োতে খনন-কার্য চলিতেছিল, তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃকর্তাগণ জুনিতে পাইলেন যে মহেঞ্জোদাড়োর নিকটবর্তী আরও অনেক স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। তখন তৎক্ষণ ও উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদারকে ঈশা সভা কিনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে পাঠান হইল। এই কার্যে তিনি তিন বৎসর কাল ব্যাপৃত ছিলেন এবং ইহা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি পুস্তক রচনা করেন।

যে পুস্তক তাহাকে চিরকাল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে তাহা হইতেছে সিন্ধু-প্রদেশে এই খনন-কার্য লইয়া একটী বিস্তৃত বিবরণ সহ পুস্তক। এই পুস্তকটির নাম হইতেছে *Explorations in Sind* (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 48)। ইহাতে তিনি তাঁহার খনন-কার্যের এক অতি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিন বৎসর খনন-কার্য করিয়া সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনপূর্ণ অনেক নূতন স্থান তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের নাম হইতেছে কাহ্নদ শাহ, আলিমুদ্দীন, আমরি, আমিলানো বাচানি, বাদা, বাকনি, হরুদাড়ো, চৌরো, ডিসয়, ধল, ডাবুধি, গোরাতি, গাজিসাহপীর, ঝাঙ্গার, ঝাংড়ি, ঝুঙ্গর, ওরাজি চিলি, খড়ুর, কোট্টাস বুধি, মনুমজো, বুধি, লহমজোদাড়ো, লাখিয়োগাড়, ওখমানজো বুধি, পোখরানপতি, পাণ্ডিওয়াতি, পীরমাঝারত-চিলি, সাজো-কোটিরো, ট্যাণো রহিমখান, খারোপাহাড় ও জীনি। এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা, প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ও আবিষ্কৃত প্রধান প্রধান জব্যগুলির তালিকা তাহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্থানগুলি দেখাইয়া একটী মানচিত্র ও কতকগুলি জব্যের চিত্র ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রাপ্তিগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-হিসাবে যাহা বলিতে চান তাহা ‘সাধারণ সিদ্ধান্ত’ নামে একটি অধ্যায়ে বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি দেখাইয়াছেন যে সিন্ধু প্রদেশের এই সভ্যতার সহিত অরেল ষ্টাইন কর্তৃক দক্ষিণ বেলেচিস্তানে আবিষ্কৃত সভ্যতার একটী আত্মিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি এখানে যে সমস্ত তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের একটি বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়াছেন। ইংৎ লাল বর্ণের ও জ্যামিতিক নক্সা যুক্ত একপ্রকার তৈজস পত্র কেবলমাত্র আমরি, লরি, পাণ্ডিওয়াহি, বাকনি, ডাবুধী, এবং

চৌরোতে পাওয়া গিয়াছে। যে সব জিনিসও ইচ্ছাতে অঙ্কিত হইয়াছে সেগুলি কৃষ্ণ বা চকোলেট রংয়ের। এই ধরণের চিত্র সম্বলিত তৈজস-পত্র অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার তৈজস-পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার গাত্র দক্ষ খুসর রংয়ের স্নায় এবং ইহার উপরে কৃষ্ণ রংয়ের দ্বারা অঙ্কন রচিত আছে। ইচ্ছাতে জ্যামিতিক নক্সার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের তৈজসপত্র চকুদাড়ো, গাজিসাহ, করছাট ও সাফো-কোটিরোতে অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইচ্ছা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সিন্ধু প্রদেশে ও বেলুচিস্তানে একযুগে অঙ্কিত তৈজস পত্রের খুব চল ছিল এবং পরবর্তী যুগে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং তখন হইতে তিনি ইচ্ছাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে সব স্থানে অঙ্কিত তৈজস পত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি মহেঞ্জোদাড়ো অপেক্ষা বেশী পুরাতন। (“Judged by the test of frequency of painted fabric appearing at the various sites, Mohenjodaro should legitimately be assigned to a later phase of the civilisation when the people had become more matter of fact and utilitarian in their outlook”)। তিনি আর এক প্রকার তৈজস-পত্রের দ্বারা সিন্ধু-সভ্যতার আরও নব যুগের আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃক্স, লহমজোদাড়োর উপরের স্তরে এবং মক্ষার দুপের নিকটে কয়েকটি স্থানে কতকগুলি তৈজস-পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা আরও নব যুগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ননীগোপাল প্রমাণ করিলেন যে মহেঞ্জোদাড়োতে যে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আমরা পাই তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের নিদর্শন ও অনেক স্থানে পাওয়া যায়। তাহার এই সিদ্ধান্ত সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিল। ইহা অভ্যস্ত আনন্দের বিষয় যে তাহার এই যুগান্ত কারী সিদ্ধান্ত বিশ্বের গণিতমণ্ডলীর দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে তিনি পুনরায় সিন্ধু প্রদেশে খনন-কার্যের জন্ত যান এবং এই কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় তিনি ডাকাতের দ্বারা নিহত হন। তাহার মূল্যবান ডায়রী সম্প্রতি Ancoient India নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ধরোষ্ঠী অমুশাসন ও লিপি সম্বন্ধে ননীগোপালের গবেষণা চিরকাল

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে অনর হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কৃত্তিকের সহিত এন্-এ পরীক্ষা পাশ করিবার পর তিনি খরোষ্ঠী অশ্বশাসন ও লিপি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃত্তিকের পরিচয় দেন। তিনি খরোষ্ঠী অশ্বশাসনগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য কয়েকবার পাক্ষাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমাহ্রপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি খরোষ্ঠী অশ্বশাসনগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি খরোষ্ঠী অশ্বশাসনের পাঠ সৰ্ব্বপ্রথম উদ্ধার করেন। ইহাদের মধ্যে Bajaur casket of the reign of Menander প্রবন্ধটি সর্বাধিক মূল্যবান। আগে ভারতের গীমৌয় রাজ্য মিলিন্দর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল; ইহা তাঁহার সৰ্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত অশ্বশাসন। ননীগোপাল বিশেষ দক্ষতার সজ্জিত ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাঁহার এই সম্পাদনা স্বীকার করিয়াছেন। আর একটা প্রবন্ধে তিনি খরোষ্ঠী লিপির উপর তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটির নাম হইতেছে Notes on the coins of Azes, ভিন্ন একটা প্রবন্ধে তিনি খরোষ্ঠী অশ্বশাসনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটির নাম হইতেছে “A list of Kharosthi inscriptions.” এই প্রবন্ধটি তাঁর অল্প বয়সের রচনা; কিন্তু ইহাতে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও পরিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল খরোষ্ঠী অশ্বশাসন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটির পাঠের ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ননীগোপালের এই প্রবন্ধটি পণ্ডিতগণ অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যখন নরসিংয়ের বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ষ্টেন্ কোনো তাঁহার Kharosthi inscriptions নামক গ্রন্থ পুস্তক প্রকাশ করেন, তখন দেখিতে পাওয়া গেল যে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতে ননীগোপালের এই প্রবন্ধের ও খরোষ্ঠী অশ্বশাসন সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার উল্লেখ রহিয়াছে। অতি নবীন একজন গবেষকের পক্ষে ইহা কম স্লাঘ্য ও আশ্চর্য্যকর বিষয় নহে!

ননীগোপালের কর্মজীবন যখন আলোচিত হইয়াছে, তখন দেখান হইয়াছে, যে তিনি ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গে রাজসাহী সহরে অবস্থিত বরেন্দ্র অশ্বসন্ধান সমিতির অধ্যাপকরূপে কাজ করেন।

এই সময়ে তিনি বাংলা অশ্বশাসন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান পুস্তক ও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যে মূল্যবান পুস্তকটি তিনি রচনা করেন তাহার নাম হুইট্টেভে *Inscriptions of Bengal, vol. III.* এই গ্রন্থে তিনি সাধারণতঃ চন্দ্র, নর্মা ও সেন রাজবংশের সমস্ত অশ্বশাসন সম্পাদনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি একটা প্রয়োজনীয় মানচিত্র দিয়াছেন। প্রত্যেকটি অশ্বশাসন তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পালবংশের নৃপতি দেবপালদেবের নালন্দাতে প্রাপ্ত তাম্র শাসনটি লইয়া তিনি একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। (*Nalanda Copper-plate of Devapaladeva, Monograph of the Varendra Research Society, No. 1*) তিনি বাংলা দেশের আরও কতকগুলি অশ্বশাসন লইয়া পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। *Nalanda Inscription of Vipulasmitra* ও *Mallasaral Copper-plate of Vijayasena* নামক প্রবন্ধ দুইটা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি এই অশ্বশাসন দুইটির সম্পাদনা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত করিয়াছেন। বিপুলস্মিত্রের নালন্দা অশ্বশাসনটি খ্রীষ্টীয় দশদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। বিপুলস্মিত্র নামক একজন বৌদ্ধ সম্রাটের দানের উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে। তিনি ভগবান্ পদসর্পণের মন্দিরে একটা মন্মথ দান করিয়াছিলেন এবং সত্রগুলিতে একটা পর্ক উপরূপে চারটা মূর্তি দান করিয়াছিলেন। ছোট্টক অবস্থিত বুদ্ধের বিহার তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং চর্চপরে দীপস্বর বুদ্ধের একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোমপুরে তিনি তারার মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে তিনি মিত্রদের জম্ম একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ননীগোপাল দেখাইয়াছেন যে নালন্দাতেই এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। সোমপুর যে পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত পাহাড়পুর তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। *Mallasaral Copper-plate of Vijayasena* নামক প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু পূর্বে তিনি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বঙ্গদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল এই লিপির অক্ষর তাহার অসুসঙ্গ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাবিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাসনখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজত্ব কালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া

উল্লেখ আছে। এই গোপচন্দ্র ও করিমপুর তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। ইহাতে মহারাজা বিজয়সেন ব্রাহ্মণ রামবামীকে কিছু ভূমিদান করিতেছেন। তাম্রশাসনের তারিখ প্রায় ৮৫০ খ্রিঃাব্দে সংবৎ ৩, আৰণ ২৭। এই তৃতীয় সংবৎসর সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যাব্দ। ভূমিদাতা মহারাজা বিজয়সেন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ কৰ্মচারী বা সামন্ত ছিলেন দেখা যাইতেছে।

খরোষ্ঠী ও প্রাচীন বাংলার অমুশাসন ব্যতীত অজ্ঞাত প্রাচীন ভারতীয় অমুশাসন সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে তাঁহার সাক্ষীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ স্তূপের উপরে উৎকীর্ণ অমুশাসনগুলির সম্পাদনা। স্ভার জন মার্শাল ও আলফ্রেড ফুসে "The Monuments of Sanchi" নামক গ্রন্থেও এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে অমুশাসনগুলি বিশদভাবে সম্পাদনা করেন নরীগোপাল (The Monuments of Sanchi. By Marshall, Foucher and Majumdar Vol. I, pt. IV, Inscriptions. Chaps. XVIII-XXII, pp 263-394. pls. CXXVIII-CXLI. ইহাতে তিনি অশোকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত যত অমুশাসন সাক্ষীতে পাওয়া গিয়াছে তাহাদের পাঠ দিয়াছেন। সর্বশুদ্ধ তিনি ৮৪২টী অমুশাসনের পাঠ দিয়াছেন। তিনি এই পাঠগুলির সহিত ইংরাজী অনুবাদও দিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই অমুশাসনগুলির ভৌগোলিক বিভাগ, যুগ, প্রত্নলিপিতত্ত্ব ও ভাষা লইয়া তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক অমুশাসনের চিত্র এই গ্রন্থে সম্মিলিত হইয়াছে। অশোকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শকব্দক্রম নবপানের যুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিকাশ দেখাইয়া তিনি একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি তিনটী মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই তিনটী প্রবন্ধের মধ্যে দুইটী বৌদ্ধধর্ম ও একটী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন ; এই প্রবন্ধটির নাম হইতেছে 'Three Kushan coins from North Bengal'। এই প্রবন্ধে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত তিনটা স্বর্ণময় কুষণ যুগের মুদ্রা লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটা মুদ্রা মালদহতে পাওয়া গিয়াছিল ও অপর দুইটা মুদ্রা বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশে কুষণ যুগের মুদ্রা খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। কুষণ যুগে বঙ্গদেশ কুষণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না কারণ বঙ্গদেশে কুষণ সম্রাটের পাওয়া যায় নাই এবং কুষণ মুদ্রাও বঙ্গদেশে খুব কম পাওয়া গিয়াছে। দুইটা মুদ্রা কুষণ সম্রাট বাহুদেবের ও অপরটা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্বভারতে প্রচলিত প্রথম কনিকের মুদ্রার অনুরূপে নিশ্চিত মুদ্রা।

ননীগোপাল যে কেবলমাত্র দিল্লী-প্রদেশে খনন-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গদেশে ও বিহারেও কতকগুলি স্থানে খনন-কার্য্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি উত্তর বঙ্গে বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী মহাস্থানের নিকট গোপুল নামক একটা গ্রামে নেট বা লখিমপুরের নেট নামক ৪৩ ফুট উচ্চ একটা চিপিতে খনন-কার্য্য করেন। ইহার ফলে একটা অসুভ-ধরণের স্থাপত্য-নিদর্শনের আবিষ্কার হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহা গুপ্ত যুগের। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর জেলাতে হিলি নামক রেলওয়ে স্টেশনের দুইমাইল পূর্বে বাইগ্রাম নামক স্থানে শিব-মণ্ডপ নামক একটা চিপিতে তিনি খনন-কার্য্য করেন। এই স্থানে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং ১২৮ গোপাঙ্কে উৎকীর্ণ একটা তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ বঙ্গে হুগলী জেলাতে মহানাদ নামক স্থানেও তিনি খনন-কার্য্য করেন। যে কয়েকটা তৈজস পত্রের ভগ্নাবশেষ ও মুদ্রার মস্তক এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর। বর্ধমান জেলাতে দেউলিয়া নামক স্থানে একটা ইষ্টক-নিশ্চিত মন্দির তিনি আবিষ্কার করেন। এই মন্দিরের সহিত বাঁকুড়া জেলার বহলাড়াতে অবস্থিত সিক্কেস্বর মন্দিরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং খুব সম্ভব ইহা সেই যুগের।

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিহারের লৌড়িয়-নন্দনগড় নামক স্থানে

খনন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ইহাতে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান।
 উত্তর বিহারে চম্পারণ জেলাতে বেতিয়া নামক স্থানের খোল নাইল উত্তর
 পশ্চিমে লৌড়িয়-নন্দনগড় অবস্থিত। এই স্থানে একটা অশোক-স্তম্ভ
 আছে। লৌড়িয়তে যে সকল টিপি আছে তাহা কানিংহাম, গারিক
 ও কার্লাইল বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর বিয়োডোর
 ব্রক এই স্থানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খনন-কার্য্য করেন। তিনি এই
 সিকান্তে উপনীত হন যে এই টিপিগুলি বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত রাজকীয়
 সমাধি-স্তূপ এবং ইহা সেই জ্ঞাত প্রাক-মৌর্য্যযুগের। লৌড়িয়তে অবস্থিত
 টিপিগুলি তিনটা শ্রেণীতে সাজান। A নং টিপিতে নমোগোপাল খনন
 করিয়া একটা বৌদ্ধ স্তূপের নিদর্শন পান। এই স্থানে কতকগুলি
 অকট্টিফুল্ল মুদ্রা পান। ইহাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই স্তূপটী
 মৌর্য্য যুগে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। B নং টিপিতে তিনি খনন-কার্য্য
 চালান। এইখানে একটা গোলাকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়।
 এই জ্ঞাত তিনি এই সিকান্তে আসিয়াছেন যে এইটীও একটা স্তূপের
 অবশিষ্টাংশ। C নং টিপিতে ও তিনি খনন-কার্য্য চালান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে
 এই টিপিতে ডক্টর ব্রক স্ত্রীমূর্ত্তি সন্ধানিত একটা ছোট স্বর্ণময় পত্র
 আবিষ্কার করেন। ইহা ছাড়া এই টিপিতে তিনি মানব দেহের হাড়ের
 নিদর্শন পান। এই হাড়ের সহিত অস্ত্রার মিশ্রিত ছিল। সুতরাং এই টিপি
 যে কোন সমাধি-স্তূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই স্বর্ণময় পত্রটী
 অপকৃত হয়; কিন্তু নিকটবর্ত্তী টিপিতে পুনরায় এই প্রকার আর
 একটা স্বর্ণময় পত্র পাওয়া যায়। তিনি যে সব স্থাপত্য-নিদর্শন পাইয়াছেন
 তাহাদিগকে স্তূপ বলিয়াছেন; কিন্তু এইগুলি যে সব বৌদ্ধস্তূপ তাহা
 বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন সাহিত্যের
 নিদর্শন অসুখ্যায়ী একটি রাজার সমাধি-স্তম্ভ ও বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে বিশেষ
 কোন পার্থক্য নাই। এই ধানে যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের
 তারিখ সাধারণতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত।

১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নন্দনগড়ে অবস্থিত টিপিতে খনন-কার্য্য চালান।
 এই স্থানে খনন করিতে করিতে তিনি একটি অতি বৃহৎ স্থাপত্য
 নিদর্শনের সন্ধান পান। এই স্থাপত্য-নিদর্শনটী উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত পাহাড়-
 পুরের প্রধান মন্দিরটীর স্থায় যদিও পাহাড়পুরের মন্দিরটী এই মন্দির

অপেক্ষা হয় বা সাত শতাব্দীরও পরের। পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থায়ী ইহাতেও পর পর অলিঙ্গ রহিয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই স্থাপত্য-নিদর্শনটী খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নির্মিত হয় নাই। ভারতবর্ষে এই যুগের এত বড় স্থাপত্য-নিদর্শন আর পাওয়া যায় নাই। তিনি ইহাকে বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *A guide to the sculptures in the Indian Museum, Pts. I and II* নামক দুইখানা সুন্দর পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। ননীগোপাল প্রথম খণ্ডে মৌর্য যুগের ও বরহত, সাকী, বৃদ্ধগয়া, পাটনা, রাজগীর, উদয়গিরি ও সারনাথে প্রাপ্ত শূন্য যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ত্রব্য লইয়া একটি সহজ অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ভারতীয় চিত্রশাস্ত্রে রচিত গন্ধার প্রদেশের বৌদ্ধতাত্ত্বিকের নিদর্শনগুলির একটি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

ননীগোপাল মজুমদার রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধের তালিকা

1920

1. Cinna Inscription of the reign of Sri Yajna Satakarni (Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. XVI, 1920, pp. 327-30, pl. XVI)

1922

2. Notes on Kharosthi Inscriptions. (Ibid, Vol. XVIII, pp. 61-67, pl. III-IV)
3. Maner Copper-plate of Govinda Chandra, V. E. 1183. (Ibid, Vol. XVIII, pp. 81-84)
4. The Sui Vihar Copper-plate of the reign of Kanishka. (Sir Ashutosh Mukherji Silver Jubilee Volume, Vol. III, Orientalia, pt. I, pp. 459-74)

1923

5. An inscribed copper-ladle from Hazara. (Ibid, Vol. XIX, pp. 345-47, pl. 14)

1924

6. A list of Kharosthi inscriptions. (Ibid, Vol. XX, pp. 1-40)

1926

7. A new Brahmi Inscription from Mathura (Indian Historical Quarterly, Vol. II, pp. 441-46)
 8. Nalanda Copper-plate of Devapaladeva. (Memoirs of the Varendra Research Society, No. 1)
 9. Notes on a stone-inscription in Bengali characters of the reign of Sitarama Raya from Muhammadpur, district Jessore. (Annual Report of the Varendra Research Society, 1925-26. p. 9).
 10. Rohitagiri of the Rampur Copper-plate (Indian Historical Quarterly, Vol. II p. 655-56).

1927

11. Some Notes on Buddhist Iconography. (Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXII, 1926, 169-75).
 12. Adi-Buddha in the Eastern School of Art. (Annual Report of the Varendra Research Society, 1926-27, pp. 7-10).

1929

13. A new type of Vishnu from North Bengal. (Annual Report of the Varendra Research Society, 1928-29, pp. 15-17).
 14. A Kharosthi Inscription from Jamalgarhi of the year 359. (Epigraphia Indica, Vol. XIX, 203-05).
 15. Inscriptions of Bengal, Vol. III
 16. Peshawar Museum Inscription of the year 166. (Epigraphia Indica, Vol. XIX, pp. 202-03).

1931

17. Excavations at Jhukar. (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1927-28, pp. 76-83).

1933

18. Notes on the coins of Azes (Ibid, 1928-29, pp. 169-73, pl. LXIV).
 19. Three Kushan coins from North Bengal. (Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXVIII, pp. 127-29.).

1934

20. Explorations in Sind. (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 48).
21. Nalanda Inscription of Vipulasrimitra. (Epigraphia Indica, Vol. XXI, pt III, pp. 97ff).

1955

22. Explorations in Sind. (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1929-30, pp. 110—21)

1936

23. Explorations in Sind. (Ibid, 1930-34, pp. 90-106, 4 pls.)

1937

24. A guide to the sculptures in the Indian Museum, Parts I and II.
25. Explorations in Bengal. Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1934-35, pp. 40-43, 2 pls.)
26. Nandapur Copper-plate of the Gupta year 169. (Epigraphia Indica, Vol. XXIII, pp. 52-56.)

1938

27. Excavations at Gokul. (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1935-36, pp. 67-69, pl. XXIV-XXVII)
28. Bajaur casket of the reign of Menander. (Epigraphia Indica, Vol. XXIV, pp. 1-8, 2 pls.
29. Four Copper-plates from Soro. (Ibid, Vol. XXIII, pp. 197-203, 2 pls.)
30. Mallasarul Copper-plate of Vijayasena. (Ibid, Vol. XXIII, pp. 155-61, pl.)
31. Inscriptions on two relic caskets from Charsadda. (Ibid, Vol. XXIV, pp. 8-10, pl.)
32. Explorations at Lauriya Nandangarh. (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1935-36, pp. 55-66, pls. XIX—XXIII)

1939

33. Kosam inscription of the reign of Maharaja Vaisravana of the year 107. (Epigraphia Indica, Vol. XXIV, pp. 146-3, pl.)
34. Cuttack Museum Plates of Madhavavarman. (Ibid, Vol. XXIV, pp. 148-53, pl.)

1940

35. Excavations at Lauriya Nandangarh. (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1936-37, pp. 47-50, pls. XXI—XXIV)
36. The Monuments of Sanchi. By Marshall, J. H., Foucher, A., Majumdar, N. G.
37. বঙ্গসাক্ষরে প্রাপ্ত বিহগ সেনের তাম্র-শাসন (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৪ ভাগ, ১৩৪৪, পৃ: ১৭-২১, চিত্র)

দিগ্‌দর্শন পত্রিকা

ত্রিভুজোদয় দত্ত

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম মাসিক পত্র—দিগ্‌দর্শন। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যারা বের করেছিলেন এটাও তাঁরাই প্রকাশ করেছিলেন। এক মাসের ব্যবধানে সেই বৎসরেই যে মাসে সাপ্তাহিক পত্র সমাচার দর্পণ আত্মপ্রকাশ করে।

আসলে মাসিকপত্র প্রকাশ করাই ত্রিপুরামপুর মিশনের পাদ্রীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না। এই মাসিকপত্রটি দিয়ে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন সাপ্তাহিক পত্রে সরকার কিভাবে গ্রহণ করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর ত্রিপুরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখেছেন : The Serampore Missionaries had for some time contemplated the publication of a newspaper in the Bengalee language to stimulate a spirit of inquiry and to diffuse information. The Government of India had always regarded the periodical press with a spirit of jealousy, and it was then under a rigid censorship. It did not appear likely that a native journal would be suffered to appear, when the English journals at the presidency where alone they were published were fettered by the severest

restrictions. The missionaries were not at the time informed of the opinions—bold for that age—which Lord Hastings entertained regarding the press, in opposition to the views of his colleagues, and they hesitated long before they made any demonstrations of their design. They resolved at length to feel the pulse of the public authorities by the tentative publication of a monthly magazine in Bengalee. The following extracts from the minutes, regarding this publication, the first periodical work which had ever appeared in any Oriental language, will serve to show the feelings of the day. "February 18th, 1818 Mr. Marshman having proposed the publication of a periodical work in Bengalee, to be sold among the natives for the purpose of exciting a spirit of inquiry among them, it was resolved that there is no objection to the publication of such a journal, provided all political intelligence, more especially regarding the East, be excluded from it, [and it do not appear in a form likely to alarm government. It must, therefore, be confined to articles of general information and notices of new discoveries, but a small space may be allotted to local events with the view of rendering it attractive." The magazine was called "Dig-darsun".—History of the Serampore Mission (1859) পৃ: ১৬১—১৬২। 'সাধারণের মধ্যে জ্ঞানভাণ্ডার আগাবার জন্য ত্রিরাশপুত্রের পাত্রীরা কিছুকাল থেকেই বাংলাভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। ভারত সরকার বরাবরই সংবাদপত্রকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং নানারকম কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। এই প্রেসিডেন্সি থেকে যে ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, তাদেরও নানা বিধিনিষেধ যেনে চলতে হত, দেশীয় সংবাদপত্রের যে কি হবে বুঝতেই পারা যাচ্ছে। লর্ড হেষ্টিংস তাঁর সহকর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে অতিমত পোষণ করতেন সে যুগের পক্ষে সেটা দুঃসাহসিক ; কিন্তু পাত্রীরা তা জানতেন না। এক্ষণে তাঁরা অনেকদিন থেকেই ইতস্ততঃ করছিলেন। অবশেষে তাঁরা স্থির করলেন পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাভাষায় একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে আগে

কর্তৃপক্ষের নমোভাব ব্যবহার চেষ্টা করবেন। ১৮১৮ জুলাইয়ের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর বিবরণী পড়লেই সে সময়ের অবস্থাটা বোঝা যাবে। “দেশীয় লোকদের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগাবার জন্য বাংলাভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশের যে প্রস্তাব মার্শম্যান করেছেন, তাতে আপত্তি নেই বটে, কিন্তু দেখতে হবে কোনো রাজনৈতিক সংবাদ বিশেষ করে পূর্বদেশীয় সংবাদ যেন তাতে না থাকে এবং পত্রিকাটি এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে সরকার বিরক্ত না হন। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে এবং নতুন তথ্য পরিবেশনেই শুধু এর বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকবে। পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে শুধু স্থানীয় সংবাদে রক্ত সন্নিবিষ্ট রাখতে পারা যাবে।” পত্রিকার নাম হোল দিগ্‌দর্শন।

সাধারণ জ্ঞানের বিষয় ছাড়াও শেষ পাতায় সাময়িক ঘটনারও কিছু কিছু বিজ্ঞাপন থাকত। এই সব কারণে বিশেষ করে রাজনীতি এবং অস্থায়ী বিতর্কমূলক বিষয় পরিহার করাতে এই পত্রিকাটি সরকারী মহলেও সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। দিগ্‌দর্শনের এই শুভ আরম্ভ দেখে জগদীশ মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড অতঃপর বাংলাভাষায় সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করতে সংকল্প করলেন। এক মাসের মধ্যেই সমাচার দর্পণ প্রথম বাংলা সংবাদপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করার গৌরব অর্জন করল।

দিগ্‌দর্শন পত্রে তারা লিখতেন বলা কঠিন; কারণ পত্রিকায় লেখকের নাম থাকত না। তবে অনুমান করা যায় মার্শম্যান আর ফেলিক্স কেরী দিগ্‌দর্শনের প্রধান লেখক ছিলেন। ত্রিপুরার মিশন গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ থেকে এঁরা যে সব বিষয়ের চর্চা করতেন, পত্রিকায় সেই ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধই প্রধানত থাকত। মে মাসে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হলে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিয়েছিলেন। সমাচার দর্পণেরও সম্পাদক ছিলেন জন ব্ল্যাক মার্শম্যান। দিগ্‌দর্শনের বিষয়েও তিনি যে জয়গোপালের সাহায্য নেন নি—একবার পক্ষে জোরালো যুক্তি নেই, বিপক্ষেও নেই।

ব্ল্যাক মার্শম্যান নির্ভাবানু ধর্মপ্রচারক হলেও ঐতিহাসিক সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। তাঁর লেখা কয়েকখানা বই—History of India, History of Bengal এবং A Brief Survey of History এদেশে আধুনিক যুগে ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিয়েছে। ভারতবর্ষের

ইতিহাস মার্ম্যান বাংলাতেও লিখেছিলেন। সেটা ছিল শুধু ভারতবর্ষে ইংরেজদের আসার পর থেকে হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। কেলিন্স কেবীও সেই সময় তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবল্ল কয়েক বৎসর কাটিয়ে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। উইলিয়ম কেবী ছিলেন তাঁর পিতা। উইলিয়ম কেবী পুত্রকে পাত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাত্রী হওয়ার ইচ্ছা তাঁর বিশেষ ছিল না বরং ভাষা শিখবার শৌক ছিল তাঁর অসাধারণ। সংস্কৃত আর পালি তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। চমৎকার বাংলা বক্তৃতাও তিনি দিতে পারতেন। কিছুকাল ব্রহ্মদেশে থেকে একথানা বন্দী ব্যাকরণও তিনি লিখেছিলেন। জেমস মিলের ব্রিটিশ ভারত-বর্ষের ইতিহাসের অনুবাদও তাঁর আছে—সেটা প্রকাশিতও হয়েছিল।^১ কেলিন্সের বিশেষত্ব ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ভাষা শিখবার অনন্য কোড়ুল আর মুদ্রণ কার্যে অপরিমেয় উৎসাহ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দিগ্‌দর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধ বিদ্যুৎ সংবাদ কোমুদী পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে কলিকাতা কুল বুক সোসাইটি বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে কতকগুলি প্রবন্ধ নিয়ে একটি ছাত্রপাঠ্য সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। বইটির নাম “The Bengali Instructor for the use of schools, No. III.” বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বঙ্গীয় পাঠাবলী, তৃতীয় খণ্ড। এই বইতে ১৮২৪ এর সংবাদ কোমুদী থেকে যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই কয়টি প্রবন্ধ দিগ্‌দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণই মিলে যায়—অয়স্কান্ত অথবা চুয়কমণি, প্রতিপল্লি, বলুনের বিবরণ, মকর মৎস্তের বিবরণ। পরিবর্তন খুব সামান্যই আছে। পাঠাবলীতে রামমোহনের আত্মচরিতও মুদ্রিত হয়েছিল। সংবাদ কোমুদী থেকে উদ্ধৃত বলে অনেকে মনে করেন প্রবন্ধগুলি রামমোহনের। এ বিষয়ে নিশ্চিত

১। সাহিত্য সাধক চরিত মাধব কেলিন্স কেবীর জীবনীতে শ্রীযুক্ত সত্যনীকান্ত দাস লিখেছেন “মনে হয় ইহা মুদ্রিত কত্রিয়ার সুযোগ ঘটে নাই।” কানীপ্রসাদ ঘোষ লিটরেরি গেজেট পত্রিকার শ্রীরামপুর বিন্দরীঘের গভের যে নিন্দা করেন, তার উত্তরদান প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণ দেখেন “...মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বালালা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে, তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে.....ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তর্জমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটেল পেজ অর্থাৎ ভূমিকা ব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে।” সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, ৩ মং পৃঃ ৬০।

কিছু বলা যায় না। তবে কি রামমোহন দিগ্‌দর্শন পত্রের লিখতেন? লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, দিগ্‌দর্শন এবং পাঠাবলী উভয়েই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত। দিগ্‌দর্শনে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে পাঠাবলীতে প্রবন্ধগুলি সংবাদ কৌমুদী থেকে উদ্ধৃত বলে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, এটা কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত থাকবারও কথা নয়।

বিভাগে পাঠ্য হওয়ার উপযোগিতা বিবেচনা করে স্কুল বুক সোসাইটি তার অধীন বিভাগগুলিতে বিতরণ করবার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার এক হাজার কপি কিনে নিয়েছিল। শ্রীযুক্ত শুকুমার সেন “বাংলা সাহিত্যে গল্প” গ্রন্থে (২য় সং, পৃ: ৬৭ লিখেছেন, “প্রথম বৎসরের দিগ্‌দর্শনের একটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ সোসাইটির কর্তৃত্বে জিরামপুরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।” শুধু প্রথম বৎসরের দিগ্‌দর্শনই নয়, তিন বৎসরের দিগ্‌দর্শনই পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কলকাতার কলেজ লাইব্রেরীতে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত ১৮২২ এর নামপত্র সম্বলিত যে সংস্করণটি আছে, তাতে দেখা যায়, দিগ্‌দর্শনের বাংলা সংস্করণের ১৮২১ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত ২৬ ভাগই রয়েছে। কিন্তু জিরামপুরের পাঠীদের মূল পত্রিকা এবং স্কুল বুক সোসাইটির সংস্করণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; সম্ভবতঃ সেটা পাঠ্যরূপে পত্রিকাকে পরিপূর্ণভাবে উপযোগী করে তুলবার জেগেই করা হয়েছিল।

দিগ্‌দর্শন পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল থেকেই এর বৈশিষ্ট্যের জন্য স্কুল বুক সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে জিরামপুর মিশনের পাঠীদের সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মিশনের প্রকাশিত গ্রন্থমালা সোসাইটি সুবিধামত কিনে নেবে অথবা মুদ্রণের পূর্বেই সংস্করণ গ্রন্থয়নে অংশ নেবে—এরকম একটা কথাও সেই রিপোর্টে আছে। মার্শম্যানের সম্পাদনায় দিগ্‌দর্শন পত্রিকা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম তিন সংখ্যার এক হাজার কপি ক’রে কিনে নিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল। “চতুর্থ সংখ্যারও এক হাজার কপি কেনার কথা হয়েছে”।^২

প্রথম রিপোর্টে এই পত্রিকা শুধু কিনে নেওয়ার কথাই আছে। কিন্তু

দ্বিতীয় বৎসর থেকে কিনে নেওয়া ছাড়াও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। “Numerous attestations reaching your committee of the practical value of this work, not only for the use of schools but for the instruction of adults and abundant evidence appearing of its being very acceptable to the natives, it was suggested to the Author, Mr. Marshman Jun. to prepare a second and improved edition in a superior type and to render the work into English. These suggestions were approved; and the Serampore Missionaries in a very liberal manner more than met your committee's ideas regarding the economy necessary on the society's part in an arrangement of considerable magnitude.* শুধু স্থলের পক্ষে নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও এই পত্রিকার উপযোগিতার এবং সাধারণের মধ্যে এর সমাদরের এত প্রমাণ হাতে এসেছে যে এর প্রণেতা কনিষ্ঠ মার্শম্যানকে এর উন্নততর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়; সোসাইটির আর্থিক অবস্থায় যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও অধিকতর উদারতা সহকারে শ্রীরামপুরের পাত্রীরা এই বৃহৎ কর্মতার গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ করবার সময় থেকেই সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থে কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। মার্শম্যান তাঁর শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে বলেছেন দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় শেষের দিকে বিচার বিভাগীয় বিজ্ঞাপন প্রভৃতি পত্রের আকারে যুক্তিত হোত। এ সবই সোসাইটির সংস্করণে বর্জিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো প্রবন্ধও এতে বাদ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িক পত্র গ্রন্থে (১ম সং) দিগ্‌দর্শন পত্রের আগষ্ট ১৮১৮ থেকে ‘বাল্যলার প্রধান নগর বিষয়’ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু সোসাইটি থেকে ১৮২২-এ প্রকাশিত দিগ্‌দর্শনের ওই সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি নেই।

পত্রিকার বোলোভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর স্থির হয় যে ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা আর হবে না। ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা এবং বাংলা—

* ৩. Second Report of the Calcutta School Book Society, 1819, P. 5.

এই তিন সংস্করণ প্রস্তুত করায় যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট হয় বলে ইংরেজি অংশ রচনা এখন থেকে পরিত্যক্ত হয়। ফলে নতুন করে মিশনের সঙ্গে চুক্তি করে যতদিন না হিন্দুস্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস শেষ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলা সংস্করণ তৈরী করার ভার তাঁদের হাতেই দেওয়া হোলো।^১ এই জগুই দিগ্‌দর্শন পত্রিকা বাংলা অংশ ভাবিশ্ব ভাগ, ইংরেজি এবং ইংরেজি-বাংলা অংশ যোলো ভাগ পর্যন্তই দেখা যায়। বাংলা অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে ১৮১৯ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগুলি সোসাইটি প্রকাশ করেনি। ১৮২২-এর এপ্রিলকার বাধানো দিগ্‌দর্শনের নামপত্রেই আছে “ইং এপ্রিল ১৮১৮ লাং মার্চ ১৮১৯। এবং ইং জানেয়ারি লাং এপ্রিল ১৮২০।” প্রথম থেকে মার্চ ১৮১৯ পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠান্ত ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে আবার ১৮২০র জানুয়ারি থেকে নতুন পৃষ্ঠান্ত দ্বিতীয় খণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে যে সূচীপত্র করা হয়েছিল তাতে প্রবন্ধগুলির নাম পর পর দিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মাঝখানের এই কয়েক সংখ্যার কোনো প্রবন্ধের কোনো উল্লেখই সূচীপত্রে নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই নয় মাসের দিগ্‌দর্শন সোসাইটি নেয় নি। কিন্তু সূচী থেকেই আবার বুঝতে পারা যাচ্ছে নামপত্রে ১৮২০র উল্লেখ পর্যন্ত থাকলেও সোসাইটি ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিগ্‌দর্শনের সংখ্যাগুলি প্রকাশিত করেছিল। এটাই হচ্ছে এর শেষ এবং ষড়বিংশতিতম ভাগ। ত্রিরাশপুর মিশন থেকে ওই তিন বৎসরই এই পত্রিকা বেরিয়েছিল। পাদ্রী লড্‌, এই স্বল্প পরমাণুর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন “It was continued for three years; and has proved a very useful work, calculated to open and expand the minds of young Hindus. We have at present no work of a similar kind”.^২ এই পত্রিকা তিন বছর চলে। তরুণ হিন্দু বালকদের মানসিক উদ্বোধনের পক্ষে এই পত্রিকাটি খুবই কাজের হয়েছিল। বর্তমানে এরকম কোনো কাগজ আমাদের নেই।

১। Third Report of the Calcutta School Book Society, 1820-21, P. 5.

২। Early Bengali Literature and Newspapers, Calcutta Review, January, 1850, (selections, p. 80)

সোসাইটির সঙ্গে দিগ্‌দর্শন পত্রিকা নিয়ে যা কিছু আলোচনা-আলোচনা সবই মিশ্রনের পক্ষে পাই। ক্লার্ক মার্শম্যানই চালিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮২২-এ কেলিস কেরীর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে সমাচার দর্পণ তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা ছেপেছিল; সেই তালিকায় উল্লেখ করা আছে “কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটির কারণ দিগ্‌দর্শন”।* মার্শম্যানের উপস্থিতিতেই যখন এই উক্তি করা হয়েছে, তখন মনে হয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষস্থানীয়রূপে মার্শম্যান গণ্য হলেও কেলিস কেরীই স্থলপাঠ্য দিগ্‌দর্শনের সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন। সমাচার দর্পণের এই উক্তি আসলে মার্শম্যানের অধস্বীকার।

সাময়িক বিষয় যথাসম্ভব বর্জন করে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বিদেশী সমাজ প্রভৃতি সাধারণ কোডুহলের বিষয় দিয়ে সোসাইটি এই পত্রিকার সংস্করণ করতিল। এর মধ্যে ইতিহাসের ভাগই বেশী। বিশেষ চিত্তামূলক প্রবন্ধ দেখা যায় নি; রচনাগুলি প্রায় সবই বিবরণাত্মক। কখনও কখনও গুরুশিষ্যের সংলাপ দিয়ে বিজ্ঞানের বিষয় বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। সমাজ-নীতি বা রাজনীতির আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। তিন্লস্থানের ইতিহাস বা ইউরোপের বিবরণের মতো ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাদ দিলে, এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি অনেকটা যেন আলাদা আলাদা বইয়ের মতোই ছিল। একসঙ্গে বাঁধানো অবস্থায় দিগ্‌দর্শনকে তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা একটা বই বললেও চলে। কোডুহলের বিষয় হচ্ছে এই যে, সোসাইটির সংস্করণে কোন সংখ্যার সবশেষের রচনার সবশেষের বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে পরবর্তী সংখ্যার প্রথম রচনারূপে সেট ধারাবাহিক প্রবন্ধের বাক্যটি সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ১৮২০র জুলাইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠায় সর্বশেষ অসম্পূর্ণ বাক্য “সে সৈন্য যুদ্ধে অভিশ্রীষ পরাজিত এবং এবরাহিম—” পরবর্তী সংখ্যা আগস্তের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে “—যুদ্ধে হত হইল”। অথচ পরবর্তী সংখ্যা সেই অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে আরম্ভ হলেও পত্রিকার নাম, সংখ্যা এবং প্রবন্ধের শিরোনাম ইত্যাদি যথারীতি দেওয়া আছে। এই পত্রিকায় কি রকম প্রবন্ধ মুদ্রিত হোত, তা বৃকবার জন্তে ১৮১৮ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত প্রকাশিত দিগ্‌দর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধের নাম সম্বলিত করে দিলাম—আমেরিকার দর্শন বিষয়ে, চন্দ্রক পাথরের প্রথম অম্লতব,

কোম্পাস দ্বারা প্রথম জাহাজ চালান, কলঙ্গের বিবরণ, হিন্দুস্থানের সীমাবিবরণ, ভারত উপমহাদেশ, বলুন দ্বারা সাদলর সাগরের আকাশ গমন, ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ, খ্রীষ্টের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ, ইউরোপের বিবরণ, পদার্থের অসংখ্য ভাগ, জাপান, চীনের উৎপত্তির বিবরণ, ধাতুবিবরণ, বঙ্গভূমির মহাভূতিকা, মধুমক্ষিকার বিবরণ, স্ত্রীপদ ও স্ত্রীপদের কথা, হিন্দুস্থানের ইতিহাস, শীতকালে পথাদির রক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই সুন্দর সুনিখিত বিবরণটি যে কার রচনা, জানার উপায় নেই। কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন, এটা ফেলিক্স কেরীর রচনা। তবে এটাও স্বরণ রাখা দরকার যে তখনকার মিশনারীদের মধ্যে মার্শম্যানই ইতিহাস নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। গ্রন্থাকারে এটি বেরোয়নি, অন্ততঃ লন্ডনের তালিকায় এর উল্লেখ নেই। এই ইতিহাস মুসলমান রাজত্বের পতন থেকে আরম্ভ। লেখক লিখেছেন, “গজেনেনের বাদশাহ মরহুম কর্তৃক হিন্দুস্থান জয় করা অবধি মুসলমানদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যস্থাপন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস দিগ্‌দর্শনের এই ভাগে ও কতক আগামী ভাগে লিখিব।” এই ইতিহাস বেরোতে থাকে দশম ভাগ অর্থাৎ জাহুয়ারি ১৮১৯ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত। সেকালে যতটুকু উপাদান পাওয়া যেতে পারত তাই নিয়ে লেখক সুন্দর প্রণালীবদ্ধভাবে অধ্যায় ভাগ করে ইতিহাসটি লিখেছেন। যত্নাঙ্কয়ের রাজাবলি (১৮০৮) কে যদি বাংলায় লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা যায় তবে একেই সম্ভবত দ্বিতীয় স্থানের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। প্রধানত এই ইতিহাসের জন্তাই (“which will complete the summary history of Hindoostan, now carrying on”—Third Report) শেষ ভাগ পর্যন্ত দিগ্‌দর্শন পত্রিকা সোসাইটিকে দেওয়া হয়েছিল।

দিগ্‌দর্শনের গদ্যভঙ্গি সহজ এবং সরল। সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির অভিপ্রায়ে গদ্যকে কঠিন কিংবা অনাবশ্যক শব্দবহুল করে তোলা হয়নি। এটা কিন্তু সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর। তবে পাঞ্জীর গোড়া থেকেই সহজ এবং চলতি গদ্য লিখতে চেয়েছেন বলেই হয়তো দিগ্‌দর্শনের গদ্যও সহজ হতে পেরেছিল। তবে কাশীপ্রসাদ ঘোষ যে মিশনারী গণ্ডের নিন্দা করেছেন কিংবা পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে

যে গল্পকে বাস্তব করেছেন দিগদর্শনে ঠিক সে রকম গল্প ভক্তি দেখা যায় না।" এর রচনা বরং যেন একটু সাংবাদিকতারই ধার ধেরে গিয়েছে। ফুলের পাঠ্যরূপে এই আদর্শ সম্মুখে থাকলেও সংবাদপত্রেই এই ভক্তি প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-এস্থ রচনায় কিন্তু তা' বিশেষ অদৃশ্যত হয় নি। যদি হোত, তবে 'আলালের ঘরের দুলাল' এর মত এস্থ আরো আগেই হয়তো রচিত হোত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বঙ্গভূমির মহাভূক্তিক' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এটা লেখা হয়েছিল 'দ্বিযাত্রার মদ্যহর' নিয়ে। তখনও পর্যন্ত এমন বুদ্ধ ব্যক্তি বেঁচেছিলেন যার কাছ থেকে লেখক ভূক্তিকের বিবরণ সংগ্রহ করে থাকবেন। বর্ণনাটি এমনট প্রাণবন্ত যে মনে হয়, গল্পের সেই প্রথম যুগেও যেন নিজের ভোখে দেখা মদ্যহরকে ভাবায় রূপান্তরিত করতে লেখকের কিছুই অস্ববিধা হয় নি। নিদর্শন হিসাবে এই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

“তৎসময়ে আগষ্ট মাসে অতিদূর আকাশে একটা ভয়ানক তুল্লঙ্গ দর্শন হইল, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের স্থায়, সে কখনও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিল, এবং কলিকাতার উপরিভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল; যেদিন অতিশয় গ্রীষ্ম সেই দিন ঐ মেঘ নোচে দুই চটল তাহাতে তিন দিন পর্য্যন্ত লোকদের অনেক ভাবনা জন্মিল তৃতীয় দিবসে মেঘারম্ভ ও অতিশয় গ্রীষ্ম হইলে ঐ কৃষ্ণ মেঘ এত নিচে আইল যে সকলে সুন্দররূপ দর্শন করিতে পাইল, তখন বিশেষ রূপে জানা গেল যে বংশকীটের মত বড় পতঙ্গ রক্তবর্ণ শরীর এবং মস্তক ও চক্ষু বড় ও মধুমক্ষিকার মত জ্যেগীষক উড়বার সময়ে অতি ক্ষুদ্র হেথার স্থায়; কিন্তু তাহা হইতে লোকেরদের এমত ভয় হইল যে কেহ তাহার একটাকে ধরিল না। সাইট্রিশ পল পর্য্যন্ত বৃষ্টি সমকালীন সকলে একস্থানে নিশ্চিন্ত রূপে রহিল। পরে চারিহস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং কিঞ্চিৎকাল পরে তত নামিল, পরে বায়ু কোণ হইতে একটা বায়ু উঠিয়া দুইদিন পর্য্যন্ত থাকিল, ঐ বায়ুসঙ্গে পূর্ব্বমত উঠিল ও নামিল কিন্তু অধিক লীড়রূপে। তাহার পর দিবস অতি প্রভাতে আকাশ শূন্য দেখা গেল। এই মেঘদর্শন হওনের পূর্ব্ব কতকদিন ভেক ও কীটাদি রাত্রিকালে বৃষ্টি পতন সময়ে

অবিরত শব্দ করিয়াছিল, তাহারে এককালে এমনত অদৃশ্য হইল যে মনোভির আর কোনখানে তাহার দেখা গেল না ও শুনা গেল না।”

এই প্রবন্ধ একটি ছোট কাহিনী দিবে উপসংহার করা হয়েছে, সেটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা হুসোখা। এই কাহিনীটুকুতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য এবং মহত্ত্বের প্রতি স্রষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই দৃষ্টি প্রবন্ধকারের নয়, এ দৃষ্টি শিল্পীর।—

“এই চুক্তির অজ্ঞাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মন হঠাতে লুপ্ত হয় নাই, এবং অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনাদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই চুক্তির বৎসরদ্বারা গণনা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ এক জন ইংরেজীয় সাহেব দানার্থে তঁহুল সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন, এবং লোকেরা স্বঃ আহারার্থ স্বঃ সম্ভান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল, ইহাতে স্নেহবিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ কালের আহার মাত্র তাহার পাইল। ঐ সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহাদিগকে ক্রয় কর, এবং যাবৎ চুক্তির থাকিবেক তাবৎ তাহারদিগকে আহার দেও। ইহাতে অনেক শত বালক তাহার দয়াপ্রযুক্ত মুক্ত হইতে রক্ষা পাইল। পুনর্ব্বার শুভিক কাল হইলে সৰ্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে, যেহে লোকের সম্ভান আমার এখানে আছে তাহার লইতে চাহিলে বিনামূল্যে তাহারদিগকে পাইবেক। এই আশ্চর্য্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহই আইল না, কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী বধির ও বোবা আপন পুত্রকে লইতে আইল।

এই উক্তি পেকেই দিগদর্শনের গদ্যভঙ্গির আভাস পাওয়া যাবে। সেকালের দিনে নিছক মাসিক পত্রিকা পড়ার উৎসাহ হয়তো তখনও তেমন প্রকট হয়নি। কিন্তু স্থূলপাঠ্যরূপে এই পত্রিকার সার্থকতা অল্পকৃত হয়েছিল। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রেই কলিকাতা স্থূল বুক সোসাইটির প্রকাশিত দিগদর্শনের সংস্করণ নিয়েই শুধু এই প্রবন্ধে আলোচনা করা গেল।

‘তত্ত্বাবোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস

বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও অলিখিত। সম্ভবতঃ আধুনিক কালে বাঙালী মধ্যবিত্তের ব্যর্থতা ও অধঃপতনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেই অনেকে এ’ শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রত্যাশা হ’তে পারেননি। ইংরাজ স্বত্ব পরগাছা রূপে এর বর্ণনাও নাথাকত। স্তব্ধতা পোষণ করেই কিস্তি এসব সমালোচনা বহুল পরিমাণে একদেশদশী। বস্তুতঃ বাঙ্গলার উন্নয়ন শতাব্দীর নবজাগৃতি বা রেগেশন’ সম্পূর্ণ এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক স্বত্ব এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম মুক্তি-আন্দোলনের প্রবর্তন এই শ্রেণীর দান মোটেই সামান্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে উন্নয়ন শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে উক্ত শ্রেণীর অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় সে যুগের একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সংঘ “তত্ত্বাবোধিনী সভা” ও তার অদ্ব্যতন অধিনায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

বাঙ্গলা দেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হ’বার পূর্বেই নবাবী আমলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন হয়। ইংরাজ শাসনের আমলে এর প্রসার ও সংহতি ক্রমে বাড়তে থাকে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হ’লে পূর্বতন ভূম্যধিকারী সমাজের ভিত্তি ভেঙে যায় এবং জমির অধিকার অনেক স্থলেই আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে। তার উপর সওদাগরী অফিসে ও সরকারে চাকরী করে এবং তেজগারী ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকগুলি মধ্যবিত্ত পরিবার এই সময়ে যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয় ক’রেছিলেন। সে’কালে এ’দেশে প্রচলিত

• ১৩৪৫ সনের চৈত্র সংখ্যার প্রকাশী’তে বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে তত্ত্বাবোধিনী সভার গৌরববহু ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস যে প্রবন্ধটি লেখেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তত্ত্বাবোধিনী-যুগ নিয়ে উত্তরকালে যিনি আলোচনা করতে অগ্রসর হ’য়েছেন বা হ’বেন, তাঁর পক্ষে উক্ত তথ্যসমূহ অতিশ্রুতি এবং দুর্লভিত রচনাটির নিকট ৩৭ স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নেই বা থাকবেনা। বর্তমান লেখকও সানন্দে সে স্বীকার করছেন।

প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষা দীক্ষার প্রায় সবটুকু এঁদেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। উপরন্তু দেশে নবাগত পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ঘটছিল প্রধানতঃ এই জ্ঞেয় লোকদের। সম্পদবৃদ্ধি ও মানসিক প্রস্তুতির ফলে এঁরা ক্রমশঃ নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। জীবনের সর্বশেষে বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এঁদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে প্রকাশ পেল। এই যুগসন্ধিক্ষেপে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে জাতীয় জীবনে এক বিরাট শক্তিরূপে গড়ে উঠছে, এই বোধ রামমোহনের পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর রচনায় বহুস্থানে এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সম্পাদিত সুবিখ্যাত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা “সম্বাদ-কৌমুদী” (প্রথম প্রকাশ কাল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) যদিও এখন আর খুঁজে পাওয়া যায়না, তবু মৌজাগ্যবশতঃ তাঁর অনুষ্ঠানপত্র এবং কিছু কিছু বিষয়বস্তু ইংরাজী অনুবাদে সমকালীন হস্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় রক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় সংখ্যার একটি বিষয়বস্তু ১৮২২ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখের Calcutta Journal এ ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে: “Another appeal to Government to take into their benevolent consideration, the serious privation under which the middle class of our Native subjects labour for the want of proper Medical advice and treatment.....”^১ এখানে অনুবাদে Middle class’ লক্ষ্যটি লক্ষ্যণীয়। মধ্যবিত্ত জ্ঞেয় ক্রমবর্ধমান সংহতি সম্পর্কে চেতনা রামমোহনের পূর্বে কোনও ভারতীয় নেতার মধ্যে সক্রিয়রূপে দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায় না। পরবর্তী কালে রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত সাময়িক পত্রগুলিতে মধ্যবিত্ত জ্ঞেয় উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আরও পরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮২৯ সালের ১০ই জুন তারিখের Bengal Herald পত্রিকার (রামমোহন তখন তাঁর অস্থায়ী স্বাধিকারী) সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত “On the prosperity of Bengal in 1829” শীর্ষক রচনা থেকে কিকিৎ উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে^২:

১। J. K. Mazumdar Rammohun Roy and Progressive Movements in India : Selection from Records (1775-1885) p. 286.

২। Selections from Indian Speeches and Documents on British Rule (1821-1918) edited by J. K. Mazumdar pp 36-37.

"There can be little doubt that the increase of wealth in Calcutta and throughout Bengal has been rapid within the last few years and we are naturally led to enquire the reason thereof. The value of land may be assigned as the more immediate and the lesser restrictions on commerce and greater introduction of Europeans as the primary cause of the beneficial change.....Land has been purchased in Calcutta thirty years ago for fifteen rupees, now it is worth and would sell for three hundred rupees...By means of this territorial value a class of society has sprung into existence that were before unknown; these are placed between the aristocracy and the poor and are daily forming a most influential class. Previous to their formation the wealth of the country was in the hands of a few individuals, while all others were dependant on them and the bulk of the people were in a state of abject poverty of mind and body which will perhaps form a juster reason for the pervading moral bondage of the Hindoos than the more spacious ones of climate and religion...It is the dawn of new era. Whenever such an order of men have been created freedom has followed in its train. Do we need an example? Look at England after the Norman conquest when the people were serfs and the landholders lived as Zemindars of this country did some years ago; but watch their progress upto the eighth Henry, when wealth became more equally diffused and continue the view until the son of a butcher dethroned and decapitated a monarch and made the Republic of England feared and admired by the world. Do we need an instance of the misfortune of having only two ranks in a country; look at Spain where every man that can afford it lives without either mental or bodily labour and claims the rank of a Hidalgo. Need we go farther—look at unhappy Poland where the peasantry are sold. With the many example of this

nature before us, it may not be deemed presumptuous to assert that this middling class of inhabitants in Bengal afford the most cheering indications of any that exist at the present period.” এই প্রবন্ধের বাঙালা অনুবাদ প্রকাশিত হ’য়েছিল ১৮২৬ সনের ১লা আষাঢ় তারিখের “বঙ্গদূত” পত্রিকায়।* বলা বাহুল্য রামমোহন রায় শেখোক্ত পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রক্ষা করতেন। দেখা যাচ্ছে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যাবসানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় যে জাতি ও সমাজের মঙ্গল সূচনা করে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের এই ক্রমটি রামমোহন ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের চোখে সুন্দর রূপে ধরা পড়েছিল এবং ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত অহুস্কার করে এই বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই জগুই দেশের ও সমাজের উন্নতিকল্পে রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি মোটেই বিস্তারিত “সৌখিন দরিদ্রনারায়ণের সেবক” ন’ন। তাঁর সমস্ত উত্তমের মূলে কার্যকরী হ’য়েছে এই বলিষ্ঠ সমষ্টিচেতনা। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। ১৮২২ সালের আগষ্ট মাসের Calcutta Journalএ “সম্বাদ-কৌমুদী”র অঙ্গুষ্ঠান পত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হ’য়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে : “yet virtually it is the ‘Paper of the Public’ since in it they can at all times have inserted anything that tends to the public good, and by a respectful expression of their grievances be enabled to get them redressed if our countrymen have not already been able to effect that desirable object by publishing them in English.” বোকা যাত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভিত্তিতে Public বা জনসাধারণের কল্যাণসাধনই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। রামমোহনের এই জ্ঞেয়চেতনা

৩। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (তৃতীয় সংস্করণ) প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৯৮—৩৯৯

৪। J. K. Mazumdar—Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India p. 302

যে আকস্মিক নয় সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁর স্বীয় শিক্ষার ও শিক্ষাবিস্তারপ্রচেষ্টার ইতিহাসে এর যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। জন ডিগ্‌বীর অধীনে যখন তিনি কর্মে রত সেই সময়ে নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ডিগ্‌বীর স্বয়ং স্বাক্ষর দিয়েছেন : "He was in the constant habit of reading the English newspapers of which the Continental politics chiefly interested him." প্রথমে নেপোলিয়নের বীরত্ব-কাহিনী তাঁকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তিনি নেপোলিয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েন এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ উত্তরোত্তর তাঁর গভীর সহানুভূতি লাভ করে। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ লীল লক্ষ্য করেছেন : "His ardent curiosity was roused by the two great contemporary movements, the American Independence and the First French Revolution... and his studies were directed to the literature of Rationalism in Religion and Liberty in Politics." তাঁর দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত Anglo-Hindu school নামক বিদ্যালয়তনের পাঠ্যভালিকায় হিউন, ভলটেয়ার প্রভৃতির পুস্তকও স্থান পেয়েছিল। ঊত্তরকালে দেখা যায়, ফরাসী জাহাজে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে উজ্জ্বলিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।^১ বিপ্লবাদর্শের প্রতি তাঁর অগ্রদূত মনোভাবের আরও নিদর্শন আছে। স্বেচ্ছাচারী স্প্যানিশ শাসনতন্ত্রের কবল থেকে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তিসংবাদ যখন তিনি পান, তখন কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁর উক্তি স্বরণীয় : "What! ought I to be insensible to the suffering of my fellow-creatures wherever they are or however

১। S. D. Collet—Life and Letters of Raja Rammohun Roy (edited by H. C. Sarkar) p. 15

২। Brajendranath Seal—Rammohun, the Universal Man (New Edition, published by the Sadharan Brahmo Samaj) p. 6

৩। Collet—op. cit. p. 178

unconnected by interests, religion and language ?” অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যবাদের চাপে যখন শেষ পর্যন্ত নেপলসের নিয়মতান্ত্রিক শাসন অবলুপ্ত হয়ে গেল, রামমোহন এই সংবাদ শুনে শোকে মুহুমান হয়ে তাঁর বন্ধু জেমস্ বাকিংহামের সঙ্গে পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার বন্ধ রাখেন এবং তাঁকে লেখেন (১১ই আগষ্ট ১৮২১) “.....my mind is depressed by the late news from Europe.....I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.” ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের যে নতুন constitution ঘোষিত হয়, স্প্যানিশ ভাষায় লেখা ও ছাপা তার একটি স্মৃহৎ সংস্করণ ফিলিপাইন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং Liberalissimo (উদারতম), Noble (মহাশুভ) Sabio (জ্ঞানী) এবং Virtuoso (পুণ্যাত্মা), Brama (ব্রাহ্মণ) রামমোহন রায়কে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।^১ সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সর্ববিধ শৃঙ্খল ভাঙবার প্রয়াসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপে এবং পৃথিবীর অস্থান্য বিভিন্ন স্থানে যে যুক্তিসংগ্রাম শুরু করেছিল তার সম্পর্কে রামমোহনের কি গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতি ছিল পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। ‘সম্বাদ কোমুদী’ ‘Bengal Herald’ ‘বঙ্গদূত’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পূর্বোক্ত উক্তিগুলির সঙ্গে এগুলি মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় বাঙালার জ্ঞানীমুনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক ইতিহাসের যথাযথ অনুশীলন একযোগে তাঁর সমাজ-চেতনাকে জাগরিত এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই জন্যই জাতীয় জীবনের সুগন্ধিকরণে রামমোহনের নেতৃত্ব সার্থক ; জাতি তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছিল সমৃদ্ধ দৃষ্টি এবং সর্বাঙ্গীন সুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা। স্বীয় কর্মক্ষেত্রে রামমোহন বিভাবুদ্ধি প্রতিভাতে ঋষ্ঠ হলেও একক ছিলেন না, রামচন্দ্র বিভাবাগীশ, ধারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, ভাস্করাচাঁদ চক্রবর্তী, মন্টেগোমারী মার্টিন প্রভৃতির সঙ্গে মিলে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ এঁরাই ছিলেন সে যুগের ‘ডোমিন্যান্ট মাইনরিটি’।

১। এই গ্রন্থগানি কলিকাতা রাহমোহন লাইব্রেরীতে আছে।

যে সমষ্টিচেতন। এঁদের কর্মধারাকে উদ্ভাসিত করেছিল, তা। রামমোহনের মৃত্যুর পরে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এই সমষ্টিবোধ পরবর্তীকালেও জনমানসে সক্রিয় থাকার দরুণ দেখতে পাই উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বাঙলা দেশে ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, জ্ঞান অর্জন, প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে অগণিত সংস্থা সভা সমিতি সংঘ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। 'একা ডেমিক এসোসিয়েশন' 'এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন' 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' (বা সাধারণ জ্ঞানোপাধিকার সভা), সমাজোন্নতি বিধায়িনী ব্রহ্মদ সমিতি, বিজ্ঞানোদ্ভিদী সভা, সভা-জ্ঞান সফারিণী সভা, নিত্যজ্ঞান প্রচারিণী সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সর্বভাষাভাষিকা সভা, বিজ্ঞানসাহিত্যী সভা, গৌড়ীয় সমাজ প্রদূপ প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ১৮৩৯ সালে স্থাপিত 'তত্ত্বাবোধিনী সভা' তৎকালীন এই জাতীয় সংঘগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী কুড়ি বৎসর কাল বাঙলাদেশের চিন্তা ও কর্মজগতে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী।

সমাজ চেতনা রামমোহন প্রবর্তিত মুক্তি আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার আর একটি দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিত প্রগতিপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। একদল ছিলেন তদানীন্তন হিন্দুকলেকের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত। ধর্ম সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসার পন্থা অবলম্বন করে ছাত্রদের অনুসন্ধিসা ভাগানো এবং এই ভাবে তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে অভ্যস্ত করে তোলা ডিরোজিওর অধ্যাপনার লক্ষ্য ছিল।^{১০} এর প্রভাব তাঁর ছাত্রদের উপর হয়েছিল একই ভিন্ন রকমের। সব বিষয়েই এদেশীয় প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও আদর্শ গুলিকে তাঁরা নস্যাৎ করে দিতে আরম্ভ করলেন। ভারতীয় জীবনচর্চার প্রতি তীব্রবুণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অহুরে দেখা

৯। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৭৬৬ শব্দ, পৃঃ ১৫৮

১০। মনে রাখতে হ'বে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের 'সমাজসংস্কারী নাস্তিক' হতে শিক্ষা দেননি এবং তিনি স্বয়ং সম্ভবতঃ নাস্তিক ছিলেন না। ব্রটব্য Edward Thomas—Henry Derozio pp 82-84; ছাত্রসমাজের মনকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠন করাকেই তিনি শিক্ষার আদর্শ বলে মনে করতেন।

দিল নবাগত ইউরোপীয় ভাষা সাহিত্য ও সভ্যতার উপর একপ্রকার উৎকট এবং অন্ধ প্রীতি। “If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism”— এই জাতীয় উক্তিও তাঁদের মুখ থেকে নির্গত হওয়া সম্ভবপর হল।^{১১} অপরপক্ষে রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ক্লাসিকাল ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে যুগোপযোগী রূপে আধুনিক জীবনে তার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের সাধনার লক্ষ্য। ইউরোপীয় নবজাগৃতির চিন্তানায়কগণও এইরূপেই প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনে সংস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন একদিকে সংস্কৃত ভাষায় সে যুগের অসুতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অষ্টান্তবাদী নৈদান্তিক (তাঁর নিজের ভাষায় আচার্যের বা শঙ্করাচার্যের শিষ্য) এবং শাস্ত্রবিচারে ও শাস্ত্রা-লোচনায় হুনিপূর্ণ ; অপরদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শনের যুক্তিবাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত, ইসলামীয় যুক্তিপন্থী মতাজালা ও মওয়াহেদীন সম্প্রদায়ের স্বাধীন চিন্তামূলক ধর্মমত কড়াকড় উদ্ধৃক এবং স্বর্গের (প্রচলিত স্বর্গধর্মের নয়) নৈতিক আদর্শে আস্থাযুক্ত। বেদ উপনিষদের যুগ থেকে মধ্যযুগ (কবীর, নানক, দাছু প্রভৃতি সাধকগণের কাল) পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিক সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, আধুনিক যুগে তিনি তারই উত্তরাধিকারী। তাঁর জীবনের এক কোটিতে সক্রিয় সমষ্টিচেতনা, অপর কোটিতে উক্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও দৃষ্টি। এই দুইএর মধ্যে সেতু নির্মাণ তাঁর অসুতম প্রধান কীর্তি। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বর্ণভেদ ও বহুদেববাদের ভিত্তিতে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, জাতি ও সমাজকে দুর্বল ও অহুঃসারশূন্য করে কেলেছে। এর প্রতীকার স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসিত ব্রহ্মবাদের উপর নবসমাজের ভিত্তিস্থাপন করে জাতীয় জীবনে প্রাণসঞ্চার ও ঐক্যস্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৮২৮ সালের ১৮ই জুন তারিখে কোনও বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লেখেন^{১২} “The distinction of Castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling and the multitudes of religious rites and ceremonies and the laws of purification have

১১। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতত্ত্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি নবসমাজ পৃঃ ২১

১২। Collet—op. cit. p. 124

totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise.....It is I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.” ভারতবাসী সম্পর্কে রামমোহনের এই উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতীয় ব্রহ্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও সমাজকে পুনর্গঠন করবার আদর্শও তত্ত্ববোধিনী সভা উত্তরাধিকারসূত্রে রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিগণের নিকট থেকে লাভ করে।

১৭৬১ শকাব্দের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর) পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশকে আচার্যপদে বরণ করে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীসভার প্রতিষ্ঠা করেন।^{১০} স্থাপয়িতার আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্বেগের সঙ্গে উক্ত সভার জন্মের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রথম বয়সে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রদর্শনাদি আলোচনা করেও অন্তরের ধর্ম-জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীব্র মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন, সেই সময় তিনি একদিন (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ?) রামমোহন রায় সম্পাদিত “ঐশ্যোপনিষদে”র একখানি টেড়া পাতা কুড়িয়ে পান। তাতে “ঐশ্যোপনিষদং সর্বং.....” ইত্যাদি শ্লোকটির লক্ষ্যে পেয়ে এবং তার মর্মার্থ অবগত হয়ে তিনি ঐশ্বিত্য শাস্ত্র লাভ করেছিলেন। এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উপনিষদ অধ্যয়ন করবার পর প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর অনাস্থা দূরতর হয় এবং রামমোহন প্রচারিত একেশ্বরবাদ অনুশীলন করবার প্রবল আগ্রহ জন্মায়। এই আগ্রহের ফলেই তত্ত্ববোধিনী সভার সৃষ্টি। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের “বেঙ্গল হরকরা” পত্রে প্রকাশিত “Historical Sketch of Vedantism” নামক প্রবন্ধ ঐ বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে “The Sabha owes its birth to its founder's accidentally finding a flying sheet of Rammohun Roy's edition of the Ishopa-nishad and discovering in it the most sublime and

the purest ideas that can be formed of the Divinity.”^{১০} মাত্র দশ জন সভা নিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।^{১১} কিন্তু সভাসংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে চলেছিল। সভার ১৭৬৮ শকের “সাংসারিক আয়-ব্যয় হিতির নিরূপণ পুস্তক” থেকে জানা যায়, ঐ সময়ের (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের) মধ্যে সভাসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬৫৮ (ছয়শ’ আটত্রিশ)।^{১২} জুসেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় (যিনি এই সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এর আদর্শের অগ্রদূতগণ ছিলেন) সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরবর্তীকালে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হ’য়েছিল আটশতেরও অধিক।^{১৩} সে যুগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ প্রায় সমার্থক ছিল। দেবেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়, নবপ্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রায় বিলুপ্তির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ না ঘটলে উক্ত সমাজের কি পরিণাম হ’ত বলা যায় না। আলোচনাদির পরে স্থির হয়, এই সভার উপাসনার কার্য ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের কাজ সভা করবে।^{১৪} পূর্বোক্ত ১৭৬৮ শকের সভার আয়ব্যয় হিতির নিরূপণ পুস্তকের ভূমিকায় এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হ’য়েছে, “এদেশে কাল্পনিক ধর্ম নিরাকরণপূর্বক বিস্তার রূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই এ’সভার সমস্ত, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম ধার্য আছে বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন।” কার্যবিবরণীতে মুদ্রিত নিয়মাবলীও ভূমিকার এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন ক’রে। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ শকে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) সভা তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে কলিকাতা

১০। তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৭৬৯ শক, পৃ: ১০৮

১১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৬ শক, পৃ: ৭০

১২। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের সাংসারিক আয়-ব্যয়-হিতির নিরূপণ পুস্তক পৃ: ১০

১৩। জুসেব মুখোপাধ্যায়—বাল্যাবস্থা ইতিহাস, তৃতীয়ভাগ (১০১০ বঙ্গাব্দ) পৃ: ৩৯

১৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (নবসংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) পৃ: ১৯—২০

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিশে যায়। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভার ইতিহাস বলতে বুঝায় ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, এই কুড়িবৎসরের কাহিনী। কালক্রমে অল্পসারে এই দুই দশক বঙ্গলাল নবজাগৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী রামমোহন যুগ এবং পরবর্তী কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, নুরেশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির যুগের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী যুগ সেতুবন্ধপ। এর ইতিহাস সত্যক না জানা থাকলে পরবর্তী যুগটিকে বুঝতে পারা কঠিন।

বিভিন্ন সময়ে ধারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জনকয়েকের নাম এখানে তুলে দেওয়া গেল। নিম্নের তালিকা থেকেই এই সভার সার্বজনীনত্ব ভাল করে বুঝতে পারা যায় :

(১) পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞানাসীল (২) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর (৩) দেবেশ্বনাথ ঠাকুর (৪) অক্ষয়কুমার দত্ত (৫) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৬) রাজনারায়ণ বসু (৭) রানতনু লাহিড়ী (৮) রামগোপাল ঘোষ (৯) কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১০) নবগোপাল মিত্র (১১) চন্দ্রশেখর দেব (১২) শচুনাথ পণ্ডিত (১৩) শিবচন্দ্র দেব, (১৪) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) (১৫) অনুভূতলাল মিত্র (১৬) তারারাম চক্রবর্তী (১৭) ষারকানাথ মিত্র (১৮) মহেন্দ্রলাল সরকার (১৯) দিগদ্বর মিত্র (২০) জয়গোপাল মল্লিক (২১) কিশোরীচাঁদ মিত্র (২২) ভোলানাথ চন্দ্র (২৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২৪) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (২৫) কীর্তিচন্দ্র মিত্র (২৬) প্যারীমোহন বসু (২৭) রামচন্দ্র মিত্র (২৮) প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) * (২৯) হরমোহন চট্টোপাধ্যায় (৩০) কৈলাশ চন্দ্র বসু (৩১) গোবিন্দচন্দ্র সেন (৩২) গোপাল চন্দ্র চন্দ্র (৩৩) গোপাল চন্দ্র মল্লিক (৩৪) রাজা সত্যশরণ ঘোষাল (৩৫) রাজা সত্যচরণ

১২। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের আরব্যারের হিসাব সম্পর্কিত পুস্তক ১৭৬৯ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে মুদ্রিত ১৭৬৯ শকের সভার সভ্য-তালিকার প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ও তাঁর প্রবন্ধ টীকার পরিমাণ উল্লিখিত আছে। অথচ ৮তমদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-সাধক চরিত্র মালাতে প্রকাশিত তাঁর প্যারীচাঁদ-জীবনীতে, প্যারীচাঁদ যে সকল সভা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেগুলির তালিকা থেকে তত্ত্ববোধিনী সভার নাম সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন! (দ্রষ্টব্য প্যারীচাঁদ মিত্র—সাহিত্যসাধক চরিত্রমালা পৃ: ১২-১৪)

ঘোষাল (৩৬) রমানাথ ঠাকুর (৩৭) গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৮) ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৯) নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪০) রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর (৪১) গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪২) উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর (৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা জোড়াসাঁকোর মহাবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'তে পৃথক ব্যক্তি)।^{১০} (৪৪) বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪৫) জামাচরণ সরকার (ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা) (৪৬) বৈকুণ্ঠনাথ সেন (৪৭) রাধাপ্রসাদ রায় (৪৮) রমাপ্রসাদ রায় (৪৯) রাজারাম রায় (৫০) কালীপ্রসাদ ঘোষ (৫১) কালীশ্বর মিত্র (৫২) রামনারায়ণ বিজ্ঞানরত্ন (৫৩) বাণেশ্বর বিজ্ঞানস্বার (৫৪) আমল চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ (৫৫) জামাচরণ তত্ত্ববাগীশ (৫৬) দয়ালচন্দ্র শিরোমণি (৫৭) শ্রীধর বিজ্ঞানরত্ন (৫৮) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯) কালীপ্রসন্ন সিংহ (৬০) মধুসূদন দত্ত (৬১) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬২) মি: বিটসন (৬৩) মি: চ্যাপমান (৬৪) মি: স্যামুয়েল হিল (৬৫) লাল হাজারীলাল (৬৬) চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৬৭) সাগরলাল দত্ত (৬৮) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯) মহেশচন্দ্র ঘোষ (৭০) রাখালদাস হালদার (৭১) ব্রজসুন্দর মিত্র (৭২) রাজচন্দ্র রায় ইত্যাদি। এই সুবিভীর্ণ সভ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি কথা স্বভাবতঃ মনে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সে যুগের তিনটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা একত্র মিলিত হয়েছিল। রামমোহন-প্রচারিত ব্রাহ্মবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁর যুক্তি আলোচনের অনুরাগী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, লাল হাজারীলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ছিলেন মুখ্যদল, এঁদের অধিকাংশ যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত।^{১১} সভা গঠনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং। দ্বিতীয়তঃ সভাগণের মধ্যে ভারীচাঁদ চন্দ্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতত্ত্ব লাহিড়ী, অমৃতলাল মিত্র, প্যারী

১০। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের ছই স্বতন্ত্র সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন এবিধের সর্বপ্রথম আখ্যায়িক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত বোগানন্দ দাস (জটব্য "১৯৩৯: তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দী বৎসর" শীর্ষক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৫, পৃ: ৮৩০-৪১)

২১। প্রথম দলের দীক্ষা সম্পর্কে জটব্য—দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ: ৮৪-৮৫

মোহন বসু, গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি সেই দলভুক্ত, যাকে সেবুগে বলতো। 'ইয়ং বেঙ্গল' (নব্যবঙ্গ-সম্প্রদায়)। হিন্দুকলেজের তৎকালীন বহু খ্যাতনামা ছাত্রের, বিশেষতঃ রামতনু, রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, অমৃতলাল, শিবচন্দ্র, প্রভৃতি ডিরোজিও-শিক্ষাগণের নাম তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যতালিকায় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পূর্ণমাত্রায় এবং সাগ্রহে গ্রহণ করলেও রামমোহন ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির পরম অমুরাগী ছিলেন এবং এই দুইকে মিলিয়ে নতুন জীবনদর্শন গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সময়মূলক আদর্শের সঙ্গে উপরিউক্ত তীক্ষ্ণদী ও স্বাধীন-চেতা যুগকব্দের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য ছিল সে কথা পূর্বে বলেছি।^{১*} হিন্দুকলেজের শিক্ষা, ডিরোজিওর প্রভাব, Academic Association, Epistolarly Association, Society for the Acquisition of General Knowledge বা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা প্রভৃতির ফলে এদের মন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হ'য়েছিল এবং সর্ববিধ প্রাচীন বিধিনিষেধের মাগপাশ ছিন্ন করবার মত সংসাহস ও পূর্ততা এঁদের মনে এসেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে এই আদর্শ ছিল কতকটা অভাবাত্মক, মহৎ স্বপ্নের প্রেরণাশূন্য।^{২*} স্পষ্টতঃ রামমোহনের ব্রাহ্ম আদর্শ যখন তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে সর্বসমন্বিত উপস্থাপিত হ'ল তখন তা স্বভাবতঃ এঁদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। কেননা এতে যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসার পাশাপাশি একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি পেলেন। তাই দেখা যায় এঁরা অনেকে সাগ্রহে এই সভার সভ্য হ'য়েছিলেন। সভার সদস্যতালিকায়

২২। অবশ্য ক'রও ক'রও সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়, যেমন ভারীচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেন প্রভৃতি। এঁরা রামমোহনের দেহভাজন ছিলেন। ভারীচাঁদ রাববোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক হন। ঐ উক্তি প্রধানতঃ ডিরোজিওর শাস্ত্রাৎ শিক্ষাবর্গ এবং ডিরোজিও-প্রভাবিত হিন্দুকলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ছাত্রের সম্পর্কেই খাটে।

২৩। ডিরোজিওর দু'একজন ছাত্র, ঐতিবর্ষ গ্রহণ করেছিলেন বটে (বশা, স্বকবোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ), কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর ছাত্রদল হিন্দুধর্মের মত ঐতিবর্ষের ও বিরোধী ছিলেন। তাঁদের যুক্তিবাদ প্রথমদিকে কোনও ধর্মবিশ্বাসেরই অধিকূল ছিলনা।

বাঁদের নাম পাওয়া যায় না। তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা এমন কেউ কেউ নানা-
ভাবে সভার কাজের সঙ্গে যোগ দক্ষ। করে চলতেন বা অন্তর্ক্ষেত্রে সভার আদর্শ
অনুলয়ন করতেন যেমন, বসিকবুফ মল্লিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণা-
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তৃতীয়তঃ সভ্যতালিকায় আর এক দলের
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ঠাৱা ব্যক্তিগত জীবনে দীক্ষিত বা আনুষ্ঠানিক
ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনাতোও
এঁদের আহারিক আহার অভাব ছিল। তেজস্বী সমাজসংস্কারক
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্ব রাধেন্দ্রলাল মিত্র
প্রভৃতি এই দলে পড়েন। তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে সমাজসংস্কার
সাহিত্যসেবা পুরাবৃত্ত প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের অনুশীলন
ইত্যাদির একটি অমূল্য পরিবেশ লক্ষ্য করেই এই মনস্বীরা সভার
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সদস্য তালিকায় যে তিনটি বিদেশী নাম
দেখতে পাওয়া যায় (মিঃ বিটসন, মিঃ চ্যাপম্যান এবং মিঃ সাহুয়েল
হিল) সেগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। এই নামধেরগণ কি
ইংরেজ? অথবা ঠাৱা এংলোইণ্ডিয়ান বা এদেশীয় খ্রীষ্টান? খ্রীষ্টধর্ম
ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার মতভেদ এত স্পষ্ট এবং
লজ্জতা এত তীব্র ছিল, যে কোনও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর পক্ষে স্বচ্ছন্দ্য এই
সভার সভ্য হওয়া একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। সভায় যোগ দেওয়ার
পরেও কি খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস অটুট রাখা এঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল? এই
প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্য পাদরী এডামের কথা আমাদের
স্মরণযোগ্য: মনে হয়। রামমোহনের প্রভাবে ইনি শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টীয়
ত্রিধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারী গণের সঙ্গে এঁর বিচ্ছেদ
ঘটে। তত্ত্ববোধিনী সভার উপরিউক্ত তিনজন সদস্যের ধর্মমতেও কি এই
জাতীয় কোনও পরিবর্তন ঘটেছিল? বিষয়টির অনুসন্ধান আবশ্যিক।^{২২}

২৪। দীক্ষিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ন'ন তত্ত্ববোধিনীসভার এমন অনেক সভ্য
ছিলেন। এঁরা হিন্দুসমাজভুক্ত হ'লেও ব্রাহ্ম আদর্শকে স্বীকার করতেন এঁদের বাবা
ছিলেন, কেননা তখন ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই উন্নততম রূপ বলে মনে করা হ'ত
এবং কর্তৃক্ষেত্রেও হিন্দুসমাজের সববিধ উন্নতিকেই তত্ত্ববোধিনী সভা আদর্শ রূপে
গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে সভার ছিল সম্পূর্ণ বিরোধিতার
সম্পর্ক, বর্মতত্ত্ব ও সংগঠন উভয়দিক থেকেই। সেখানে আপোষরক্ষা বা মিলনের
কোনও যোগস্বরূপ আপাতঃপৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক দেখা যাচ্ছে স্বীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এই পিরাট প্রতিষ্ঠান বাঙালার জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রগতিশীল ধারার সম্মিলন সম্ভব করেছিল। রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সে যুগে গভীরক সাংস্কারমূলক মত ও প্রতিষ্ঠান রূপে নয়, কতগুলি স্বতন্ত্র অগ্রণী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকারী জাতীয় সংগঠন রূপেই জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। অতি অল্পকালের ভিতরে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একটি কেন্দ্রে সংহতিপান, দেবেশ্বনাথের কর্মশক্তি ও সংগঠন প্রতিভার পরিচায়ক।

আলোচনার সুবিধার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যকলাপকে মোটামুটি এই ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন ; (২) ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব চর্চা ; (৩) বাঙলাভাষার চর্চা ও মূখ্যতঃ বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ; (৪) ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ; (৫) সমাজ-সংস্কার ; এবং (৬) পরোক্ষভাবে রাজনীতিচর্চা। এগুলির সম্পর্কে যথাক্রমে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড-গমন ও মৃত্যুর পর থেকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগাযোগ পর্বন্ত সমগ্রটি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক সংকট-কাল। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মাত্র, তাকে সুসংগঠিত করে যাবার অবকাশ পাননি। পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞা-বাগীশের অবিচলিত নিষ্ঠাই প্রধানতঃ এই সংকট মুহূর্তে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল^{২৫}। রামমোহনের অসামান্য অধিকাংশ সহকর্মীর এই নবগঠিত ধর্মসমাজের প্রতি কোনও আন্তরিক ক্রীতি ছিলনা। অনেক সময়ে তারা নিষ্ঠুর ভাণ করতেন। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে : “স্পষ্ট শত্রু যাহারা তাহার। নানা মতে তাহার (অর্থাৎ রামমোহনের) বিরোধি আচরণে সচেত হইল, আর যাহারা তাহার মিত্ররূপে স্বীকার করিত তদ্ব্যতীত কেবলমাত্র স্বার্থপরমাত্র ছিল। ত্রিযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি

২৫। দেবেশ্বনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত পৃঃ ১৬-১৭

আত্মীয়সভার নির্বাহক ছিলেন, তাঁহার অতি কপট ব্যবহার ছিল। তিনি রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধর্মে অচলা ভক্তি জানাইতেন অথচ খ্রীষ্টক হরিমোহন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈকব ধর্মে দৃঢ় প্রভা প্রকাশ করিতেন। অনেক ব্রাহ্মপণ্ডিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া য়েবনিদ্দা ও পৌত্তলিকদের প্রতি ঘেবউক্তি করিতেন ও আপনাদিগকে অতি শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার নিকতন হইতে বহির্গত হইবামাত্র আপনাদিগের প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি অতি অজ্ঞাব্য কটুক্তি করিতে কিছু ক্রটি করিতেন না।^{১১} তত্ত্ববোধিনীসভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন ঘটবার কালে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার সভা গ্রহণ করে। এর পরে আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও প্রচার এই দুই ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মসমাজের ত্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম কোনও অনুষ্ঠানবিধি প্রণয়ন করে যেতে পারেননি। তত্ত্ববোধিনী সভার আমলে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ এই কাজের সূচনা করলেন ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালু হাজারীলাল, শ্রীমানচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানী চরণ সেন প্রমুখ একশ জন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।^{১২} এখন থেকে ব্রাহ্মসমাজে ব্রতধারী দীক্ষিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পতন হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রাচ্যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি ক্রমশঃ গড়ে উঠল এবং একটি প্রতিজ্ঞাপত্রও রচিত হল। এই দীক্ষাপদ্ধতি ও প্রতিজ্ঞাপত্র অবশ্য পরে অনেকবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে কিন্তু সে সব খুঁটি-নাড়ির মধ্যে আমাদের বর্তমানে যাবার প্রয়োজন নেই।^{১৩} তত্ত্বোপাসনা-প্রণালীও এই সময়ের (১৮৪৩-১৮৫২) মধ্যে অনেকবার পরিবর্তিত হয়ে একটি স্থানিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করে।^{১৪} তত্ত্বের দিক থেকে তত্ত্ব-

২৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬২ শক, "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" পৃঃ ১০

২৭। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৮৫

২৮। কৌতূহলী পাঠক দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদক শ্রীসত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংযোজিত পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদটি এই সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন (আত্মজীবনী পৃঃ ৩৭০-৭১)

২৯। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী তৃতীয় সংস্করণ) পরিচ্ছেদ ২২ পৃঃ ৩৮৩-৮৬

বোধিনী সভার যুগে ব্রাহ্মধর্মে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তিবৃন্দ বেদান্তশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য বলে স্বীকার করতেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও এই মতাবলম্বী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর ধর্মজীবনের প্রারম্ভে বেদবেদান্তের অগ্রাধিকার বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন কিন্তু ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ কয়েক জন এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। বহু তর্ক এবং আলোচনার পরে ব্রাহ্মগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বেদান্ত অগ্রাধিকার শাস্ত্র নয় এবং তা ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হ'তে পারে না; তার পরিবর্তে “আত্মপ্রত্যয়সিক জ্ঞানোচ্ছলিত বিজ্ঞানজ্ঞান”কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তই অনেকাংশে এই পরিবর্তনের ভূমিকা দায়ী। অগ্রাধিকার শাস্ত্রে বিশ্বাস পরিত্যক্ত হবার পরে ব্রাহ্মগণকর্তৃক দুটি অভাব অদূরীত হল। দেখা গেল, প্রথমতঃ মনস্ত ব্রাহ্মগণের ঐক্যস্থল ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বপ্রকাশক একটি সরল ও সংশ্লিষ্ট উক্তি প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ব্রাহ্ম (অগ্রাধিকার শাস্ত্র না মেনেও) প্রকার সমস্ত বা পাঠ করতে পারেন এমন একখানি ধর্মগ্রন্থ আবশ্যিক। প্রথম অভাব পূরণ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ রচনা করলেন “ব্রাহ্মধর্মবীজ” এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য বেদ, প্রধানতঃ উপনিষদ, মহাভারত, মহাসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত বাণী সংগ্রহ করে দুইখণ্ডে সংকলন করলেন “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থ। এর দ্বারা ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হ'য়েছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অধিকত্তর সংহতি এসেছিল। ব্রাহ্মধর্মের বর্তমান নামটিও তত্ত্ববোধিনী সভার আমলে সমাজের পক্ষ হ'তে প্রকাশ্য স্বীকৃতি পায় এবং সুপ্রচলিত হয়। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত সাধারণতঃ ‘বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ নামেই জ্ঞাত ছিল। ১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে স্থির হয় ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ নামের পরিবর্তে “ব্রাহ্মধর্ম” নামটিই গ্রহণ করা হ'বে।* তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের তার গ্রন্থ

* ৩০। সমাজের ও সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে “ব্রাহ্ম” বিশেষণটি রামমোহন রায়ের সময়ে একেবারে অজানিত ছিল না। রামমোহন স্বয়ং তাঁর পক্ষে “ব্রাহ্ম সমাজ” কথাটি ব্যবহার করেছেন।

করবার পর থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ত্রুড় বেড়ে গিয়েছিল। ক্রমশঃ ভবানীপুর, খিদিরপুর, বেহালা প্রভৃতি কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সুখশাগর, হুঁহুড়া, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। এই সকল ব্রাহ্মসমাজের কার্যবিবরণ ও এই সমাজগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতার অধিকাংশ সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঐতিহাসিকের পক্ষে এ সমস্ত মূল্যবান উপকরণ বলে বিবেচিত হ'বে। সারা ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একশত একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হ'য়েছিল।^{১১} ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই বিস্তারের সূচনা হয় তত্ত্ববোধিনী বৃগে, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচেষ্টার ফলে। পরিশেষে একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করব। দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার অস্বাভাবিক নায়কগণ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে মনে করতেন। এ বিষয়ে তাদের মতামত ছিল খুব স্পষ্ট। এ বৃগে এইটিই ছিল ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্রাহ্মসমাজকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মগণকে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মত এক একটি পৃথক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা তত্ত্ববোধিনী সভা ও তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিরই ক্রমপরিণতি, ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগ অবচ্ছেদ্য। পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত একটি রচনায় (সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত) এই মনোভাব সুপরিষ্কৃত হয়েছে :^{১২} “.....একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দুশাস্ত্রাগ্রন্থসারেই তাহা হিন্দুধর্মের বিস্তৃত মত। হিন্দুধর্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।.....যদি হিন্দুধর্মের সমুদায় অংশ আমরা বিস্তৃত যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে যারপরনাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্বারা হিন্দুধর্ম সংশোধিত হইতেছে ইহাই বিশ্বাস

৩১। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৫৫ পৃ: ৮০৬

৩২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭২৮ শক, পৃ: ১০৩-০৪

করিয়া থাকি।.....যদিও ব্রাহ্মধর্মে এরূপ উদারতা আছে যে ইহা জাতি বিশেষে কখনই আবদ্ধ থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।” তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্য ও পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ নামক সুবিখ্যাত বক্তৃতাতে প্রায় একই কথা বলেছেন** — “.....জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে বিশেষতঃ বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্মে অধিরোহণ করা অতি সহজ কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মের কত নিকটতর এবং হিন্দুধর্ম কিরূপ সহজে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে তাহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্রোতাসকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুদ্রত আকার।” কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুত্থান ও দেবেশ্রনাথ এবং তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে কেশবের বিচ্ছেদের পর নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন।

(ক্রমশঃ)

৩৩। রাজনারায়ণ বসু—হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (কলিকাতা ১৭২৪ খস)
পৃ: ৪৮-৪৯

ঊনবিংশ শতক বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন

ত্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নিজেকে বিশুদ্ধ প্রাচীন আদর্শের হিন্দু বলেই দাবী করতেন, যদিও তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের কয়েকটি মূলগত পার্থক্য ছিল এবং যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছিলেন সেটা ঠিক আন্তিক্যবাদ (theism) নয়, প্রত্যাশে ধর্মে অবিশ্বাসী একেশ্বরবাদ (deism)। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যযুগে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা অত্যন্ত উগ্র হিন্দু বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকেন। এই হিন্দুবিরোধী মনোভাবের সব চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” নামে বইখানি। সমসাময়িক এবং প্রাচীন যুগের যে সব উপাসক সম্প্রদায় নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন তাদের প্রায় সবগুলির কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে, বলা বাহুল্য সব সময়ে অকারণে নয়। এই হিন্দুবিরোধী প্রচারকার্য স্বভাবতই অনেক সনাতনপন্থীর মনে আঘাত দেয়। ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন গুলিও—যদিও এতে অনেক অত্রাহ্মও যোগ দিয়েছিলেন—রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অনেকটা এই প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারূপেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা দেশে হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু এই নবজাগরণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মনে করাও ভুল হবে। এই আন্দোলনের তলে তলে স্পষ্টই একটা জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সূচনা দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যস্থাপনের অবশ্যজ্ঞাবী কলস্বরূপ যে পান্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আমাদের সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তারই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই নবজাগরণ আন্দোলন। বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও নতুন যুগের নতুন ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারে নি এবং ভিতরে

ভিতরে নিঃশব্দে বহু পরিবর্তনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। রক্ষণশীল দলের মধ্যে যে সব হিন্দু ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের চেষ্টাতেই হিন্দুসমাজের এই আত্মতরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিন্তু এই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্য হতেই সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দু আদর্শের একদল নুতন সমর্থকের আবির্ভাব হয়, যারা প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারাকে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সদর্পে ঘোষণা করতে থাকেন। যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্ম ও নব্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও রকমে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল সেই হিন্দু সমাজই যেন নুতন প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও এখন হতে তার আত্ম-মনাস্ক অভিযান শুরু হয়ে যায়। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখানোর পালাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

যে নবজাগরণ আন্দোলনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি সেটা কোন একটা বিশেষ সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নয়। বহু পৃথক ছোটবড় আন্দোলন নিয়েই এই নবজাগরণ আন্দোলনের ধারা পুষ্ট হয়ে ওঠে। এই নবজাগরণ আন্দোলনের একটা নিখিলভারতীয় রূপও ছিল; কেবল বাংলাদেশের গভীর মধ্যেই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিশেষ প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি সেখানেও এই নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয় এবং এথেকেই এর প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন বা ঐ আন্দোলনকে ভাবের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। তবে বাংলা দেশেই আন্দোলনটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং আমাদের বর্তমান আলোচনাও এই প্রাদেশিক গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের তিনটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি,—পণ্ডিত ও পরিত্রাজকদের প্রচারকার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্দোলন এবং ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে নব্য হিন্দুবাদের প্রথম দার্শনিক সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন পণ্ডিত লশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৪০-১৯২০)। হিন্দুধর্ম ও আচার-

পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা। ইনি শিক্ষিত সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। যদিও তাঁর যুক্তিতর্কের মধ্যে বিজ্ঞানের নামগন্ধও ছিলনা, তবুও অধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হিন্দুদের মনে তাঁর মতবাদ বখেটে প্রভাব বিস্তার করে। আচার্য্য যত্ননাথ তাঁর একটি পুস্তকে শশধর তর্কচূড়ামণির এই অদ্বুত প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে যদিও পণ্ডিতের কোন স্বাভাবিক বাগ্মিতাশক্তি ছিলনা বা তাঁর কঠোরতার মধ্যেও আকর্ষণ করবার কিছু ছিল না, এবং যদিও তাঁর বক্তব্যবিষয় ছিল সম্পূর্ণ নূতন এবং অপরিচিত তবুও সহরের শত শত কেরানী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাপাখানার কর্মী, এমন কি দোকানদারের দলও সন্ধ্যার সময়ে কণ্ঠস্থল হতে বাড়ী ফেরার পথে ক্রান্ত দেহ নিয়েও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং ঘটটার পর ঘটটা ধরে নিশ্চয় হয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় মনে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। শীঘ্রই এই আন্দোলন রাজধানী থেকে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নানাস্থানে নূতন হিন্দুসংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কয়েকজন প্রতিভাশালী হিন্দুপ্রচারক এবং পরিব্রাজকেরও এই সময় আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে ঐক্যপ্রসন্ন সেন (১৮৬৯-১৯৩৯) তাঁর মধুর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণের জঘ্ন এবং পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিহার্য্য তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, নৈলিক চিন্তাশক্তি ও বাগ্মিতার জঘ্ন যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

সনসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও নব্যহিন্দুবাদ আত্মপ্রকাশ করে তিনজন খ্যাতিনামা লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে। এঁরা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেন ও বহ্নিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভূদেব নির্ভাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রাখেন। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ এবং অসংখ্য রচনাগুলির মধ্যে তিনি হিন্দু পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক প্রথাকে আদর্শ রূপ দানের চেষ্টা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ভূদেবই প্রথম জাতীয় ঐক্যবোধকে দৃঢ় করবার জঘ্ন হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।

বহ্নিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তা-

মন্ত্রের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যেও আমরা যেন নব্যহিন্দুবাদের স্বর শুনেতে পাই। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের নেতা বিচারপতি রাগাডে বলতেন, প্রকৃত সংস্কারকের কাজ অনেক সময়ই নূতন কিছু সৃষ্টি করা নয়, অসমাপ্ত সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করা। বহির্মের মধ্যেও আমরা যেন এই কথাটির প্রতিধ্বনি শুনি। ১৮৮২ সালে State-man কাগজে পাত্তী হেষ্টি সাহেব কয়েকটি হিন্দুশাস্ত্রীয় আচারের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেন। 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে বহির্ম হেষ্টি সাহেবের মতামত খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে তাঁর এই প্রথম লেখনী ধারণ। প্রায় এট সময়েরই বিখ্যাত প্রত্যাঙ্কবাদী দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের নিকট লিখিত হিন্দুধর্ম বিষয়ক পত্রাবলীর মধ্যেও বহির্ম হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' নামে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বহির্ম এই দুইটি পত্রিকাতেও তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেন। কোনও মনীষীই তাঁর যুগের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন না, বহির্মের রচনার মধ্যেও আমরা ১৮শ শতাব্দীর মিল-বেদ্যাম প্রচারিত Utilitarian মতবাদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি। যদিও বহির্ম নিজে সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বলেই দাবী করেন তবুও একথা অস্বীকার করা যায়না যে তিনি তাঁর পান্ডিত্য শিক্ষার আলোকে হিন্দুধর্মকে এক নূতন রূপে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে বহির্ম 'নবজীবন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন সেই গুলিই পরে কিছু পরিবর্তিত হয়ে তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়। 'প্রচার' পত্রিকায় বহির্ম হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর উপরেও এক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করেন। 'ভগবদ্গীতা'র এক নূতন ভাষ্য রচনাতেও তিনি কিছুদিন মনোনিবেশ করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি একাজ অসমাপ্ত রেখে যান। ১৮৮৬ সালে বহির্মের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। বহু প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, পুরাণ ও মহাকাব্য আলোচনা করে বহির্ম ভগবান ঈশ্বরকে এক ঐতিহাসিক চরিত্রের রূপ দান করেন। তাঁর এই গবেষণা যে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশ্বরকে আদর্শ-মানব রূপে চিত্রিত করে বহির্ম তাঁর উপাসনাকে মানুষের স্বাভাবিক বীরপূজাপ্রবৃত্তির প্রকাশ

বলে বোধগা করেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহির্মের অভিনব মতবাদ তাঁর করেকটি উপস্থাসকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; এগুলির মধ্যে আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত লশধর তর্কচূড়ামণির পাণ্ডিত্য অশিক্ষিত এবং অধাশিক্ষিত হিন্দু সমাজের উপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল এম্বের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসমাজের উপর বহির্মের প্রভাব ছিল ঠিক সেই ধরনের।

কবি নবীনচন্দ্র সেনও এই হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের অত্যন্ত উদগাতা ছিলেন। নবীনচন্দ্র গীতা এবং মার্কসের তত্ত্বের বঙ্গাভবাদ করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে প্রকার ভাব ফিরিয়ে আনা। মহাভারতের, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাহিনীকে তিনি নূতন আলোকে ব্যাখ্যা করেন। ভারতের বিভিন্ন বিবদমান জাতিগুলিকে এক সার্বজনীন ধর্মে এবং উদার সমাজব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ করে এক ভারতীয় মহাজাতিগঠনের চেষ্টাই তিনি দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে। তাঁর তিনটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ—কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাসের মধ্যেও আমরা এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যতদূর সম্ভব ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। কৃষ্ণ, ব্যাস, অর্জুন, প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যের নায়কদের চরিত্রে প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা আমরা পাই তাঁর রচনাবলীতে। ‘কুরুক্ষেত্র’ পুস্তকে নবীনচন্দ্র কুরুক্ষেত্রের যে চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন তাহা অনেকাংশে বহির্ম কল্পিত কুরুক্ষেত্রের অনুগামী হয়েছিল। এই কারণে সমসাময়িক ‘নব্যভারত’ নবীনচন্দ্রকে বহির্মের অনুকরণকারী বলে অভিযুক্ত করেন এবং এই ব্যাপার নিয়ে বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত নবীনচন্দ্র প্রতিপন্ন করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা সম্পূর্ণ নিজস্ব, বহির্মের কাছে তিনি এ বিষয়ে স্বাধীন নন। কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেন যে বহির্মের ‘কুরুক্ষেত্র’ আগে না প্রকাশিত হলে শিক্ষিত সমাজে তাঁর বইগুলির এত সমাদর হত না।

ভূদেব, বহির্ম, নবীন চাড়াও এম্বের অনেক স্বল্পখ্যাত লেখকের রচনার মধ্যেও আমরা এই নব্যহিন্দুবাদের প্রভাব লক্ষ্য করি। জাতীয়

চেতনার উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর মনে একটা দৃঢ় কান্ডপ্রত্যায় এবং স্বজাতিগরিমার ভাব জাগ্রত হতে থাকে এবং মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরতার জন্য এই জাতীয় চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুদের আবরণে নিজেকে ভূষিত করে। রমেশ দত্ত প্রমুখ দেশপ্রেমিক লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ যে কেবল হিন্দুসংস্কৃতিপ্রাণ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরব কীৰ্ত্তন করে আনন্দ পেতেন তা নয়; তারা মারাঠা শিখ এবং রাজপুতজাতির অভ্যুদয়কেও স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গরূপে চিত্রিত করতেন। রাজপুত, মারাঠা এবং শিখ এই তিন জাতির শত্রুই ছিল ভারতের মুসলমান রাজশক্তি। সুতরাং অনবরত তাদের গৌরব কীৰ্ত্তনের ফলে জাতীয় চেতনা ক্রমশই হিন্দুরূপ ধারণ করতে থাকে এবং একটা প্রকল্প মুসলমান বিদ্বেষের ভাব শিক্ত সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করে। পরবর্তী কালে এই ধরণের প্রচারের ফল বিষময় হয়েছিল সন্দেহ নেই।

৬ হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনের আরও একটা বড় দিক ছিল, সেটা হ'ল ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা। ব্রাহ্ম আন্দোলনের পাশে পাশেই কয়েকটি হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলন এগুয়ে গড়ে ওঠে। অবশ্য সংস্কারের চেয়ে সংরক্ষণের দিকেই এদের লক্ষ্য ছিল বেশী। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে প্রথমেই দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্য্যসমাজ আন্দোলনের নাম করতে হয়। কয়েকটি বিষয়ে দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ব্রাহ্ম নেতাদের যথেষ্ট মতৈক্য ছিল কিন্তু মূলতঃ তারা ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের লোক। দয়ানন্দই প্রথম রব তোলেন—আমাদের বৈদিক সভ্যতার যুগে ফিরে যেতে হবে। বৈদিক ধর্মই তার মতে আদি ও অকৃত্রিম আর্য্যধর্ম এবং বেদের মধ্যেই সকল সত্য, সকল ধর্ম এবং সকল বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব পাওয়া যাবে। বেদবাহ্য সকল ধর্ম এবং সকল শাস্ত্রই হয় মিথ্যা নয় আনলিক সত্য। রামমোহনের মত দয়ানন্দও একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের তিনটি প্রধান অঙ্গ—বহু দেবদেবীর আরাধনা, প্রতিমা পূজা এবং পশুবলি—তিনটিরই তিনি বিরোধিতা করেন। দয়ানন্দ আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারত-বাসীর দুঃখকষ্টের একটি মূল কারণ হচ্ছে দেশে ব্রহ্ম ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণের আগমন। এইভাবে আর্য্যসমাজের মধ্যেই আমরা

প্রথম হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করি। দয়ানন্দই প্রথম অহিন্দুদের হিন্দু করবার প্রচেষ্টা শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষে এক জাতি, এক সমাজ ও এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা। সমাজ সংস্কার ব্যাপারে দয়ানন্দ কিছুটা অগ্রগতিপন্থী ছিলেন। তিনি জাতিভেদে প্রথার পরিবর্তন (বিলোপ নয়) চাই-
জেন, বালাবিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিনাশ হবে এ কথা বিশ্বাস করতেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন যদিও তাঁর ধারণা ছিল যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূলসূত্রই বৈদিক সাহিত্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সকল অগ্রগতিবাদী মতামত সত্ত্বেও দয়ানন্দের ইংরাজা ভাষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সত্ত্বেও অজ্ঞতা এবং সমস্ত আধুনিক রীতিনীতির প্রতি প্রবল বিরোধীতার ভাব তাঁর আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছিল। শুদ্ধি আন্দোলন ও চরিত্রদ্বারের বিখ্যাত গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় আধ্যাত্মজ্ঞের এই প্রতিক্রিয়াশীল রূপটিকে স্পষ্ট সূটিয়ে তুলেছে। আর্থ্যসমাজের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল অবশ্য বাংলা দেশের বাহিরে—সংযুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে এ আন্দোলনের প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছিল। এদেশে প্রধানতঃ অবাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এবং বোধ হয় ধর্মবিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তোলাই হয়েছিল এর একমাত্র ফল। বাংলাদেশে আর্থ্য সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় দয়ানন্দের মৃত্যুর বহু পরে এবং এখানে এ আন্দোলন কোনো দিনই বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে নি।

(Theosophical Society র আন্দোলনকে আমরা এ যুগের দ্বিতীয় সনাতনপন্থী সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। Theosophical Society প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকায় ১৮৭৫ সালে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দুজন অভারতীয়—মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ও কর্ণেল অলকট্‌। কিন্তু ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে প্রবল করে তোলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগুরু কর্ণধার জীমতী অ্যানি বেসান্ট। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং তার বিশেষ প্রাণসম্বন্ধকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল Theosophical Society প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিকতাকে ফিরিয়ে না আনলে

তার নবজাগরণ সপ্তম হবে না। এষ্ট ছিল আন্দোলনের নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অ্যানি বেসান্ট বলতেন যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে গেলে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুধর্মটি যে জগতের সব চেয়ে প্রাচীন এবং সব চেয়ে নিখুঁত ধর্ম এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এত বড় দাবী সে যুগের কোনো ভারতীয় হিন্দুনেতাও করতে সাহস করেন নি। ভারতবর্ষই যে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবে এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের বিষময় ফল নষ্ট করবে এ কথা তাঁরা সদর্পে ঘোষণা করতেন, যদিও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য ভারতবর্ষ গ্রহণ করুক এও ছিল তাঁদের কামনা।

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থাকে মোটের উপর সমর্থন করলেও Theosophical Society'র নেতারা সামান্য কয়েকটি বিষয়ে কিছু সংস্কারের প্রস্তাবও করেছিলেন। ত্রীমতী বেসান্ট বলতেন যে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং মঞ্জুই স্বীকার করে গেছেন যদিও তাঁর মতে মঞ্জুর বিধানকে নিসংশয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক বিধান বলা যেতে পারে। ভারতের নিপীড়িত জনগণের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনও Theosophical Society'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জাতিভেদ প্রথাকে তাঁরা নীতির দিক থেকে নিন্দা না করলেও এর যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের পরুপাতী ছিলেন। বিশেষতঃ বংশগত জাতিভেদ প্রথার তাঁরা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ত্রীশিকার প্রচলন, সমুদ্রযাত্রা এবং বাণ্যবিবাহ নিরোধও তাঁদের সমর্থন ছিল। কিন্তু বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে তাঁরা অভ্যস্ত নিন্দার মনে করতেন এবং অবস্থাবিশেষে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহও তাঁরা সমর্থন করতেন। ত্রীমতী অ্যানি বেসান্টই কাশীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ১৯১৫ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। Theosophical Society'র মতবাদকে আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার এক অঙ্গুষ্ঠ এবং অবিস্মিত সমর্থন বলে মনে করতে পারি। একদল বিদেশী-ইউরোপীয় ও মার্কিন-পণ্ডিতের মুখে এই ধরনের কথাবার্তা স্বভাবতই রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে একটা বিরাট জাতীয় আত্মপ্রসাদের ভাব জাগায়। দক্ষিণভারতে এই আন্দোলন খুবই প্রবল হয়ে উঠে এবং এর ফলে হিন্দুসমাজে সত্যকারের সংস্কার প্রচেষ্টা

চাপা পড়ে যায়। প্রাচীন ব্যবস্থার সমর্থন করতে গিয়ে Theosophical Society'র নেতারা কতকগুলি প্রাচীন কুসংস্কারকে প্রেত্নয় দেন এবং তাঁদের তথাকথিত অলৌকিক রহস্যোচ্চারের চেষ্টা। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে Society'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তা সত্ত্বেও Theosophical Society'র আন্দোলন যে এককালে বাংলা দেশে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না এবং এই সাফল্যের মূলে খুব সম্ভব ছিল শ্রীমতী বেনাটের ব্যক্তিগত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা।)

এযুগের সব চেয়ে শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলন ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারা। রামকৃষ্ণের জীবনী (১৮৩৪-'৮৬) আমাদের সকলেরই সুপরিচিত ; তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাত্মাগান্ধী একজায়গায় বলেছেন-রামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের কাহিনী। এযুগের মুক্তিবাদ এবং নাস্তিকতার দিনে রামকৃষ্ণ ছিলেন জীবন্ত ধর্মের প্রতিমূর্তি। রামকৃষ্ণ তাঁর সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের অনেক কর্মবীর চিন্তানায়ক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁর চরিত্রমাদুর্য্য, ধর্মপ্রাণতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে গিরিশ বোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ কয়েকজন পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সাধক শ্রীঅরবিন্দের মত রামকৃষ্ণ লোকচকুর আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে চাইতেন না। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি অগণিত ভক্তের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে একমত ছিলেন না, তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারেন নি। রামকৃষ্ণের ধর্মমত বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি যে তিনি হিন্দুধর্মের তুচ্ছতম নির্দেশও সমর্থন করতেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের এত বড় সমর্থক হয়েও তিনি ধর্মব্যাপারে সঙ্কীর্ণমনের পরিচয় দেন নি। সব ধর্মই যে সত্য, সবার লক্ষ্যই যে এক এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই উদার মতবাদই শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং সনাতন ধর্মের বাঁদের আস্থা চলে গিয়েছিল তাঁদের বিশ্বাস কিরিয়ে আনে। ধর্ম নিয়ে দলাদলি করা এবং বিভিন্ন উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি মনেপ্রাণে চূণা

করতেন এবং এইখানেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণের বাণীর বহুল প্রচার করেছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬০-১৯০২)। ১৮৯০ সালে শিকাগো ধর্মমণ্ডলভায় যোগদান করে বিবেকানন্দ সহসা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন এবং তারপর চার বৎসর ধরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁর গুরুর বাণী প্রচার করেন। তাঁর পূর্বে রামমোহন এবং কেশব সেনও ইউরোপে ভারতবর্ষের মুখপাত্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্বদেশের গৌরব বর্ধন করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিবেকানন্দের মত সনাতনপন্থী হিন্দু ছিলেন না। তাই বিবেকানন্দের গৌরব সনাতনপন্থী হিন্দুদের মনে যে আত্মপ্রাচার ভাব জাগিয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে যে উদ্বেজনার সৃষ্টি করেছিল রামমোহন বা কেশব সেনের গৌরব তা করতে পারে নি। ইউরোপ পর্যটনের সময়ে বিবেকানন্দের অনেক বিদেশী শিষ্যও জুটেছিল। তাঁদের মধ্যে মাদাম লুই, মিঃ স্কাঙ্ক সুবার্গ এবং মিস্ মার্গারেট নোবলের নাম উল্লেখযোগ্য। মিস্ নোবল কিছুদিন পরে ভারতে চলে আসেন এবং তগিমী নিবেদিতা নাম গ্রহণ করে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ সালে ৩৯ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দের অকালমৃত্যু ঘটে। বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস এবং রামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। এবং সে যুগের উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের মত বেঙ্চারের Utilitarian মতবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সেই জগুই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে হিন্দুগণ জগতের যে কোনোজাতির চেয়ে বড় এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে আধুনিকজগতে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা দেবার আগে ভারতবর্ষকে নিজে অবস্থার উন্নতি সাধন করে জগতের অন্ধাভ্যাস হতে হবে। যদিও বিবেকানন্দ কোনোদিন সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, তাঁর অস্থির চিরকালই একটা তীব্র দেশপ্রেমের

ভাব ছিল এবং এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তিনি বলতেন যে বর্তমানযুগে ভারতের সবচেয়ে বড় অভাব খাদ্যের, আধ্যাত্মিকতার নয়। ভোগসম্পদ পাশ্চাত্যেরই প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার। দেশ হতে সকল সামাজিক অত্যাচার এবং অন্ধ ভক্তির মূলোচ্ছেদ না করলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব একথা তিনি বারংবার বলতেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তার পুণ্যতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশবাসীর শারীরিক মানসিক জড়তা দূর করে তাদের সত্যকারের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে এই ছিল তাঁর ধারণা। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপন্থায় কিন্তু বিবেকানন্দের কোনোদিনই আস্থা ছিল না এবং কংগ্রেসপন্থিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তিনি ভারতবাসীর পক্ষে হয়ে মনে করতেন। বরিশালের স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা অম্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কথোপকথানে তিনি স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। জাতীয় বল্যাগের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে তিনি দেশের যুবকদের ডাক দিয়েছিলেন যদিও সে আহ্বানে বিশেষ সাড়া আসে নি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে প্রগতিপন্থা ছিলেন না যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার মঙ্গলময় দিকটা ভারতবাসী গ্রহণ করুক এছিল তাঁর আন্তরিক কামনা।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উপর। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বেলুড় ও আলমোড়ায় তরুণ সন্ন্যাসীদের সমাজ-সেবার কাজে শিক্ষা দেবার জন্য দুটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবৎসর হতেই মিশনের সেবার কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০০ সালে মাজাজ, কাশী ও মুর্শিদাবাদে মিশনের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিবেকানন্দের শিষ্যদের পরিচালনায় মিশনের কাজ আরও ব্যাপক হয়ে উঠে। এম্বুগের বিবেকানন্দ-শিষ্যদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নব্যহিন্দুবাদের প্রচারার্থ্য এঁর হাতে এক নূতন মহিমা লাভ করে এবং হিন্দু শিল্পকলা, হিন্দু গার্হস্থ্যজীবন, হিন্দু সামাজিক প্রথাপদ্ধতি এমন কি হিন্দু রূপকথাও এঁর লেখনীর স্পর্শ পেয়ে লোকচক্ষুতে নূতন সুসমামণ্ডিত রূপে প্রকাশিত হয়। মিশনের নেতারা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে নব্যভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের ধর্ম করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এই অদ্বৈতবাদকে

ভিত্তি করেই যে মানুষের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব একথাও তারা বিশ্বাস করতেন।

সব ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাসী এই মিশন কোনোদিন শুদ্ধি আন্দোলনে যোগদান করে নি বা নতুন কোনো ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তোলবার উচ্চা প্রকাশ করে নি। সমাজসেবাকে মিশন ধর্মজীবনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে এবং কার্যসূচীর গোড়াতেই তাকে স্থান দিয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীর বহুল প্রচারের ক্ষুদ্র কতকগুলি সাময়িক পত্রও মিশনের পরিচালনায় আছে এবং ইউরোপ আমেরিকাতেও মিশনের কয়েকটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই। ভিতরে ও বাহিরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্য প্রচার করে ভারতীয় আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এই আন্দোলন। পরোক্ষভাবে বিবেকানন্দের বাণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও সাহায্য করেছে এবং দেশের বিপ্লবী কর্মীদের মনেও অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আন্দোলনের অঙ্গকার দিক সম্বন্ধেও আমাদের অঙ্গ থাকা উচিত নয়। একটা জাতীয় অঙ্গমিকার ভাব সৃষ্টি করে এই আন্দোলন আমাদের সমাজের অন্ত্যস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিকে বাধা দিয়েছে। মিশনের সমাজসেবা বা লোকহিতৈষণামূলক কাজগুলি সাময়িকভাবে কল্যাণকর হলেও সত্যকারের দেশগঠনের কাজ তার দ্বারা হয় নি।

বাংলায় ইতিহাস রচনার আদিযুগ

(১৮০১—১৮৫৮)

ক্রীমনোমোহন ঘোষ

অদ্বান্ত নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের মত ইতিহাস অধ্যয়নের ও রচনার আগ্রহ যে আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতেই পাইরাছি তাহা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐষ্টান মিশনারীরাই যে প্রথম প্রবর্তক তাহা বেশি লোকের জানা নাই। এ যুগের সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ ‘রাজ্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ রচিত

হইয়াছিল উইলিয়ম কেরীর নির্দেশে। ইতাই বাঙালীর লিখিত সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা ছিলেন কেরীর বাংলা শিক্ষক ও সহকর্মী রামরাম বসু। 'রাজ্য প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' সামান্য কিছু অভিযোজিত কাহিনী থাকিলেও উহা বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রামাণিক ঐতিহাস বলিয়া গণ্য হইয়াছে^১। কিন্তু কেরীর অদ্ব্যতম সহকর্মী রাজীবলোচন রায়ের লিখিত 'রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্রে'ও কেরীর নির্দেশে রচিত। কিন্তু এই পুস্তকে ইংরেজদের প্রতি ভক্তি বাহ্যব্যবসত কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিকের কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে গিরাজের উচ্ছেদকরে ইংরেজের সহিত যড়যন্ত্রকারী রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্র একজন মহদ্ব্যক্তি (hero) প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

১৮৩০ সালে চলিদাম টেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩১) নামক এক আসামী ভ্রমলোক স্বাধীনভাবে 'আসাম বুরঞ্জী' নামে বাংলা ভাষায় আসামের এক মৌলিক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তখন বাংলা ভাষায় আসামে শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া গণ্য ছিল। ফুকনের বাংলা ভাষায় জ্ঞান নগণ্য ছিল না। ১৮৩২ অব্দে 'কমিটি-অব-পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'^২ এর পৃষ্ঠপোষকতায় বারো জন বাঙালীর দ্বারা Robinson's Grammar of History নামক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস অংশে বাইবেল প্রোক্ত সৃষ্টির বিবরণ, ভাষার বিভিন্নতার কাহিনী, মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, নির্ডায় ও পারসীকগণের বৃত্তান্ত, আথেন্স, স্পার্টা ও থিবিস রাজ্যের উপাখ্যান, ও মাসিডন এবং বাইজানটিয়ান সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত ছিল। আর আধুনিক অংশে ছিল জার্মানী, ফ্রান্স, ইতাদি সমুদয় যুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিবরণ এবং তুর্কী, মিশর, আরব, পারস্য, চীন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বৃত্তান্ত। ইহার সর্বশেষে সময়পঞ্জীতে (Chronological Table) প্রথম ঘটনা ছিল :—“ক্রাইষ্টের জন্মকালের পূর্বে ৪০০৪ (অব্দে) পৃথিবীর সৃষ্টি ও আডাম তাঁদের জন্ম হয়।”

এই সকল ইতিহাসের রচনা ও অনুবাদের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজ নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী

১। নিবিলনাথ রায় কৃত 'প্রতাপাদিত্য' ব্রহ্মব্য।

২। ইহা ছিল সেকালের সরকারী শিক্ষাবিভাগের দ্বানীয়। তখনো কোনও D.P.I. ছিল না।

হইয়াছিলেন। 'বৈজ্ঞান্যপতি' (১৮৩০) আদি এজাতীয় রচনা। কার্য়স্বেরাও এ সম্বন্ধে নিক্রিয় ছিলেন না। ১৮৫২ অব্দে 'কুলপ্রদীপ' নামে কার্য়স্বে জাতিয় এক ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা যে উচ্চার যুগ হইতে উৎপন্ন তাহা সর্বজনবিদিত। তাই তাঁহারা নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিলেন না। তবে বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা' (১৮৫২) নামক গ্রন্থ লিখিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। কার্য়স্বে ও বৈজ্ঞান্যপতির যে কোন ব্রাহ্মণসেবা অবশ্য কর্তব্য তাহাই ছিল উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

১৮৩৯ সালে গোবিন্দচন্দ্র সেন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৪০ সালে তাহার রচিত 'বাংলার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইহা ছিল মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ এমন দূর্বোধ হইয়াছিল যে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানসাগর এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ (১৮৪৯), রামগতি ছায়রত্ন প্রথমভাগ (১৮৫৯) এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৃতীয়ভাগ (১৮৬৫-৬৬) পুনরায় বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৮৪০ অব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অগ্রজ গোপাল লাল মিত্র মার্শম্যানের গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলায় এক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। ইনি সূর্য্যবংশ, রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত হইতে ইতিহাসের আরম্ভ করিয়াছিলেন। মার্শম্যানের গ্রন্থের যে যে অংশে হিন্দুধর্মের সমালোচনা ছিল গ্রন্থকার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সালে শান্তিপুর নিবাসী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সারাবলি' বা 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সারসংগ্রহ' নামে ভারত ইতিহাসের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন। ইহা অনেকটা মৌলিক রচনা। গ্রন্থকার Keightley's India, Marshman রচিত ভারত ইতিহাস, Indian Youth's Magazine এবং Stewart রচিত বাংলায় ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া নিজ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫১ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৮-১৮৫০ অব্দে বৈজ্ঞান্য মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সার সংগ্রহ' নামে দুই খণ্ডে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা মনু রাজবংশাদির সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, রাজাবলি, Brook-এর গেজেটিয়ার, মার্শম্যানের বাংলায় ইতিহাস, Dow রচিত হিন্দুস্থান আদির সাহায্যে সংকলিত হইয়াছিল। এষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নের এক উদ্দেশ্য ছিল মার্শম্যানের ইতিহাসে প্রকাশিত হিন্দু-জাতি ও হিন্দু-ধর্মের ঘানিকর উক্তি সকলের প্রতিবাদ। ইহাতে হিন্দু কালানুক্রম (Chronology)

এবং জাত্যোৎপত্তি-ভেদের সমর্থন আছে। এই ইতিহাসে ১৮৪৩ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে।

১৮৪৮ অব্দে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য যে 'পঞ্জাবেতিহাস' প্রণয়ন করেন তাহাই বোধ হয় বাঙালীর রচিত ও বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গবেষণামূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেবল পাঞ্জাবের ইতিহাস নয়, আনুমানিক ভাবে কান্মীর, কাবুল এবং কান্দাহারেরও কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার সংকলনের জন্ত গ্রন্থকার 'রাজতরঙ্গিনী', 'আইন-ই-আকবরী', 'সয়ের-উল-মুতাখরীন', Princep কৃত রক্তিত সিং, Lawrence কৃত *Adventures in the Punjab*, McGregor কৃত *Sikhs* আদি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন। ত্রিটিশহস্তে সত্তঃপরাকৃত সিংহরাষ্ট্র সম্বন্ধে এদেশে এতটা সত্যসুভূতি জাগিয়াছিল যে, ৩২৫ জন গ্রাহক অজিম মল্য দিয়া এই পুস্তকের গ্রাহকজ্ঞেয়ীভূক্ত হইয়া ছিলেন। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৫৫ এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫৬-১৮৫৮ অব্দে নীলমনি বসাক তিন খণ্ডে এক ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিন খণ্ডে হিন্দু-মুসলমান এবং ইংরেজ রাজত্বের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কোনও পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া স্বাধীন ভাবে রচিত। সেদিক দিয়া গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক হইতে উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে।*

* এ গ্রন্থের বাবতীয় তথ্য Rev Long (লং) বিরচিত A Descriptive Catalogue of 1400 Vernacular Works and Pamphlets হইতে গৃহীত।

বাংলার ঐতিহাসিক দলিলপত্র

জীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

আচার্য যত্ননাথ সরকার মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাডুরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দলিলপত্র কিছুদিন আগে দেখেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে সেখানে ঐতিহাসিক দলিলপত্র নাট বলা যায়। মূল্যবান যা কিছু আছে তা সবই শিয়া ধর্ম মত সম্বন্ধে নানারূপ বাদাম্বাদ। এই গ্রন্থাগার ১৭৬৩ সালের পর গড়ে উঠেছে কিন্তু দিল্লী ও লক্ণৌর লুট থেকে যেমন রামপুর নবাবের গ্রন্থাগার ও খুদাবন্দ লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল, এ গ্রন্থাগার সে ভাবে গড়ে ওঠেনি। পুরনো কোনও মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখানে পাওয়া যায় না। আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরীর ছুটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে যা বোধহয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নকল করা হয়েছিল। লেখা পরিষ্কার, সেজষ্ঠ তুলনা করে পাঠোদ্ধার করার কাজে হয়ত খানিকটা সাহায্য করে। ফারসী ভাষায় লেখা কোনও মূল্যবান পত্রাবলীও এখানে নাই। শুধু আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকের কতকগুলো ছকুম নামার খসড়া পাওয়া যায়। এগুলো মূল্যবান এনায়তুল্লা সত্ৰাটের নির্দেশ মত লিখে রেখেছিলেন। টুকরো টুকরো লেখা। এই সব লেখাই সম্পূর্ণ ও সুবিস্তৃত আকারে আমরা অগ্রত পাই বাহা আচার্য যত্ননাথের *Studies in Aurangzeb's Reign* প্রকাশ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাডুরের মহাফেজখানায় ও গ্রন্থাগারে ঐতিহাসিকদের আর কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অধ্যাপক জীনরোদকৃষ্ণ রায় জীনরেন্দ্র সিং সিংহীর বাড়ীতে কয়েকখানা ফারসী ফারমান দেখেছেন। এই ফারমানগুলোর আলোকচিত্র নিয়ে আচার্য যত্ননাথকে দেখান হবে। তিনি এই ফারমানগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক নীরোদকৃষ্ণ রায়ের মত সমর্থন করলে এগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে। অধ্যাপক রায় ছয়টি ফারমান মূল্যবান মনে করেন—

১। সম্রাট আকবরের একটি ফারমান তারিখ ৯৯৯ হিজরী। এই ফারমানে সরকার সরিফাবাদের অর্থাৎ বর্ধমানের অন্তর্গত মনোহরসাহীর পরগণার জমি ভগবান কানুনগোকে দেওয়া হয়েছিল।

২। সম্রাট মহম্মদশাহের একটি ফারমান। দর্পনারায়ণের পুত্র দৈবর নারায়ণ কানুনগোর নিয়োগপত্র।

৩। ৯৭৮ হিজরী সনের সম্রাট আকবরের একটি ফারমান। সম্রাটের হুকুমের অহুলিপি। কানুনগোর কাজের একটি ফিরিস্তি এতে দেওয়া আছে।

৪। সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি ফারমান ইলাতি সন ১৯। এতে কতকগুলো বে-আইনি আবওয়াব তুলে দেওয়ার নির্দেশ আছে। এই আবওয়াবগুলোর উল্লেখ আমরা আর কোথাও পাই না।

৫, ৬। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুইটি মূল্যবান ফারমান। একটিতে কাজির কণ্ডব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্রাটের উপদেশাবলী দেওয়া আছে। আর একটি ফারমানে এপাতাবাদের সরকার মানিকপুরে হাজী মহম্মদকে মাদ-ই-মাশ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এই ফারমানে আবদুন নবির সীলমোহর আছে। এই আবদুন নবি মধুরার কেশবদেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে প্রসিকি লাভ করেছিলেন। আবদুন নবি তাঁর সীল-মোহরে নিজেকে সম্রাটের শিষ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

ছয়মাসের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ হবে। ১৬২ বৎসর ধরে এই ভূমি ব্যবস্থার ভিত্তিতে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। এই ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ইতিহাস লিখতে হলে মূল্যবান পুঁথিও দলিল পত্র নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক জমিদারই হয়ত তাঁদের পুঁথিও কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবেন। অনেকে নষ্ট করবেন প্রয়োজন নাই মনে করে, অনেকে করবেন গভর্ণমেণ্টের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান দলিলপত্র এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে এতে শুধু ঐতিহাসিকই নয় গভর্ণমেন্টও অসুবিধার পড়তে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তখন কানুনগোদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কানুনগোদের বাড়ীই ছিল মুসলমান আমলের ভূমি সংজ্ঞাও কাগজপত্রের মহাক্ষেত্রানা। প্রজ্ঞাসম্ব সম্পর্কে পাট্টা দেওয়ার কথাও চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তে ছিল। কিন্তু কাহ্ননগোদের চাকরি যখন গেল তখন তারা পুরনো কাগজ পত্রও সব নষ্ট করে ফেল দিল। পরে যখন ১৮১৮ সালে গভর্নমেন্ট এই সব কাগজ পত্র পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করল তখন দেখা গেল প্রায় সব দলিলপত্রই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে প্রজ্ঞাসব সম্পর্কে প্রায় সব কাগজপত্রই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথমেরই নষ্ট হয়ে যায়। কাহ্ননগোদের কাগজপত্র গবেষকদের একটা মূল্যবান সম্পত্তি হতে পারত। কিছুদিন আগে Past and Present পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে যোনের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ানের ওপরে। তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে। আজকাল ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক তথ্যই পরিবেশন করে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই আজকাল একটু বেশী দেখা যায়। আমরা হাইকোর্টে অষ্টাদশ শতাব্দীর কতকগুলো মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখেছিলাম। তাতে কাহ্ননগোদের কিছু তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল। জমি সম্পত্তির মানলা মোকদ্দমার কাহ্ননগোরা প্রায়ই ১০০১৫০ বৎসরের জমির মালিকানার ইতিহাস এবং অল্প সব খবর খুব সহজভাবেই দিতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন Preparer of Reports। তাঁর কাজ ছিল গভর্নমেন্টের কাছে জমি সংক্রান্ত যে সব বিরোধ উপস্থিত হত তার একটা চোটখাট ইতিহাস লিখে দেওয়া। কাহ্ননগোদের লেখা বিবরণই ইংরেজীতে তরজমা করে Preparer of Reports এর রিপোর্ট তৈরি হত। জন্ম মৃত্যুর খতিয়ান কাহ্ননগোদের কাগজপত্রে সুন্দর পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় খুব কম কাগজপত্রই আছে। ভয় হয় আর একটা পরিবর্তনের সময় হয়ত অনেক মূল্যবান কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের একটা মূল্যবান সম্পদ কলকাতা হাইকোর্টে সংরক্ষিত পুরনো দলিলপত্র। মোকদ্দমার নথিপত্র যারা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য দেখেছেন তারা সহজেই বুঝতে পারেন যে exhibit গুলোতেই সব চেয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মোকদ্দমার দলিলপত্রের মধ্য থেকে ইতিহাসের তথ্য সম্পর্কে একটা ফিরিতি তৈরি করতে চাই। অহুমতি আমরা পাই নি। হাইকোর্টে স্থানাভাব ও কর্মচারীর অভাবের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এই কাজ ভাল ভাবে করতে পারলে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের

অনেক মূল্যবান নূতন তথ্য পাওয়া যাবে। অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান অর্থনীতিবিদই সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু অর্থনৈতিক তথ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাবিধ তথ্যের সঙ্গে এভাবে জড়িত হয়ে থাকে যার সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ বোধহয় অজ্ঞ। ঐতিহাসিকের কাজ অর্থনৈতিক তথ্য খুঁজে বার করে তার রূপ দেওয়া। অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনাও সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার মতই ঘটনাবলীর সৃষ্ট সমাবেশ।

অর্থনৈতিক তথ্য কিভাবে আদালতের দলিলপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় তার উদাহরণ দেওয়া বোধহয় প্রয়োজন। নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে নানারূপ তথ্য নানা জায়গায় ছড়ান আছে। অর্থনীতির বই থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রথম দিকে নীলকর সাহেবরা জমল কেটে, পতিত জমি আবাদ করে, রাস্তাঘাট করে নোটের ওপর দেশের উন্নতিই করেছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল নীল খেত আর যথেষ্ট মুনাফা হচ্ছে না তখন অত্যাচার করে, দাম কম দিয়ে, জোর করে ভাল জমি কেড়ে নিয়ে তারা এই মুনাফাটা পুঁথিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা গভর্ণমেন্টের মহাক্ষেত্রখানার Board of Trade-এর কাগজপত্র থেকে জানতে পারি প্রথম থেকেই ইংরেজদের মধ্যে একদল বলেছিল যে অর্থগুরু ইংরেজ ও সাধারণ চাষীর এভাবে সোচ্চারিত কারবার করতে দেওয়া ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং ছোট ছোট তালুকদার, ব্যবসাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের এই নীল চাষের মুনাফাটা বন্টন করে দেওয়া যাক। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জায়গায় জায়গায় এই চাষের ছোটখাট ব্যবস্থা করুক তাহলেই তারা কোম্পানীর দেখাদেখি ছোটখাট ভাবে এই কাজ আরম্ভ করবে। তাদের কাছ থেকে কোম্পানী বা ব্রিটিশ ব্যবসাদার নীল কিনে নিতে পারবে। কিন্তু তখন ব্রিটিশ ব্যবসাদারের হাতে টাকা জমেছে; সে টাকা খাটাবে। উগ্র অর্থলিপ্সা তাকে পেয়ে বসেছে। সে একথা সন্দেহ কেন? কিন্তু নীলকর সাহেব তার অত্যাচারের ভিত্তি প্রথম থেকেই স্থাপন করেছিল। যতটা মুনাফা পাওয়া যায় তা আদায়ের চেষ্টার কোনও চেষ্টা ছিল না। ১৭৯৬ সালে কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান উকিল রহমতুল্লাহ আদালতের কাছে দুটি দরখাস্ত করেন। প্রথমটি সৈয়দ রহমান আলীর পক্ষে। কোর্টস্ নামে এক নীলকর সাহেব তার

জমির ফসল নষ্ট করে দিয়ে নীলের চাষ করেছিল। তার খেতের ফসল তখন অর্ধেকটা হয়েছিল। দ্বিতীয় দরখাস্তও রহমতুল্লাহ কছেন ভূগা বেওয়ার পক্ষে। ছাণ্ডার নামে এক নীলকর সাহেব এই মহিলাটির ২০ বিঘা জমি জোর করে দখল করে নিয়েছিল। স্থানীয় আদালতে হুবিধা করতে না পেরে বাদীর উচ্চ আদালতে হুবিচারের আশায় উপস্থিত হতে হয়েছিল। এখানে মুনাফা কমবেশীর প্রায় নয়, মদোদ্বন্দ্ব লিঃতের সম্মুখে দশককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের মালমসলা কলকাতা হাইকোর্টের দলিলপত্রের মধ্যে এমনভাবে পাওয়া যায় যা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এই দলিলপত্রের একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে পারলে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণার বিশেষ হুবিধা হবে আশা করা যায়।

পুস্তক-পরিচয়

অ্যানেক্সেসন্ অব আসাম (Annexation of Assam)
 জীরেবতীমোহন লাতিড়ী প্রণীত ; সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭ ; মূল্য বার টাকা।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে (১৮২৬ খ্রীঃ) আসামের আহম রাজ্য এবং জয়ন্তিয়া, কাছাড় ও মনিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ইংরেজদের অধিকারে আসে। বর্মীরা এই সব অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেও এগুলি সরাসরি ইংরেজদের বশতাব্দী স্বীকার করে নেয় নি। আসামে নিজেদের 'আধিপত্য' সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইংরেজদের আহম-সামন্তবর্গ ও পার্বত্য উপজাতিগুলির সাধে অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বিজোহীদের দমন করতে ইংরেজদের লেগেছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর (১৮২৬-১৮৫৪ খ্রীঃ)।

নূতন করে আসাম বিজয়ের পূর্বে এই ত্রিশ বৎসরের সমাপ্ত হয়েছিল। এই যুগেই হয়েছিল আসামে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পতন। সে দিক থেকে যুগটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই যুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজও অস্পষ্ট। গেট বা মেকেনজি রচিত আসামের ইতিহাসে আধুনিক যুগ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা খুব সংক্ষিপ্ত। রেবতী বাবু তাঁর বইটিতে আসামের ত্রিশ বৎসরের (১৮২৪-১৮৫৪ খ্রীঃ) ইতিহাস নিয়ে বিশদ আলোচনা করে সে অভাব দূর করেছেন। আসামের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্তির কাহিনী, উপজাতিগুলির পক্ষ থেকে ঠংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাদের প্রতি ঠংরেজদের দমন-নীতির বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে। আশা করি তাঁর বইটি আসামের ইতিহাসে ঘটনাবহুল ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগটির উপর নূতন আলোকসম্পাত করবে।

শ্রীতড়িৎ জুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৯/২ একডালিয়া গ্রেসে, শ্রীহরেন্দ্র নাথ সেনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের চতুর্থ-বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন বসে।

পূর্ববৎসরের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হ'লে কোষাধ্যক্ষ শ্রী শিবপদ সেন বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ১৫০০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৫০০ টাকা। পরিষদকে এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যয়-সমকোচ করতে হয়েছে। আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের একটি খসড়া হিসাবও সভায় পঠিতও আলোচিত হয়

পরিষদের সভ্যসংখ্যা ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, বার্ষিক কার্যবিসরণীতে এই ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বর্তমান বৎসরে সভ্যদের সংখ্যা ৫৮, গ্রাহকদের সংখ্যা ১৭২। সভ্য ও গ্রাহকগণ প্রত্যেকে যদি অন্তত একজন নতুন সভ্য বা গ্রাহক সংগ্রহ করার দায়িত্ব নেন তাহলেই আগামী বৎসরে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। নতুবা বলাই বাহুল্য যে একদিকে ক্রমবর্ধমান সরকারী সাহায্য, অত্মদিকে সভ্য ও গ্রাহকসংখ্যার অপ্রতীত নিয়গতি পরিষদের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করছে না।

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে ৯/২ একডালিয়া প্লেসে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। গত ১৩শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়। পরিষদের কার্যালয় এই ঘরে স্থানান্তরিত করার অনুবিধা আছে; বর্তমানে এটিকে সভাগৃহ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ঘরে এ'বৎসর কর্মসমিতির দুইটি অধিবেশন ও তিনটি আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়েছে। প্রথম আলোচনাসভায় শ্রী দিলীপ কুমার বিশ্বাস “তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রী শশীভূষণ চৌধুরী অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি গণ-বিক্ষোভ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রী নির্মল কুমার বসু; আলোচ্য বিষয় ছিল “হিন্দু সনাতনের গড়ন।” একটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে এখন থেকে প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার ৯/২ একডালিয়া প্লেসে মাসিক অধিবেশন বসবে।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জন্ম কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হ'ন :

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুশোভন সরকার, শ্রী নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, শ্রী জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সরসীকুমার সরস্বতী, শ্রী শিবপদ সেন, শ্রী গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রী শশীভূষণ চৌধুরী, শ্রী চারুচন্দ্র দালগুপ্ত, শ্রী হুকুমার রায়, শ্রী চণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শিলিরকুমার মিত্র, শ্রী অমলেশ ত্রিপাঠি, শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রী অসীমকুমার দত্ত, শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণ দালগুপ্ত।

কর্মকর্তায়ণী নির্বাচন :

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে আছুত কর্মসমিতির প্রথম অধিবেশনে নূতন বৎসরের জ্যেষ্ঠ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ সেন বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। শ্রী ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী হুশোভন সরকার পরিষদের সহ-সভাপতি, শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম-সচিব, শ্রী শিবপদ সেন কোষাধ্যক্ষ ও শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত মুদ্র-সহকারী কর্মসচিব নির্বাচিত হ'ন। ইতিহাস পত্রিকার মুদ্র-সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রী নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ।

এ বৎসর ২৭শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর আহমেদাবাদে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশন সভার উদ্বোধন করবেন লোকসভার অস্থায়ী সদস্য শ্রী জি. ভি. মবলকর; সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব পরিচালক শ্রী নিরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী। শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১২৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ এই ঠিকানায় চিঠি দিলে অধিবেশন সম্পর্কে অস্বাভাবিক প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যাবে।



ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড]

অগ্রহায়ণ—মাঘ ১৩২১

[দ্বিতীয় সংখ্যা

ইসলামিক ইতিহাস চর্চায় নব-জাগরণ

শ্রীযত্ননাথ সরকার

এক এক মহত্ত্বের সময় যেন আগেকার সব ঢাকিয়া দিয়া এক নতুন সৃষ্টির জন্ম দেখা দেয়, সেই মত ভারতে হিন্দু যুগ ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস সত্বে আমাদের জ্ঞানের যে এক যুগান্তর-সম উন্নতি ঘটিয়াছে, একথা সকলেই জানেন। ঋগবেদ ও সাযনভাষ্য (১৮৬০ এর কিছু পূর্বে) ছাপা হওয়ায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা লইয়া গবেষণা করিয়া নবীন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রিন্সেপ সাহেব (১৮৬৫) প্রাচীন ইতিহাসের এক আধার-কোঠার চাবী আবিষ্কার করিলেন। ত্রায়াম হজসন নেপালে রেসিডেন্ট থাকার সময় (১৮২০-১৮৪৪) নিজ ব্যয়ে শত শত বৌদ্ধ হস্তলিপির নকল লইয়া তাহা বিলাতে ও কলিকাতায় বিতরণ করিয়া পণ্ডিতদের সামনে বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক নবীন রাজ্য খুলিয়া দিলেন; এদেশে রামদাস সেন ও রাধেন্দ্রলাল মিত্র সেই গবেষণায় যোগ দিলেন। ফলতঃ ১৮৫৬ হইতে যেন দেশব্যাপি অন্ধকার-সূচিয়া গিয়া মেঘের ভিতর দিয়া সত্যের আলোক আসিতে লাগিল।

ঠিক সেই মতই উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামিক ইতিহাস চর্চায়ও যে এক মহত্ত্বের ঘটয়াছে তাহা কম লোকেই জানেন। এই পরিবর্তন সহজেই বুঝা যায় যদি আমরা গিবনের রচিত “রোমক সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন”

(১৭৭৬-৮৮ প্রকাশিত) গ্রন্থখানি এবং অধ্যাপক বিউরী সম্পাদিত তাহার সটীক সংস্করণ (১৮৯৬ প্রকাশিত) পাশাপাশি রাখি ।

গিবনকে সত্যই বলা হয়, খৃষ্টপন্থাৎ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ; তাঁহার মহাগ্রন্থ সাহিত্যের হিসাবে এক অতুলনীয় বস্তু, এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ । তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের সব দেশের পণ্ডিতেরা ঐ গ্রন্থের সংশোধন চেষ্টা করেন, টাকা যোগ দেন । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রোমক-সাম্রাজ্যের ইংলণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিউরী যখন উহার সংস্করণ বাহির করিলেন তখন দেখা গেল যে গিবন অত্যন্ত কম ভুল লিখিয়াছেন অথবা আবশ্যক তথ্য বাণ দিয়াছেন, সুতরাং বিউরীর টাকা টিপ্সরী শুধু গিবনের পরবর্তী নূতন প্রকাশিত উপাদানের নাম যোগ এবং ছ চারটা সংখ্যা বা নামের সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে । এই উচ্চ গোরব গিবনের গ্রন্থে ইউরোপীয় দেশগুলির ইতিহাসের অধ্যায়গুলির প্রাপ্য । কিন্তু গিবনের মহাগ্রন্থের যে সব অধ্যায়ে ইসলামের উৎপত্তি, রাজ্যবিস্তার ও সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির সংশোধনের ভার বিউরী দিলেন আরবী পারসিক ভাষায় পণ্ডিত ষ্টান্‌লি লেন্‌গুনের উপর । আমাদের বর্তমান জ্ঞানের মাপকাঠিতে গিবনের গ্রন্থের এই অংশে অনেক ত্রুটি ও মারাত্মক ভুল ধরা পড়িল ।

উহার কারণ কি ? গিবনের অবহেলা বা মস্তিষ্কের দুর্বলতা নহে ; গিবনের জীবনকালে ঐ ঐ ক্ষেত্রে মৌলিক উপাদানের অভাব । গিবনের আরবী ফারসী ভাষা জানা ছিল না ; তিনি কোন হস্তলিপি দেখেন নাই ; তাঁহার সময়ে ইসলাম সম্বন্ধে যে সব ল্যাটিন, ফরাসী অথবা ইংরাজী ছাপা বই পাওয়া যাইত, শুধু তাহাই তাঁহার গ্রন্থের ওই সব অধ্যায়ের ভিত্তি । সে যুগে হিফ্র বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট) শুদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইংলণ্ডের বড় বড় খৃষ্টান ধর্মযাজক এবং অক্সফোর্ডের অধ্যাপক (তাঁহারই ও ব্রহ্মচারী এবং দীক্ষিত পুস্তোহিত হইতে বাধ্য) হিফ্র সহিত আরবী-এ অল্প সেমিটিক ভাষার গভীর চর্চা করিতেন, এবং খৃষ্টধর্মের বিস্তারের ইতিহাস লিখিতে গিয়া ইসলামের সহিত তাহার সংঘর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক হইত । এ জন্য এই জ্ঞানীর সাহেব লেখকেরাই প্রথমে আরবী ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ বা সার সংকলন প্রকাশ করেন, তাহাই গিবনের পুঁজীপাটা । কোন আরবী আধার গ্রন্থ, অর্থাৎ প্রাথমিক উপাদান তাঁহার হাতে পৌঁছে

নাই। তাঁহার এদেশে ইসলামিক অংশে বৈশীভাগ কাচিনীর ভিত্তি দুজন লেখকের বই—(১) আবুল ফিদা; তব্বিন্-উল-বুলদান নামে অক্সফোর্ড নদীর উত্তর দেশ অর্থাৎ তুরান বা মধ্যএসিয়ার ইতিহাস আরবী ভাষায় ১৩৩১ খৃঃ (অর্থাৎ মুহম্মদের মৃত্যুর ৭০০ বৎসর পরে) লেখেন, যাচার লাতিন অনুবাদ হডসন্ ১৭১২ খৃঃ অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশ করেন। তাঁহার “বিশ্ব-ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার” — ডারিং-ই-মুখতসর, খুব বৈশী চলিত ছিল। ইহার লাতিন অনুবাদ Gagnier ১৭২২ খৃঃ অক্সফোর্ড হইতে ছাপেন। (২) Gregoire Barhabraense, or Abul Faraaj নামক খুটান পুরোহিত কর্তৃক ১২৮০ সালে আরবীতে রচিত ছোট কাচিনী, যাচার লাতিন অনুবাদ ১৬৬৩ খৃঃ Pococke প্রকাশিত করেন। এছটি ছাড়া গিবন পাইয়াছিলেন (৩) ঐ Pococke রচিত লাতিন বই *Specimens of the History of the Arabs* (১৬৫০ খৃঃ ছাপা) (৪) ফরাসী ভাষায় রচিত দুখানা মুহম্মদের জীবনী, Gagnier এবং Prideaux তাহাদের লেখক। (৫) D'Herbelot রচিত ফরাসী *Bibliothèque Oriental* (১৬৯৭ খৃঃ প্রকাশিত) একখানি কোষ গ্রন্থ। (৬) কেমব্রিজের অধ্যাপক Ockley (১৭০৪-১৭৫৭) রচিত *History of the Saracens*। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইসলামের প্রথম যুগের কোন সহসাময়িক মূল গ্রন্থ গিবন পড়েন নাই, তাঁহার সব লেখার আধার মুহম্মদের ৪৫ শত বৎসর পরে লেখা, প্রবাদপূর্ণ অথবা নিজপন্থ ও ধর্মসম্প্রদায়কে আদি ও অকৃত্রিম প্রমাণ করিবার জন্ত ইতিহাসকে মিথ্যা করিয়া সাজান গ্রন্থ। গিবনের জানা আদিতম আধার, তবাবীর ইতিহাস, যদিও নবীর মৃত্যুর আড়াইশ বৎসর পরে লেখা, তথাপি উহা প্রামাণিক; কিন্তু বইখানি অতি বৃহৎ ১২৫ ভলুমে সমাপ্ত; অথচ উহা হইতে ৪০০৫০ পাতা চয়ন করিয়া তাঁহার যে লাতিন অনুবাদ করা হয় তাহা মাত্র গিবন জানিতেন। তেমনি আর একজন পুরাতন ইসলামীয় লেখক ওয়াকিডি (যিনি তবাবী হইতে অনেক কথা চুরী করিয়াছেন), তাঁহার লেখারও সূত্র উল্লেখ মাত্র গিবনের ব্যবহারে আসে, এবং বর্তমানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ওয়াকিডিকে অবিশ্বাস করেন।

মুহম্মদের আদিতম এবং সর্বোচ্চ প্রামাণিক জীবনী ইসহাক কর্তৃক ৭৬৮ খৃঃ অর্থাৎ নবীর তিরোধানের ১৩৬ বৎসর পরে রচিত বইখানি গিবনের অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়।

এই সব কারণে দিবনের অতুলনীয় প্রতিভা ঈশলামিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংকুচিত এবং অনেকটা ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রেই **উনবিংশ শতাব্দীতে মুগাহুর-সম্র** আবিষ্কার ঘটয়াছে। তাঁহারই বর্ণনা করিব। কিন্তু প্রথমে দুটি কথা বাঙ্গালী পাঠককে বঝাওয়া দেওয়া আবশ্যক—(১) এই আদিতম উপকরণকে কিরূপে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা সত্য নির্ধারণ করিতে হইবে? এবং (২) কোন কারণে পরবর্তী যুগের আরব লেখকগণ ইসলামের উদ্ভব ও খলিফাদের বিস্তারের ইতিহাসে ভেজাল মিসাইলেন?

মুহম্মদের জীবনের ঘটনা ও তাঁহার মত সহজে খাতি খবর কোরাণে পাওয়া যায়, এগুলি সংখ্যায় কম এবং ইহার সংক্ষিপ্ত ভাষার জন্য অর্থ অটল হইলেও এগুলি তাঁহার অরচিত এবং তাঁহার মৃত্যুর পরই দ্বিতীয় খলিফা কোরাণ লিপিবদ্ধ করায়, মুখে মুখে চলিয়া ইহাতে ভ্রম ঢুকিবার ভয় দূর হইল। তাঁহার পর নবীর নিজ শিষ্য ও সহচরগণ তাঁহার মুখে যে বাহা শুনিয়াছিল তাহাই তাহাদের বন্ধুদের কাছে বলিত, এবং এই হাদিস অর্থাৎ লোককথা ক্রমে ক্রমে ছয় সাত জনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া অবশেষে তবারী তাহা সব একত্র করিয়া নিজ বিরাট গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। যে হাদিসগুলি সুন্নীরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহা প্রায় একহাজার হইবে, এবং সেই সংগ্রহের নাম মিস্কাৎ। ১৯০৪ সালে কেশব সেনের ব্রাহ্মমিশন ইতার এক বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

কিন্তু হাদিস গ্রন্থের তথ্যগুলির প্রত্যেকটি খুব কড়া পরীক্ষা না করিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ ছয় বছরে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া অনেকগুলির রূপান্তর হওয়া স্বাভাবিক, ছোঁতার মুর্খতায় স্মৃতিশ্রমে, এমন কি নিজদল পোষণ করিবার ইচ্ছায় জ্ঞানবৃত্ত মিথ্যা কথা লাগাইয়া দেওয়ার ফলে। যেমন একটা সিঁড়িতে আমরা সাধা হইতে ছয় সাত ধাপে নামিয়া কবে-নাটিতে পৌঁছি, তেমনি মুহম্মদ হইতে তবারী পর্যন্ত মধ্যবর্তী ছয় সাত পুরুষের ভিতর দিয়া এক একটি নবীর উক্তি লিখিত অর্থাৎ স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে। এই ছয় বা সাত মধ্যবর্তী লোকদের ইসনাদ বলা হয়, তাহাদের সকলেই সমান বুদ্ধিমান বা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী ছিলেন না। অথচ হাদিস ইতিহাসের

অতি মূল্যবান সচাচক। এগুলি ভিন্ন কোরাণের অনেকস্থানে অর্থ বোধ হয় না এবং এটো আধার না মইলে ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

এই সাক্ষীর Cross-examination করিয়াছেন একজন সাত্ত্বিক। Count Caetani (উপাধি Principe di Teano) ইতালি ভাষায় এক গ্রন্থমালা আরম্ভ করেন, তাহার নাম **Annali dell' Islam** : প্রথম ভলুম ১৯০৫ সালে বাতির হয়, তাহার উত্তরাধিকারীরা এত দিনে দশ এগার ভলুমে উহা শেষ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রণালী এইরূপ—মুহম্মদের জীবনের কাগজরূপে ধারাবাহিক এক একটি ঘটনা লইয়া তাহার সম্বন্ধে কোরাণে অথবা হাদিসে যত উল্লেখ আছে তাহা সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটির বক্তার জ্ঞান ও চরিত্রের নির্মম সমালোচনা করিয়া তাহার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থির করা। ইসমাদ অর্থাৎ সিঁড়ির ধাপ যত কম হইবে ততই নবীর কাছে পৌঁছান যাইবে এবং সে হাদিসটি ততই বিশ্বাসযোগ্য হইবে। এইরূপ অত্রায় পরিভ্রম ও নিঃশেষ করিয়া আরবী প্রমাণ ও উক্তি একত্র সমাবেশ করার ফলে এই গ্রন্থখানি গবেষণার চরম দৃষ্টান্ত ও অকাট্য সত্য তথ্যের খনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কেন মুহম্মদের তিনশ বৎসর পরবর্তী আরব লেখকগণ প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে ভেজাল ঢুকাইলেন? মুহম্মদের দুত্বের পর তাঁহার তিনজন শিষ্য ক্রমে ক্রমে মুসলমান-জনসংঘের নেতা (খলিফা) হইলেন, ইহারা কেহই তাঁহার বংশধর নহেন। ৪র্থ খলিফা আলী ছিলেন মুহম্মদের জামাতা; আলীর এক পুত্র হুসেন পিতার যুনের পর সিংহাসন পাইবার চেষ্টায় প্রাণ হারাইলেন এবং কুরেশ-কুলের ওমাইয়া বংশের এক নেতা (যাঁহার সঙ্গে মুহম্মদের কোন রক্তগত সংক্রম ছিল না) খলিফা হইলেন। হুসেনের ভাতা হসন নিজ খলিফাপদ (প্রকৃতপক্ষে দাবিমাত্র) এই ওমাইয়া-নেতার হাতে ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া অখতোগ করিতে লাগিলেন। ওমাইয়া-বংশীয় খলিফাগণ ৬৬১-৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর আব্বাস-বংশীয় সেনানায়কের হস্তে পরাস্ত হইলেন, তখন আব্বাসীয় খলিফাগণ সিংহাসনে উঠিলেন।

The victory of the Abbasids was a victory of the

Persians over the Arabs (Becker)। এই নতুন খলিফাগণ মুহম্মদের খুড়ার বংশ, স্ত্রুতবুর্হি তাঁহাদের চাটুকার লেখকগণ ইসলামের প্রথমযুগের ইতিহাসে যে সব নৈতার ও খলিফার মুহম্মদের সঙ্গে রক্ত সন্ধ ছিল না তাহাদের ছোট করিয়া দিয়া, সত্য ঘটনার উপর মিথ্যায় প্রলেপ দিয়া, বিশেষতঃ ওমাইয়া-বংশীয় খলিফাদের কীর্তি লোপ করিবার জন্য মিথ্যা কুৎসা রচনা করিতে লাগিলেন। যে সব হাদিস আলী অথবা তাঁহার অনুচরদের নিকট হইতে মুহম্মদের উক্তি বলিয়া পাওয়া যায় নাই, সেগুলিকে শিয়ারা জাল বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। এবং এই propaganda literature অর্থাৎ পারসিক জাতির (পরে শিয়া) প্রভাবে লিখিত ইতিহাসই গিবনের সময় পর্যন্ত ইউরোপে সত্য (কার্যতঃ একমাত্র) ইসলামীয় ইতিহাস বলিয়া গৃহীত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের আদিযুগের ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় এই মিথ্যা দূর করা সম্ভব হইয়াছে।

এই আধারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। প্রথমতঃ ইসহাক-রচিত মুহম্মদের সর্বপ্রথম বড় জীবনচরিত। নবীর নিজ পরিবারের এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে তাঁহার ঐতিহাসিক বা নিন্দার যে সব কথা ছিল তাহা এই গ্রন্থে ভাল ভিনিয়ের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু আব্বাসীয় খলিফাদের পক্ষে লিখিত মুহম্মদ-জীবনীতে সেগুলি লুকানো হইয়াছে। এই আরবী গ্রন্থখানি জার্মানিতে Wustenfeld ১৮৫৮-৬০ সালে ছাপেন। তবারীর গ্রন্থের একটা বড় অংশ Sprenger সাহেব অযোধ্যাক্ষ নবাবদের পুস্তকাগারে আবিষ্কার করেন, ইহার কয়েকখণ্ড ছাপা হইয়াছে। খলিফাদের ইতিহাসের আরবী গ্রন্থের আধারে এক প্রকাণ্ড জার্মান গ্রন্থ Weil রচনা করিয়াছেন। Wellhausen প্রকৃতি এই ক্ষেত্রের নানা অংশে অমূল্য দলিলসহ ইতিহাস বর্তমানে লিখিয়াছেন।

আরবী ভাষায় আধার গ্রন্থের হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া ও তাহার মকল লওয়া সম্ভব হইল নেপোলিয়নের ইজিপ্ট আক্রমণ (১৭৯৮) হইতে। যদিও নেপোলিয়ন ইংরাজের কাছে পরাস্ত হইয়া ইজিপ্ট ছাড়িলেন, তথাপি সেইদিন হইতে পশ্চিম এশিয়ার রুদ্ধদার ভাঙ্গিয়া গেল। নেপোলিয়নের সময়েই পারস্য রাজদরবারে ইংরাজি ও ফারসী দূতের আনাগনা চলিতে লাগিল। সেই হইতে আরব্য ও পারস্য, মিশর ও মরক্কোতে শিক্ষিত

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেড়াইতে ও গ্রন্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সফল এবং প্রথম কৃতি ছিলেন ফন্ হামার পুর্গষ্টল (১৭৭৪—১৮৫৬) ; ইনি অট্টিয়া সাম্রাজ্যের দূত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে যান এবং আরবী, সিরিয়াক্, তুর্কী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা শিখেন। ১৮০৭ খৃঃ তিনি কর্ম হইতে অবসর লন, কিন্তু পরে পকাশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম এশিয়ায় ভ্রমণ, হস্তলিপি অন্বেষণ, এবং অসংখ্য পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রাচ্য ইতিহাসের মূল-সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। “For 50 years Hammer Purgstall wrote incessantly on the most diverse subjects and published numerous texts and translations of Arabic, Persian and Turkish authorities. In spite of many faults, he did more for oriental studies than most of his critics put together.” ওসমানী তুর্কদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ; মৌলিক উপাদানগুলি তাঁহার নিজের সংগ্রহ।

জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির পর ইংরাজী ভাষায় সন্ট উইলিয়ম মুয়ার (এনাহাবাদ প্রদেশের গভর্ণর) এবং স্ট্রেন্গার সাহেব (অধ্যাপক নবাবদের পৃষ্ঠাশালার অধ্যক্ষ) এষ্ট দুইজন ১৮৫৬—৭০ পর্যন্ত আরবী মুন্দের চর্চায় অত্যন্ত সফল হইয়াছিলেন।

এখন সংক্ষেপে বলিব কোন্ কোন্ দিকে এইসব নব আবিস্কৃত মূলগ্রন্থ আমাদের জ্ঞানবিস্তার করিয়াছে।

প্রথম। মুহম্মদের চরিত্র ও মত সম্বন্ধে যে সব ধারণা পূর্বে চলিত ছিল তাহা ভুল। কার্লাইল তাঁহার *The Hero as Prophet* নামক প্রবন্ধে এই ধর্ম প্রবর্তকের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে *honest fanatic* বা ঈশ্বর উদ্বুদ্ধ সাধু রূপে দেখান হইয়াছে ; মানসিক উদ্বেজনায অধীর হইয়া প্রচারের সময় তাঁহার মাথার রং ফুলিয়া উঠিত, কলাকল বিচার না করিয়া তিনি বাহাতে বিশ্বাস সেইদিকে দৃঢ়মনে অকবচে ছুটিতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য, মুহম্মদ অতি শেয়ানা দূরদর্শী স্থিরবুদ্ধি টেটস্ম্যান ছিলেন, খুব সফল কাজের লোক। কোনও *honest blind fanatic* তাঁহার মত এক বিরাট সংঘ ও সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিত না। তিনি যে সকলতা লাভের অল্প কত স্থলে

কিছু ছাড়িয়া দিয়া আপোষ করেন এবং অল্প অল্প ধর্ম ও লোকশ্রুতি হইতে অংশ লইয়া নিজ ধর্মে তাহার স্থান দিয়া দলপুষ্টি করেন, তাহাই বর্তমান জার্মান পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের নিকট যে আকারের ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম বর্তমানে জানা আছে তাহা ছাড়াও ঐ দুই ধর্মের অজ্ঞাত শাখা ছিল মুহম্মদের সময়ে যাহা এখন লোপ পাইয়াছে, এগুলি হইতে তিনি অনেক মত ও ক্রিয়াকর্ম ইসলামে ঢুকাইয়া দেন, যেমন খৃষ্টীয় ডোসেটিষ্ট সম্প্রদায় ইত্যাদি। একজন Becker লিখিত Cambridge Medieval History, Vol. II ch. 10-12 এবং Margoliouth-এর Muhammad (Hero of the Nations) প্রভৃতি।

দ্বিতীয়। আব্বাস-বংশীয় খলিফারা মুহম্মদের নিজবংশের সন্মত বলিয়া পরিচয় দিয়া ওমাইয়া বংশের খলিফাদের পরস্ব-অপহারী, অত্যাচারী, রক্ত-পিপাসু (সফফাঃ খলিফা এবং হাজার প্রাদেশিক শাসনকর্তা, তথা ইজিদু) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ইহা অসত্য। প্রকৃত ইতিহাসে জানা যায় যে এই রাজবংশের শাসনে বহু বিদ্রোহ ও অশান্তি দমন করিয়া দেশে শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য (সেই সঙ্গে ধন ও সুখ স্বর্কি) সাধিত হয়। আলী বা অলু কাশকে মুহম্মদ নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া যান নাই; আহল-উল-কিসা গল্পটা শিয়াদের রচিত ভাল ভদিস। হাজার অতি দক্ষ ও বিবেচক শাসনকর্তা ছিলেন : তিনিও যে তিন লক্ষ লোককে বধ করেন ও পঞ্চাশ হাজারকে জেলে রাখেন, এবং ওমাইয়া খলিফা যে হুসেনের ভিন্ন যুগে আঘাত করেন—এবং সেট দৃষ্ট দেখিয়া মুহম্মদের বৃদ্ধ সতচরণ কাদিয়া বলে “আহা, আমরা দেখিয়াছি যে হুসেনের বাল্যকালে ঐ যুগে নবী চুমা দিতেছেন”—এসব অসত্য শিয়া-রচিত গল্প। আর, হুসেনের কারবালা অভিযান প্রকৃতপক্ষে ধর্ম যুদ্ধ ছিলনা, এক নিরর্থক political demonstration মাত্র। হুট স্বার্থপর লোকের প্ররোচনায় সেই ভাল মানুষটি অকারণ প্রত্যাধিত হইয়া মাথা ঘুলাইয়া যাওয়ায় একটু হেয়ী করিয়া মারা গেলেন। “বুফার লোকেরা বড় প্রতারণা” এই প্রাচীন আরবী উক্তি সত্য। আর হাসানকে খলিফা করিলে রাজ্য তাসিয়া পড়িত—তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতার ফলে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এইসব সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে।

তৃতীয়। ইজিপ্টের কতেমা বংশীয় শেষ খলিফা, আব্বাস-বংশ হইতে দ্বায্য অধিকারে প্রাপ্ত খলিফা-পদ যে কনষ্টান্টিনোপলের তুর্ক সুলতানকে আইন সমুদ প্রথায় দান করিয়া যান,—যাহার ফলে ঐ তুর্কবংশ সমগ্র মুসলমান প্রতিনিধি (অর্থাৎ খলিফা) পদ দাবী করিতে ছিলেন, তাহা অসত্য এবং একটি অতি নবীন ঐতিহাসিক জাল কারসাজী। আমি আমার আওরাজীব নামক ইতিহাসে এবং **Mughal Administration** গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়াছি। এই অসত্যের উৎপত্তি এইরূপে ঘটে—

The theory of the solemn transfer of the Caliphate by al-Mutawakkil, the last Egyptian Abbasid to the Othman Sultan Selim, is devoid of any foundation. [একথা Barthold ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।] It owes its dissemination to a Stambul Armenian in Swedish service, M. d'Ohsson who published it in his **Tableau general de l' Empire Othoman** (Paris, 1788—1824.)

বিসুপাদের অনুকরণে পাথরে খুদা কদমরুল অর্থাৎ মুহম্মদের পদযুগলের চিহ্নের মত এই খিলাফৎও অর্থলাভের উদ্দেশে জাল দলিল।



✓ কাম্বুজ শৈব-সংস্কৃতির কায়কটি দিক

কমলেশ্বর ভট্টাচার্য

“Le rôle du bouddhisme est indéniable : il semble avoir ouvert la voie, grâce à son esprit missionnaire et à son absence de préjugés raciaux. Mais la plupart des royaumes qui se constituèrent dans l'Inde extérieure ne tardèrent pas à adopter le couple brahmane-kshatriya et exprime dans le culte du linga royal.” “ভারতীয় সংস্কৃতিবিভারে বৌদ্ধধর্মের অংশ স্বীকার করতেই হবে; জাতিগত সংস্কারমুক্ত, স্বাভাবিক মনোভাবসম্পন্ন এই ধর্ম তার পথ উন্মুক্ত করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু বহির্ভারতে যেসব রাজ্য গঠিত হয়, অল্পকালব্যয়েই তারা শৈব রাজত্বাদর্শ গ্রহণ করেন; কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-কবির শক্তির উপর সে আদর্শের ভিত্তি, রাজকীয় শিব-লিঙ্গের অর্চনায় তার প্রকাশ।”

আদিম স্থানীয় সংস্কৃতির সংগে ভারতীয় শৈব-সংস্কৃতির সংযোগ স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হয়েছিল বলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে। ইন্দোচীনের চম্পায় সে সাংস্কৃতিক সংযোগের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন ম. পল মুস তাঁর ‘Cultes indiens et indigènes au Champa’ নামক প্রবন্ধে [Bulletin de l'École française d'Extrême Orient (BEFEO), XXXIII, 1934]। প্রতিবেদী হু-নান ও কাম্বুজ-রাষ্ট্রেও তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এ-সম্পর্কে ব্রিটিশ পণ্ডিত ড. কুস্মরিচ ওয়েলসের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা তা নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

প্রাচীন চৈনিক বিবরণ ও শিলালেখ থেকে হু-নান ও আদি কাম্বুজ-রাষ্ট্রে শৈব ধর্মের মোটামুটি একটা চিত্র সহজেই অংকিত করা যায়। চৈনিক বিবরণ থেকে জানি যে, খ্রীষ্টীয় বর্ষ শতাব্দীতে হু-নানে মহেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। মো-তান পর্বতে সে দেবতা অবিরাম অবতরণ করতেন এ-কথা উক্ত আছে। হু-নান ও আদি কাম্বুজ-রাষ্ট্রে শিব তাঁর ‘গিরিস’

১। G. Coedes, *Les États hindouïses d'Indochine et d'Indonésie*, Paris, 1948, p. 46.

নামে আরাধিত হ'তেন এ বিষয়ে লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'দু-নাম' নামটি হচ্ছে "the modern official pronunciation of two characters pronounced formerly *b'in-nam* the transcription of the old Khmer word *bnam*, now *phnom*, 'mountain.' এ-রাজ্যের রাজারাও 'শৈলরাজ' বা 'পর্বতভূপাল' বলে অভিহিত হ'তেন, তার খ্রমের প্রতিশব্দ 'কুরুং বুম'।

চৈনিক বিবরণ থেকে আমরা আরও জানি যে, আদি কদম্ব-রাজ্যের রাজধানীর সম্মুখে লিং-কিআ-পো-পো বলে একটি পর্বত ছিল, তার শিখরে সদা সতত সৈন্য-পরিবেষ্টিত একটি মন্দিরের অবস্থান ছিল। সে-মন্দিরের দেবতার নাম চীনা ভাষায় বিকৃত হয়ে পো-তো-লি রূপে লাড়িয়েছে। নর-বলি হ'ত সে মন্দিরে। প্রতিবৎসর রাজা একবার সে-মন্দিরে গিয়ে নিশীথে একটি নর-বলি দিতেন। লিং-কিআ-পো-পো 'লিংগপর্বত' নামেই বিকৃতি। তার বর্তমান অবস্থান বাত্‌হু। এ-স্থানে শিব 'ভদ্রেস্বর' নামে আরাধিত হতেন। 'পো-তো-লি' নামও 'ভদ্রেস্বর' নামের বিকৃতি বলে মনে করা হয়ে থাকে।

উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল, তা থেকে দুটি কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় : শৈলশিখর তিল শিবারাধনার প্রকৃষ্ট স্থান ও সে-আরাধনা উর্বরা-শক্তির উপাসনারই (fertility cult) অন্ততম রূপ। শৈব-ধর্মের এ স্বরূপ মূলতঃ ভারতীয় এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক্ ভারতীয় সংস্কৃতির সংগে এর অপূর্ব মিল রয়েছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আদীম স্থানীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে-অকলে ভারতীয় শৈব-ধর্মের প্রাধান্য। এ-সম্পর্কে ডঃ কুমারিচু ওয়েল্‌স্ যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :—

"We can in fact find ample evidence that not only sacred mountains, but also their reduced representations as stepped pyramids, were known to the Older Megalithic civilization of South East Asia. Starting from an unknown centre in the west, but undoubtedly strongly influenced by Mesopotamian religious ideas, the Older Megalithic is believed to have reached South-East Asia between 2500 and 1500 B. C. It must have started much earlier than the western influences that reached China, being without bronze but with the memory of sacred mountains as well as their symbolic reductions.

"Some further evidence of the older Megalithic character of the Pre-Indianized civilization of the khmers is provided, as I have shown in a recent article [**The Pre-Indian basis of Khmer culture**, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (JRAS.), 1952, p. 117 ff], by the discovery of relatively ancient Megalithic remains near to Khmer territory on the east (Quang tri) and on the south (Oc-co). The former includes both terraco shrines and pyramids, such as are also found at Javanese megalithic sites. The meaning of such features can probably only be learnt from megalithic peoples surviving in the hills of South-East Asia where ancient beliefs are still preserved. Thus a good example of a sacred mountain, precisely comparable to the Lingaparrvata of the early Khmers, is Doi Suthep, venerated by the formerly megalithic Lawas of northern Siam. The chthonic deity of this mountain demanded human sacrifices if it was to allow the water to course down and irrigate the rice fields; and it was probably for the same reason that human sacrifices were made to the Lingaparrvata. Such sacred mountains were no doubt generally considered to be the home of the dead; we know definitely that was the case with Sema, Lhota and Ao Nagas." (H. G. Quaritch Wales, **The Sacred Mountain in the old Asiatic Religion**, J R A S., 1953, p 28f)*

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন মেগালিথিক সভ্যতার শৈলোপাসনা প্রচলিত ছিল। সে উপাসনা স্বাভাবিক শৈলে সম্পাদিত হত, আবার তলসম্বিত পিরামিড (stepped pyramid) নির্মিত হত শৈলের প্রতীকস্বরূপ। এ-ধরনের উৎপত্তি হয়তো বধ্য-প্রাচীর, বেসোপোস্তামিয়ার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এখনও বেশব মেগালিথিক জাতি বাস করে তাদের আচার অর্চন থেকে ওই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সহজে ধারণা করা যায়। উত্তর-ভারতের মেগালিথিক লাবাদেবর বধ্যে যে শৈলোপাসনা প্রচলিত ছিল তার পদ্ধতি ধর্মের লিংগপূর্বভে নিবোধপ্পসনা থেকে ভিন্ন নয়। শৈলের অধিষ্ঠাত্রী উর্বরা-শক্তির দেবতা (chthonio deity)কে ভূত করার অর্চ তার নিকট নরুবলি দেওয়া হত।

এ পঞ্চম দেখা গেল যে, ভারতীয় শৈব-সংস্কার সাংগে প্রাচীন এশিয়াটিক সমের মূলগত ঐক্য ছিল বলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক্-ভারতীয় সংস্কৃতি সাংগে তার সংযোগ সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল। এবার দেখা যাক সে-ধর্মের দার্শনিক দিকটি কতদূর বিদগ্ধ সমাজকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল। এ-প্রসংগে ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বায়াং প্রস্তর-লিপির সাক্ষ্য সর্বত্রো উল্লেখযোগ্য। এখানে যে শিব-বন্দনা ক্রোদিত হয়েছে তা অদ্বৈত; তার উপর উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট। তাছাড়া আমরা পূর্বে যেসকল তথ্য আলোচনা করেছি তাদের থেকে এ-লিপির সাময়িক বাবদান বেশী নয়। প্রয়োজনীয় অংশটি নিচে উদ্ধৃত করছি :—

যমাতুবজ্জ্যোতিরুপাসতে বৃধ।

নিরুত্তরং ব্রহ্ম পরজিগীষবঃ

তপঃশ্রুতজ্যোতিষয়ো যদর্পণা

ভবহ্যানির্দেহফলামুবন্ধিনঃ

ন কেবলমন্ত্ৰং ফলযোগসংগিনা-

মসংগিনাং কর্মফলভ্যজামপি

নিসর্গসিদ্ধিরণিমাদিভিগুণৈ-

রুপেতমংগীকৃতশক্তিভিত্তৈঃ

ধিয়ামতীতম্ বচসামগোচরম্

অনাম্পদং যন্ত পদম্ বিদ্ববুধাঃ ॥

এখানে শিবকে হুভাবে কল্পনা করা হয়েছে : একদিকে তিনি সাকার, সঙ্গুণ; অপরদিকে নিরাকার, নিগুণ পরম ব্রহ্ম (তুলনীয় যেতাত্তর উপনিষৎ)। হুপ্রকার উপাসনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে; স্কাং ও নিকাম উপাসনা। নিকাম উপাসনার উল্লেখ আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই।*

কাবুজ শৈব-সংস্কৃতির কোনও বিবরণই সম্পূর্ণ হয় না, 'দেবরাজ'কে বাদ দিয়ে। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্মা সার্বভৌম কাবুজ রাজত্ব ঘোষণা করেন, 'দেবরাজ' প্রতিষ্ঠা করে। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ

ক। তৈত্তিরীয় ২।৮ : "প্রোহিত্য চাকামহতত"। আমি এ তথ্যটি শ্রদ্ধের অধ্যাপক ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি, সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সদোক্ কাক্ তোন্ লিপিতে তার পূর্ণ বিবরণ পাই। ওই বিবরণ অনুসারে দ্বিতীয় ভয়বর্ষা 'জনপদ' থেকে হিরণ্যদাম নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে আনেন, তিনি শিরশ্ছেদ, বিনাশিখা, সংমোহ ও নয়োত্তর, এই চারটি শাস্ত্রের সাহায্যে 'দেবরাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। লিপিটির সংস্কৃত অংশে যে বিবরণ আছে তা উদ্ধৃত করছি :—

হিরণ্যদাম-বিজপুংগবোহিগ্যধী-
 রিষাক্কযোনিঃ করুণাক্স' আগতঃ
 অনশ্ললকাঃ খলু সিক্কিমাণরাৎ
 প্রকাশয়ামাস মহীভূতং প্রতি ॥
 স কুধরেষাপুন্নতোহিগ্যজম্মা
 স সাধনং সিক্কিমদিক্কদনৈ
 হোত্রো হিতৈতকাসুমনঃ প্রসক্তিং
 সংবিত্ততে ধাম-বিবুংহনায় ॥
 শাক্সঃ শিরশ্ছেদ-বিনাশিখাখ্যং
 সংমোহনামপি নয়োত্তরাধ্যন্
 তৎ তুদুরোৰ্ধক্ক-চতুচ্চমস্ত
 সিদ্ধ্যেব বিপ্রঃ সমদর্শয়ৎ সঃ ॥
 ভিজঃ সমুচ্ছত্য স শাক্সসারং
 রহস্ত-কৌশল্যধিয়া সমস্তঃ
 সিক্কীৰ্ধহস্তীঃ কিল দেবরাজা-
 তিখ্যাং বিদগ্ধে ভুবনধিবুচ্ছো ॥

এ-অংশে 'জনপদের' উল্লেখ নেই, কিন্তু লিপিটির খন্ডের অংশ রয়েছে। বহুকাল ওই 'জনপদ' কোথায়, এ-বিষয়ে সম্মত ছিল। কিন্তু কবুজ-দেশই তার অবস্থান সম্পর্কে কয়েক বৎসর পূর্বে লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে (G. Coles, *Le site de Janapada d'après une inscription de Prasat Khua*. BEFEO, XLIII, p. 8 ff). 'সিদ্ধিবিজ্ঞান' পারদর্শী হিরণ্যদাম যে শাক্স-চতুষ্টয়ের সাহায্যে 'দেবরাজ' প্রতিষ্ঠা করেন বলে উক্ত আছে, তাদের তাত্ত্বিকতা বহুকাল নির্ণীত হয়েছে। ডঃ প্রবোধ-চন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থালায় কয়েকটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন, তাদের নামও অনুরূপ।

এখন দেখা যাক, এই 'দেবরাজ' কি? 'দেবশ্যাসৌ রাজা চ' এই কর্মধারয় সমাস ক'রে 'দেবরাজ' কথাটি পাওয়া যায়। স্তূতরাজ ব্যাপ্তিগত অর্থে 'দেবরাজ' ভারতীয় 'দেবরাজ্যের' (Divine Monarchy) কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা কাবুজ 'দেবরাজে' দৈবরাজ্যের যে বিকাশ দেখতে পাই, ভারতে তা হয়নি। রাজত্বের সার বা রাজার 'হৃদ্যাহরাস্তা'র অবস্থান একটি শিব-লিঙ্গে কর্তৃত্ব হ'ত। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে স্থিত একটি মন্দির-শিখরে ছিল সে লিঙ্গের অবস্থান। রাজধানীটিকে মনে করা হ'ত বিখের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ব'লে আর তার কেন্দ্রস্থিত মন্দিরটি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মেরুর প্রতিকৃতিরূপে কর্তৃত্ব হ'ত। বস্তুতঃ 'দেবরাজের' প্রতিষ্ঠা থেকেই থ'মের 'মন্দির-শৈলের' (temple-mountain) আবির্ভাব। প্রাক-ভারতীয় সংস্কৃতির সংগেও এর সম্পর্ক দেখা যায়। এ-প্রসংগে ডঃ কুমারিচ্ ওয়েলসের মন্ত নিয়ে উদ্ধৃত করছি :—

"Coming to pyramids we find two main kinds. First, the private ones, like the **dahu** 'memorial' of the Angami Naga chief, or the small pyramids containing skulls of the Nias Islanders. These perhaps are analogous to the Chinese king's private god of the soil's mound. But most significant, and analogous to the Chinese mound of the great god of the soil, is the Angami pyramid of the **kithuchie**. This is the sacred stone of the village or clan which seems 'to be regarded as the dwelling place or the repository of the prosperity of the community or of the spirit which promotes it.....the **kithuchie** is sometimes a very ordinary looking flattish stone, built in the top of a more or less pyramidal stone mound."

"The **kithuchie** pyramid is not only analogous to the mound of the Chinese great god of the soil. It is also cognate to the ziggurat in shape and, more important, also in meaning. These facts have a close bearing on the character of the pre-Indian civilization of the Khmers: They suggest that other pyramids associated with Older Megalithic remains found nearer to Cambodia,

and probably due to early Khmers, are likely to have had the same significance. The Khmers of the 9th century A. D. are no more likely to have completely forgotten the meaning of their ancestors' pyramidal structures, than they had forgotten the cult of sacred mountains. If Brahmans arriving from India at that time were familiar with the abstract concept of Meru as a stepped pyramid, it was nevertheless Khmer choice that preferred it, realized it in massive architecture and continually developed it as the outstanding feature of Combedian temple building" (*The Sacred Mountain*, loc. cit., p. 29.)^১

(৪) ঋগ্বেদের 'মন্দির-শৈল' পুরাণে কল্পিত দেবের প্রতিচ্ছিত্তি রূপে কল্পিত হত এ-বিষয়ে শিলালিপিরা সাক্ষ্যই প্রদান। বস্তুতঃ কাঞ্চন রাজারা তাঁদের নগরী স্থাপনে পৌরাণিক বিশ্বতত্ত্ব(cosmology)কেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে সে-আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। বিশ্ববিখ্যাত আংকোর বাত্ বা প্রোম্বাংখে-এ দেবের যে পূর্ণকল্পিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে, ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যে ভারতও কোনও নিদর্শন মেই (জটব্য G. Coedes, *Pour mieux comprendre Angkor*, Paris, 1947, Ch. V Symbolisme architectural; J. Filliozat, *Le symbolisme du monument du Phnom Bakheng*. BEFEO., XLIV, fasc. 2, 1954, pp. 527-554). কঞ্চনবাসীরা কেন সে কল্পনিক দেবকে তাদের 'মন্দির-শৈলের' আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল? ডঃ ওয়েল্‌স্ এ-প্রশ্নের ঘণ্য উত্তরই দিয়েছেন। কঞ্চনবাসীরা হিন্দু-সংস্কৃতি গ্রহণ করেও তাদের পূর্বপুরুষদের শৈলোপাসনা বিস্মৃত হতে পারে নি; সুতরাং সেই পূর্বপুরুষরা শৈলের প্রতিচ্ছিত্তিবরূপ যে পিরামিড নির্মাণ করতেন, তাই বা কি করে ছলবে তারা? ব্রাহ্মণগণ ভারত থেকে যে পৌরাণিক করনা নিয়ে এলেন, তা অবলম্বন করে এ-দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিই পূর্ণতর বিকাশ লাভ করল। প্রাচীন মেগাসিথিক ঋগ্বেদ সভ্যতার যে তলসমবর্তিত পিরামিডের নিদর্শন পাওয়া যায়, তার সাথে চীনের ভূমি-দেবতার (god of the soil) জুপ ও হেসোপোতামিয়ার জিভরাতের আকৃতিগত ও তাৎপর্যগত সাদৃশ্য রয়েছে। জিভরাতও শৈলের প্রতীক ও উর্বরা-শক্তির কেন্দ্র বলে কল্পিত হত (জটব্য H. Frankfort, *The Birth of civilization in the Near East*, London, 1951, p. 54).

তথু কথুজে নয়, প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে মেরুর অবস্থান কল্পিত হ'ত। তার উপর চীন ও মধ্য-প্রাচ্যের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট রিচার্ড উইনস্টেড্ যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য :—

“The Kings of Sumatra, Java, Cambodia, Burma and Siam, all had at their capitals a Meru, namely a hill or shrine or temple or palace-tower that symbolized the Hindu Olympus. And this symbol was probably developed from the earth-mound that in the time of Confucius stood on the confines of a Chinese town to represent the whole district. The idea of this mound in turn may well have come from Babylon or the Middle East, and have given the Sumatran the idea of a pyramid grave, and the Javanese the idea of a pyramid temple like the Chandi Sukuh, erected when nationalism had revived and triumphed over Indian influence” (*Malaya and its history*, p. 27 f.).

সম্প্রতি য. ওয়র্ক সেদেশ্ কাবুজ ‘দেবরাজের’ সংগে প্রাচীন চৈনিক ‘God of the soil’ এর সম্পর্ক সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :—

“It is not by chance if most of the characteristics of the Khmer devaraja are found in the god of the soil of ancient China : his representation by a pillar planted on a square mound recalls the linga on its pyramid, the investiture of vassals by a clod of earth taken from the imperial god of the soil's altar is paralleled by Yasovarman's giving a ‘residuum’ of his linga Yasodhariesvara to a Brahman so that he made a linga destined to be installed on a newly granted land ; the offering of a booty to the god of the soil on the return from a victorious campaign is attested in Cambodia in the eleventh century in favour of the gold linga of Udayadityavarman II ; the eviction of the private god of the soil of a fallen dynasty and its transformation into a dead god which became the object of funerary rites is analogous to the transformation

of the temple of devaraja into the mausoleum of its founder; the association of the altar of the god of the soil with the temple of the ancestors is also found in Cambodia, as between the temple-mountain of the devaraja and the funerary temple of the king's relatives.

"These correspondences find their explanation in the common origin of the two cults. In effect, one must remember that the cult of the devaraja had for its object the independence of the country from Java, and its territorial unification under the authority of a single king who is designated by a Khmer expression meaning "master of the inferior surface"—that is to say, master of the soil. One of the characteristics of the primitive religion of Asia of the monsoons is that of a religion of the soil. It is this characteristic that one ultimately finds again in studying the deification of the Angkorian royalty, its association with the pyramid, of which the form reminds one simultaneously of the sacred mountains of the earlier kingdoms of Cambodia and the mound of the Chinese god of the soil, and lastly its association with the cult of the ancestors, guardians of the soil."

(৫) Indian Art and Letters, XXVI, p. 52f.-এ প্রকাশিত সারাংশ। সেদেশের বক্তব্য প্রথমে ইতালীয় পত্রিকা Conferenze (১৯১১)-এ প্রকাশিত হয়। হুঃশের বিষয় এ পত্রিকাটি দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। এদেশে কোথাও তা পাওয়া যায় বলে আমার জানা নেই।

সাংস্কৃতিক অর্থে 'মৌজ্ম-এশিয়া' (l'Asie des moussons) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ম. পল দুল। ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মহাসাগরীয় অঞ্চলের (Oceania) কিছু অংশ ও দক্ষিণ-চীন নিয়ে এই বিস্তৃত অঞ্চল। এ-অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতিতে একটি একেবারে সন্ধান পাওয়া যায়, তার বিশেষ লক্ষণ উর্বরাশক্তির আরাধনা। যবনীরের প্রকৃষ্ণ হ'তে মুক্ত, সার্বভৌম কাশুক রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই 'দেবরাজের' উদ্দেশ্য, তাই চৈনিক 'তুনি-দেবতার' সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। উর্বরা শক্তির আরাধনা (fertility cult) কিন্তু শুধু মৌজ্ম এশিয়ার নয়, সহগ্র প্রাচীন এশিয়ারই সাংস্কৃতিক অংশ—এ-কথা প্রমাণিত করেছে ডঃ ফ্রাঙ্কফোর্ট ও ডয়েলসের গবেষণা।

ভারতে যে-সকল শৈব-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে চারটি প্রধান : যপা, শৈব, পাশুপত, কাপালিক ও কালমুখ। এদের মধ্যে পাশুপত সম্প্রদায় প্রাচীনতম, এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় শতম শতাব্দী থেকে কতৃক্রে এ-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম যশোবর্মার (৮৮৯—৯০০ খ্রিঃ) সময় থেকে শৈব-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। ভারতে অনতিপূর্বে এ-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল, এ-কথা তা থেকে অনুমান করা যায়। ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক রাষ্ট্রদূত চৌ তা-কুয়ান্ কতৃক্রে একটি শৈব-সম্প্রদায় দেখতে পান, তাকে তিনি পা-সো-ওই ব'লে অভিহিত করেছেন। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে 'পা-সো-ওই' 'পাশুপত' শব্দেই চীনা রূপান্তর। এ-মত গ্রহণ করার পক্ষে অন্তর্বিধা আছে, কারণ চৌ তা-কুয়ান্ পা-সো-ওই সম্প্রদায়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তা পাশুপত সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এই বিবরণ থেকে আমার মনে হয়, পা-সো-ওই সম্প্রদায় জয়োদশ শতকের শেষার্ধ্বে কতৃক্রে একটি অবনত, স্বতন্ত্র শৈব-সম্প্রদায় মাত্র ছিল। তখন সে-দেশে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম প্রাধাণ্য লাভ করেছে ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। এ-অবস্থায় তেমন একটি শৈব-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সহজেই অনুমান করা যায়। ম. জর্জ সেনেসের মতে 'পা-সো-ওই' 'তপস্বী' শব্দের চীনা বিকৃতি।

প্রাক-ভারতীয় স্থানীয় সংস্কৃতির সংগে শৈব-ধর্মের সংযোগ সহজে যথাসম্ভব আলোচনা উপরে করেছি। সে-সংযোগের ফলেই কতৃক্রে শৈব-ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পতনের যুগেও অম্লবিস্তর বিরাগমান ছিল। কাণ্ডুজ শৈব-ধর্মের আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য। কাণ্ডুজ শৈবাচার্যগণ শুধু ভারতীয় শৈব-শাস্ত্র অনুসরণ ক'রেই তুষ্ট ছিলেন না, তাঁদের নিজস্ব প্রতিভায় বর্ধিত ক'রে তুলেছিলেন তাকে। এ-প্রসঙ্গে দু'টি নৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবরণ নির্বকে 'অষ্টমূর্তি' ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। কতৃক্রে এই 'অষ্টমূর্তি' ধারণা শিবোপাসনায় অতৃপূর্ব পরিণতি লাভ করেছিল।*

ইন্দ্রবর্মার বাকং লিপিতে (৮৮১ অঃ) ও রাজেন্দ্রবর্মার মেবন (৯৫২ অঃ) ও প্রে রূপ (৯৬১ অঃ) লিপিতে 'অষ্টমূর্তি' প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত

আছে আটটি শিব-লিং স্থাপন করে সূচনা করা হ'ত শিবের 'অষ্টমূর্তি'তে প্রকাশ। ভারতবর্ষে এরূপ কোনও রীতি প্রচলিত ব'লে আমাদের জানা নেই।* কল্পজ্ঞে শিবকে যেসকল রূপে উপাসনা করা হ'ত, তাদের মধ্যে একটির উল্লেখ পাওয়া যায় 'উমাগংগাপতীশ্বর' ব'লে। ইন্দ্রবর্মার বাক্য লিপিতে শিবের এ-মূর্তির যে বর্ণনা আছে তা এইরূপ :

উমাগংগাভূজলতাসংল্লিষ্টজঘনস্থলম্

স ইশ্বরং স্থাপিতবান্ উমাগংগাপতীশ্বরম্ ॥

বাক্য-এ প্রাপ্ত একটি মূর্তির সংগে এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে (G. Coedes, *Une statue de Civa récemment découverte a Bakon*, BEFEO, XXXIX, 1939, fasc. 2, p. 221), ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে শিবের এরূপ কোনও মূর্তির পরিচয় নেই।

৭। ইলানিলাসিঃস্ত্রাক্-সলিলাবান্দঘনঃ

হাষদ্বীদিতিতম্ভ সোহষ্টমূর্তীরতিষ্ঠিৎ ॥

—বাক্য লিপি: G. Coedes, *Inscriptions du Cambodge*, I, p. 33.

৮। সম্মতি য় ফিলিপ ত্রেবুন্ 'অষ্টমূর্তি' সম্পর্কে নতুন আলোক সম্ভাষ করেছেন। তাঁর মতে বাক্য, দেবন ও প্রে-কণের 'অষ্টমূর্তি' সংগে কেশরীর লিংগের সম্পর্ক স্পিনোজার *nature naturée* অর্থাৎ দৃষ্ট প্রকৃতির সংগে *nature naturante* অর্থাৎ স্বজনী প্রকৃতির সম্পর্ক। 'দেবরাজের বহিঃস্থলেনে' 'অষ্টমূর্তি' প্রতিষ্ঠা এইরূপে রাজার সার্বভৌম প্রকৃষ্টি হ'চনা করত। (Ph. Stern, *Diversité et rythme des fondations royales khmeres*, BEFEO, XLIV, fasc. 2, 1954, p. 652f.)

জাতির ভারত-স্মৃতি

শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনার পটভূমিকা আশ্রয় করে যে কয়েকজন ফরাসী এদেশে জীবনের কয়েকটা বছর অতিবাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যাঁ বাপ্তিস্ত জোসেফ জাতির নাম অনেকেরই জানা আছে। তরুণ বয়সে (১৭৫২ খৃঃ) ভারতবর্ষে এসে তিনি ছন্দে, বৃন্দী, 'ল', কনচ' ও দানী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফরাসী নাটকের অধস্তন কর্মচারী রূপে কাজ করেন। কণ্ঠটুকু ফরাসীদের ভাষ্য বিপর্যয়ের পর তিনি আর্মারী সেনাপতি গুরগণ খাঁর সুপারিশে কিছুদিন নবাব মীরকাসীমের পক্ষাবলম্বন করেন। বঙ্গসারের যুদ্ধে মীর-কাসীমের পতনের পর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সুনজরে পড়েন ও তাঁর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইংরাজদের দাবী মার্কিক তাঁকে অযোধ্যা ত্যাগ করতে হয়। এরপর তিনি বছর কয়েক চন্দননগরে অতিবাহিত করে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এদেশ থেকে তিনি অনেক অস্ত্রশস্ত্র, হুজা এবং একশো তিনখানি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। সেগুলি তিনি রাজার পুস্তকাগারে রক্ষিত করেছিলেন। ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুইয়ের কাছ থেকে নানাবিধ সম্মান লাভ করার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিয়ারতর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতস্মৃতি (১৮২২ সালে প্রকাশিত, Memoires Sur L' Indoustan) ছাড়া জাতির আরও চারটি বই লিখেছিলেন; যথা— ভারতের মুজাবিবরক ইতিহাস, মোগল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ আর ত্বরত (Barbt) থেকে পিথোরী (Petourab) পর্যন্ত হিন্দুস্থানের রাজাদের ইতিহাস।

ভারতস্মৃতি বইটির মধ্যে সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়াও কথাপ্রসঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহারের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে সমস্ত বিষয়ে জাতি লিখেন

বা জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেছেন তার ঐতিহাসিকতা খুবই দুর্বল। বইটি সর্বসম্মত সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত—কোন কোন অধ্যায় আবার কতকগুলি খণ্ডের সমষ্টি। অধ্যায় বিভাগের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। নীচে অধ্যায়গুলি ও তাদের বিষয়বস্তুর একটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে। এর থেকে জাতিদের অসুসঙ্গিকতার ব্যাপকতা অনুমান করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়—

- (১) দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক বিবরণ।
- (২) সলাবৎ-জঙ্গের প্রাত্যুপ্তীর বিবাহ।
- (৩) ছমের পদচ্যুতি-প্রসঙ্গ।
- (৪) লালী-সমাচার।

দ্বিতীয় অধ্যায়—১। মচন্দ্রদশাহের রাজত্বকাল।

২। নাদিরশাহের অভিযান।

তৃতীয় অধ্যায়—১। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ ও ঈরাজদের বঙ্গবিজয়ের আলোচনা।

২। ইংরাজ বনাম সুজাউদ্দৌলার যুদ্ধের ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়—১। সুজাউদ্দৌলার ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়—১। টিপুসুলতানের দৌত্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—১। ওয়ারেন হেস্টিংস।

সপ্তম অধ্যায়—১। পাঁচজন ইতিহাস বিখ্যাত মহিলার বিবরণ—

- ১। রিজিয়া।
- ২। মুরজাহান।
- ৩। জাহানারা।
- ৪। জুলিয়ানা।
- ৫। বেগম্ সন্নু।

এছাড়া একটি দীর্ঘ ভূমিকাও আছে। এতে জাতিগুলি ভারতবাসীদের ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি আজও বিপুলগণের অবতারণা করেছেন। আকবর সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে তাঁর রাজত্বে ৭৫টি বিভিন্ন উপধর্ম ছিল, তিনি গোয়ার খৃষ্টানদের পছন্দ করতেন এবং কাশীতে এক হিন্দুর বাড়ীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

জাঁতিলের অধ্যায়গুলির সমস্ত বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এইগুলির মধ্যে যে কয়টি তথ্যপূৰ্ণ বা কৌতুকাবহ তাহাই সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দেওয়াই এই প্ৰবন্ধের উদ্দেশ্য।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস প্ৰসঙ্গে জাঁতিল মারাঠাদের অসামান্য অত্যাচারের কথা বলেছেন এবং পাণিপথের যুদ্ধের পর তাদের শক্তিস্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন কিন্তু শিৱাজীৰ নাম গন্ধও করেননি। পেশৱা বাজীরাও সম্বন্ধে অবস্তা ছাড়া কথা বলা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার সদাবৎ জঙ্গের ডাইৱিৰ বিবাহ বৰ্ণনা করতে গিয়ে তিনি সেকালকার অভিজাত সম্প্ৰদায়ের মুসলমানদের সামাজিক আচাৰ ব্যবহাৰ সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর তথ্য পৰিবেশন করেছেন। এৰূপ একটি প্ৰথা ছিলো বিবাহের বর ও বধূৰ প্ৰথম চাকুষ পৰিচয় সম্পন্নিত। প্ৰথমে বধূৰ অবগুষ্ঠন তুলে দেওয়া হত এবং তার মাথার উপর একখণ্ড মিছরি স্থাপন করা হত। বরকে এই মিছরির খণ্ডটি ঠোঁট দিয়ে তুলে নিতে হোত। এইভাবে বধূৰ ঠোঁট নাক ও বুক থেকে পরপর মিছরির খণ্ড ঠোঁটে করে তুলে ধরতে হোত। এই বিশেষ আচাৰের উদ্দেশ্য ছিল নববিবাহিত দম্পতির বিবাহ জীবনকে মধুময় করে তোলা। এরপর প্ৰথম মিলন রজনীকে সাক্ষ্য মণ্ডিত করবার জন্তু আৰও কতকগুলি অহুষ্ঠান পালন করা হোত।

বিবাহ প্ৰসঙ্গ শেষ করে জাঁতিল নিজাম ও নাগপুৰের ভৌঁসলা রাজার সৈন্যদের মধ্যে একটি সীমান্ত যুদ্ধের বিৱৰণ দিয়েছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। এতযুদ্ধে প্ৰচুৰ লোকক্ষয় হয়েছিলো ও বহুনিৰ্দোষ নরনারীৰ প্ৰাণনাশ হয়েছিলো। জাঁতিল স্পষ্টই বলেছেন যে এরকম দুষ্কৃত্তি তিনি কখনও দেখেন নি (*Jamais n'ai vu de spectacle aussi horrible*)। শেষ পৰ্য্যন্ত নিজামই জয়লাভ করলেন ও মারাঠানায়ক রঘুজী (Ragotgi) ভৌঁসলাকে যুদ্ধের সমস্ত খরচ দিতে হলো এবং কতকগুলি জায়গীৰ ও ছেড়ে দিতে হলো। এইখানে সুৰ্ঘরাও (?) (Sureirah) নামে একজন বিজোহী জায়গীৰদাৰের গ্ৰোচনীৰ পৰিণামের কথা বলা হয়েছে। শেষ পৰ্য্যন্ত তাঁর পৰিৱাৰবৰ্গ আন্তনে পুড়ে আত্মহত্যা করে এবং তাঁকে বিধ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়।

গোদাবরী তাঁরবতী ৰাজমহেশ্ৱৰীৰ সহচরের কথা বলতে গিয়ে জাঁতিল গোদাবরী নদীকে গদা বলে অভিহিত করেছেন। সহচরটি যখন প্ৰথম

মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয় তখন নাকী এখানকার সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো।

এর পরই মসিয়ৌ গদ্বহের আগমন ও ছুন্নের অপসারণ সবকিছু হুঁচর কথা বলা হয়েছে। গদ্বহে ইংরেজদের সঙ্গে যে যুদ্ধবিবর্তির সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন সে সবকিছু জাঁতিল আক্ষেপ করে লিখেছেন যে এতে ইংরেজদের সুবিধে হয়েছে বেশী, কারণ তা না হলে ফরাসীরা তাদের দক্ষিণ-ভারত থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দিতে পারতো (nous etions en etat de les chasser entierement de la peninsule)।

এই সময় বুসীর সাহায্যে সলাবৎ জঙ্গ মহিশুর আক্রমণ করেন। মহিশুরের হিন্দু রাজ্য শেষ পর্যন্ত সন্ধি-ভিক্ষা করেন ও বুসীকে তাঁর আশুগত্য জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তার মর্ম হচ্ছে—মহান বুসী! আমার রাজ্য সন্ত্রম ও শান্তি সবই আপনার হাতে। আমাকে আপনার দাস বলেই বিবেচনা করবেন। ভগবান আপনারকে দীর্ঘায়ু করুন (que le Bagouan augmente tous les jours)।

বুসীর ভিজাগাপত্তম অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে জাঁতিল স্বজাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। ভিজাগাপত্তমের ইংরেজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর বুসী তাদের প্রতি কীরকম সহৃদয় আচরণ করেছিলেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় ইংরেজ-সেনানী পাসিভালকে বুসী একটি চিঠি লেখেন—আপনি নিশ্চয়ই জানেন মন্ডননগরে ফরাসীদের প্রতি কীরকম ব্যবহার করা হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার জাতভাইদের অনুকরণ করিনি (je ne veux cependant imiter vos compatriotes)।

এর কিছুদিন পরেই মিসেস্ ব্রাইডের অনুরোধে বুসী পৌজেন ইংরেজ নাবিককে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে জাঁতিলের সর্ব্ব মন্তব্য প্রাধান্য যোগ্য—“কোনো ফরাসী সৈনিক নারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে না। যদি তা তাঁর সম্মান ও কর্তব্য হানিকর না হয়।”

কাউন্ট লালীর মর্যাদাসিক পরিণাম সবকিছু বলতে গিয়ে জাঁতিল তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদের বড়োদ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে লালীর মতো ব্যক্তির পক্ষে দেশ বা রাজার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবিস্থান্ত।

এর পর হুগু হুগু ছপ্পের পদচ্যুতি এসেছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, হুগুের ভারত ত্যাগের সংবাদে ইংরাজরা খুঁই উৎফুল্ল হয়েছিলো। তারপর এই বিষয়ে জনকয়েক দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকদের অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যথা—ফাঁতিন ও অরুম্। ফাঁতিন বলেছেন যে, যদি ফরাসী-সরকার হুগুের বিরাট পরিকল্পনার উপযোগী সাহায্য পাঠাতে পারতেন এবং প্রথম থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বহুপরিকর হতেন তাহলে ফরাসী-সাম্রাজ্য সত্যিই হৃদয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো। চায়দর আলীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত করে হুগুতো দক্ষিণাভ্য থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা যেতো। ইংরেজ ঐতিহাসিক অরুম্ ও স্বীকার করেছেন যে, হুগুে হুগুেশীয় সরকারের কাছে থেকে যথোপযোগী উৎসাহ ও সাহায্য পাননি।

এইবার বাংলাদেশ সম্বন্ধে জাতিদের কি বক্তব্য আছে দেখা যাক।

এই দেশটি বঙ্গ (Bengue) বলে অভিহিত হয়েছে, নোয়ার (No'o) এক বংশধরের নাম অনুসারে। মোগলরা যখন এই দেশের অধিকারী হলো, তখন তারা এখানকার জলীয় আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য চারকোণা জমি তৈরী করলো এবং চারদিকে ইটের দেয়াল গাঁথতে শুরু করলো। এই রকম চতুর্কোণকে ফারসী ভাষায় “আল” বলে। এবং সেই থেকে বঙ্গ বঙ্গালে পরিণত হলো। এই দেশটি অনেকগুলি নদী ও খালে সিঞ্চিত। গঙ্গানদী ভারতের সব থেকে বড় নদী। এই নদীর জন্ম হয়েছে তাতারীর সীমান্তস্থিত পর্বতের পাদদেশ থেকে। তারপর হরিদ্বার (Arlouar) গড়মুক্তেশ্বর, মথুরা, ফরকাবাদ, কনোজ (Canoudje) দিল্লী, এলাহাবাদ ও বিহার হয়ে এই নদী সিক্কিমের পাহাড় অতিক্রম করে বাংলার প্রবেশ করেছে। তারপর সাতগাঁ বন্দরে এসে (Ijatgaonbunder) জিনটি মোহানা তৈরী করে নদীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এখানকার উর্বর ও ডিঙে মাটিতে এত বেশী চাল উৎপন্ন হয় যে, এ ডাল্লারের সমস্ত নৌকা পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যায়। ইউরোপীয় বণিকরা এখান থেকে নানারকম কাপড় ও মসলিন ইউরোপে চালান দেয়। এই মসলিন নয়ানসুক (Nouyanesouk) বলে পরিচিত।

তারপর বাংলার প্রধান সত্তরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। কলিকাতার অট্টালিকাগুলির গঠনকার্যের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেনেরও একটি বর্ণনা আছে।

বাংলার অন্তর্গত উড়িষ্যা-প্রদেশের সম্বন্ধে জাঁতিল বলেছেন : এটি একটি পাহাড়ে ও বহু অঞ্চল ।

বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :—

সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় সম্বন্ধে জাঁতিল কী বলেছেন দেখা যাক । “নতুন নবাবের কুচরিত্র-ও দুর্বলতা অশাস্তির পথ প্রস্তুত করেছিলো । কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজরা তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলো এবং সেই কারণে একমাসের মধ্যে তিনি তাদের সমস্ত কৃষ্টি থেকে বিভাঙিত করেছিলেন । তারা জাহাজে করে পালাতে বাধ্য হলো এবং কলিকাতা হলো অধিকৃত ও লুণ্ঠিত । অস্ত্রাস্ত্র ইউরোপীয়রা প্রচুর টাকা দিয়ে নিজেদের বাঁচালো । চন্দননগর ছিলো সব দিক দিয়েই অরক্ষিত—মাত্র অরক্ষিত দুর্গ ছাড়া আর কোনও আক্রমণরোধের ব্যবস্থা ছিল না ।……ইংরেজ-নৌবহর গঙ্গায় এসে হাজির হলো ও মুসলমানদের কাছ থেকে কলিকাতা অধিকার করে নিলো । ইংরেজরা হুগলীও হস্তগত করলো । নবাব প্রথমে ফরাসীদের আহ্বান করলেন ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদের মধ্যস্থতা করতে । কিন্তু ইংরেজরা ফরাসীদের এর মধ্যে আনতে রাজী হলো না । এরপর তারা অতর্কিতে নবাবের শিবির আক্রমণ করলো । কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো এবং তাদের একশ জনের ওপর সৈন্য মারা পড়লো । নবাবের মন্ত্রীরা কিন্তু এই সুবিধার সুযোগ নিলো না । উপরন্তু সন্ধির প্রস্তাব করলো । নবাব অসুবিধাজনক সর্তে রাজী হতে বাধ্য হলেন খানিকটা । তাঁর সেনানীদের বিক্রোহাত্মক মনোভাবের জন্ত এবং খানিকটা আকগান আক্রমণের আশঙ্কায় ।”

পলাশীর বৃহৎ সম্বন্ধে জাঁতিল লিখেছেন—

“সিরাজদ্দৌলা এই সন্ধির প্রতি তাঁর বীতরাগ গোপন রাখতে পারলেন না এবং তার সর্ভগুলি এড়িয়ে যেতে লাগলেন । ইংরেজরা তাঁর সর্বনাশের জন্ত তৎপর হয়ে উঠলো । নিজেদের স্বার্থে তারা নবাবকে প্ররোচিত করলো কাসিমবাজারে আশ্রয়প্রাপ্ত মসিয়ের ল-কে বর্জন করতে । গোটা দরবারটাকেই তারা হাত করলো । নবাবের মুখ্যমন্ত্রী ও পিতৃব্য বীর-জাকিরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ঠিক হলো এই সর্ভে যে ক্ষেত্রয়ারী মাসের সন্ধির সমস্ত সর্ভ পালন করা হবে এবং ইংরেজদের সর্বসম্মত তিনশো লাখ টাকা দেওয়া হবে ।

বারোই জুন ১৭৫৭ তারিখে ইংরেজরা প্রায় ১২০০ খেতাব ও ৩০০০ সিপাহী সৈন্য নিয়ে মুকন্দাবাদের দিকে রওনা হলো। নবাবের চৈতন্যোদয় হলো। কিন্তু মীরজাফরকে বন্দী করবার সাহস হলো না। উপরন্তু তিনি তাকে প্রতুতক্রির ওপর আর এক প্রহ্ন বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলেন। নবাব তাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করলেন এবং মূল-কে তাঁর সঙ্গে যোগদান দেবার সময় না দিয়েই নির্বোধের মতো শত্রুর সম্মুখীন হলেন। তাঁর সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হলো।”

জাঁতিল কোথাও পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। এরপর জাঁতিল মীরকাসিমের সংগে ইংরেজদের বিরোধের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এর থেকে তাঁর এই মন্দভাগ্য নবাবের প্রতি সত্যস্মৃতি ও ইংরাজ-বিরাগের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

“আমি কাসিম আলি খাঁর দরবারে হিলাম গুরগিন খাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে।...মিঃ এলিসের লোকের। কিভাবে নবাবের কর্মচারীদের অপসংহ করতো আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। এইভাবে যে বিষয়ের স্মৃতি হ’লো তার পরিণতি হলো নবাবের সর্বনাশে। আমি ভাসিটট’ ও ডেব্রিসের চিঠিগুলি পড়েছি। তাতে তাঁরা শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নবাব কিছুতেই এলিস ও আমিয়টের দৌরাত্ম্য ক্ষমা করতে পারেন নি। আর্ম্যানীজাতীয় গুরগিন খাঁ...এলিসের অভিমতের কথা জানতে পেরে সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে পাটনার দিকে যাত্রা করলেন—সংগে গেলেন আর্ম্যানী সেনাপতি মার্কীর ও মেহদী আলি খাঁ। মার্কীর ও মেহদী আলি পাটনায় প্রবেশ করে এলিসকে হঠিয়ে দিলেন। এলিসের মন্তলব ছিলো অযোধ্যায় লাগানো কিন্তু আর্ম্যানীজাতীয় সম্রাট (Sonner) তাকে বন্দী করলেন। ৪০ জন সেনানী ও ২০০ জন সৈন্যসহ এলিসকে মুন্সেরে নিয়ে যাওয়া হ’লো।”

এই সময়ই মঃ মাদেক ও তাঁর অধীনস্থ প্রায় ছ’শো জন করানী সৈন্যকে বাধ্য করা হয় ইংরেজদের হয়ে লড়তে। বলা বাহুল্য জাঁতিল এই কার্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। উপরন্তু একথাও বলেছেন যে ‘এইসব করানী সৈন্যের অন্তর্গত ইংরেজরা বাংলা জয় করতে পেরেছিলো।’ (c’est a la valeur des troupes francais que les Anglais doivent la possession du Bengale).

মীরকাসিমের হ্রদ্যেটের সংগে জড়িত দুইটি অপ্রীতিকর ঘটনা সঙ্গকে জাঁতিলের বিষয় উদ্ধৃতিযোগ্য। প্রথমটি হচ্ছে জগৎশেঠ ভ্রাতৃত্বের প্রাণ-দণ্ড বিধান এবং দ্বিতীয়টি এলিস্ প্রমুখ ইংরেজ কয়েদীদের হত্যাকাণ্ড।

“জগৎশেঠরা হিন্দুস্থানের মধ্যে সবচেয়ে ঐর্ষ্যবান্ মহাজন। দিল্লী থেকে উপাধিত অর্থ দিয়ে তারা বাংলার মসনদে সুবাদার বসাতো আর সরাতো। অর্থ দ্বারা সকলকে বশ করে তাদের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো যে তারা এলিস ও আমিরটের সংগে নবাবের বিরুদ্ধে মড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। পরে এরা ধরা পড়ে ও কারাকন্ড হয়।...নবাব অ্যাডাম্‌সকে লিখলেন যে যদি তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তাহলে তিনি তাঁর সমস্ত বন্দীদের বিনাশ করবেন। কিন্তু অ্যাডাম্‌স্ এই ভীতিপ্রদর্শনকে কারনিক বিবেচনা করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। জগৎশেঠরা গুরগিণ খাঁর সাহায্য তিচ্ছা করলো নবাবের মার্জনা পাওয়ার জন্য।”

অবশেষে গুরগিণ খাঁও উদ্ভ্রান্ত নবাবের কোপানলে পড়লেন। জাঁতিলের দৃঢ় ধারণা গুরগিণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো তা সর্বৈব মিথ্যা। জাঁতিলের সমক্ষেই গুরগিণকে একদিন হত্যা করা হলো।

“আমি কোনও দিন তাঁর বিন্দুমাত্র অবিষম্মতার পরিচয় পাইনি। ইংরেজরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো নবাবকে ছেড়ে চলে আসার জন্য এবং অস্বীকার করেছিলো যে তাঁর ভাই খাজা পেজুসের প্রাণ বাঁচিয়ে দেওয়া হবে...কিন্তু তিনি তাতে রাজী হন নি। কোনও মিথ্যা অপবাদ এরকম অযত্নভাবে উদ্ভাবিত হয়নি” (Jamaia calomnie ne fut aussi horriblement inventée). জগৎশেঠ ভ্রাতৃত্ব তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো সমস্ত পিতৃলের গুলিতে নিহত হয়ে।

ইংরেজ-বন্দীদের হত্যা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন জাঁতিল। কিন্তু শেখপর্যন্ত নবাবের আদেশে সমস্ত তাদের হত্যার ভার নিয়েছিলো। জাঁতিল তিনজন ইংরেজকে করাসী বলে পরিচয় দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মীরকাসিমের পরাজয় ও আত্মরক্ষার পর জাঁতিল অযোধ্যার নবাব শূজাউদ্দৌলার কাছে উপস্থিত হ'লেন এবং অচিরেই তাঁর স্থানজরে পড়ে গেলেন।

এরপর বন্ধারের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও একে একটি কষ্টলব্ধ যুদ্ধরূপে বলে স্বীকার করেছেন। জাতিলের বিবরণে মনে হয় অনেকের জন্য মিত্রপক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি।

“তুঘল যুদ্ধের পর ইংরেজরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলো এবং তাদের গোলাবারুদ, কামান, সাজসরঞ্জাম ও টাকাকড়ি সবই হস্তচ্যুত হলো। সবকিছু হারিয়ে মন্ডো খবর পাঠালেন যতশীঘ্র পারা যায় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি হাজার পাঠাতে কারণ পিছু হটে যাবার আর কোনও পথ ছিলোনা। কিন্তু মোগলসৈন্য (না-আলমের দলভুক্ত) ইংরেজদের পর্য্যাদস্ত করার চেষ্টা না করেই তাদের লিবার লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়ে অযথা সময় নষ্ট করলো। মন্ডো তখন মরিয়া হয়ে বেনৌবাহাদুরের (সুজাউদ্দৌলার সেনাপতি) বাহিনীর ওপর ঝপিয়ে পড়লেন। বেনৌবাহাদুর তখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও মোগল সৈন্যের পলায়ন রোধ করতে পারলেন না—তবে তাদের এক অংশকে লুণ্ঠিত জব্বাসহ টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। এইভাবে শত্রুকে পরাজিত করেও বেনৌবাহাদুর যুদ্ধরূপে পরলেন না। আর তাঁর বেপরোয়া আচরণের ফলে মন্ডো বিজয়ী হলেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যা তিনি অল্পকণ পূর্বে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসমসাহসী সুজাউদ্দৌলা চেষ্টা করেও তাঁর সৈন্যদের ফেরাতে পারলেন না।”

ইংরেজদের সঙ্গে সুজাউদ্দৌলার যে সন্ধিপত্র শেষ পর্য্যন্ত স্বাক্ষরিত হলো তার অশুভ পরিণতি স্মৃতির ব্যাপারে জাতিল বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ইংরেজ সেনাপতি ক্যামাককে তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন সুজাউদ্দৌলাকে ধ্বংস না করে তাঁকে মিত্রতাপূত্রে আবদ্ধ করতে; কারণ নবাবকে বেশী দীর্ঘাটল হরাতো সমগ্র হিন্দুস্থান তাঁর পক্ষগ্রহণ করবে। এইখানে জাতিল পাণ্ডটিকা দিচ্ছেন যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিলো ফরাসীশত্রুদ সুজাউদ্দৌলাকে বাঁচিয়ে অদৃঃভবিত্যে তাঁর ও মারাঠাদের সহায়তার ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

জাতিলের মধ্যস্থতায় ইংরেজদের সংগে সন্ধি স্থাপন করার পর লক্ষমনোরথ নবাব তাঁকে নানা উপাধিতে বিভূষিত করলেন—যথা

রফিউদোলা, নজরুজ্জং বাহাহুর, তব্বির-উল-মুলক ইত্যাদি। তিনি ক্যামাককেও পাচেলক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে। কিন্তু বেসরকারী অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই সাধুপ্রকৃতির কর্মচারী শেষপর্যন্ত তা নেননি। এবিষয়ে জাঁভিল টিপ্পনী করছেন—দুঃখের বিষয় এই কার্যে খুব কম ব্যক্তিই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে, (Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'imitateurs)।

এর পরের অধ্যায় জাঁভিলের প্রধান ভারতীয় পৃষ্ঠপোষক হুজাউদৌলাকে নিয়ে। জাঁভিল প্রমুখ প্রায় চারশো কন্নাসীদের সৈন্যদলে নিয়োগ করলেও নবাব তাদের আশা পূরণ করতে পারেননি। উপরন্তু অযোধ্যাকে একটি ইংরাজনির্ভর রাজ্যে পরিণত করবার পুরোপরি ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। হুজাউদৌলা একটিমাত্র সম্মানজনক কাজ করেছিলেন তা হচ্ছে ইংরাজদের চমকী সত্ত্বেও তিনি জাঁভিলকে ভাগ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী আসফউদৌলা ইংরেজদের এই দাবী উপেক্ষা করবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি।

জাঁভিলের ভারতস্বত্বের শেষের তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পুরোপুরি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়, কিন্তু এগুলির মধ্যে কিছু কিছু আকর্ষণীয় তথ্য নিহিত রয়েছে।

টিপুর দৌত্য—১৭৮৭ খ্রষ্টাব্দে মহিষুররাজ টিপু সুলতান ফ্রান্সের বোড়ল জুইয়ের কাছে একটি দৌত্য প্রেরণ করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। এই দৌত্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনজন সন্ন্যাস্ত মহিষুরবাসী—মহম্মদ দরবেল খাঁ, আকবর আলি খাঁ ও মহম্মদ ওসমান খাঁ। পণ্ডিচেরী থেকে যাত্রা করে এঁরা পরবৎসর জুনমাসে ক্রান্তে উপনীত হলেন। তারপর রাবার অনুমতি পেয়ে তাঁরা ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদে বোড়ল জুইয়ের সাক্ষাৎলাভ করলেন। প্রাক-বিগ্ৰহ যুগের সুবোঁ রাজশক্তির কীর্তমান মহিমা ও আড়ম্বরের পরিবেশে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁদের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে বোড়ল জুই যে ভাষণ দিলেন তার মর্ম হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর বিষমুত্র মিত্র হায়দার আলী ও তাঁর স্যোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের বন্ধুত্ব, নিষ্ঠা ও শৌর্য্যের কথা কখনও ভুলবেন না এবং তাঁর কাছে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা তিনি

মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করবেন। (J' examinerai avec attention ce qui me sera proposé)। এইখানে জাঁতিল পাঠকদের জানাচ্ছেন যে ভারতীয় দূতদের ভাষণ ও রাজ্যের প্রতিভাষণ রাজনৈতিক কারণে মুক্তি করা হয়নি।

কিন্তু টিপুর দৌত্যের উদ্দেশ্য সন্নিহিত হয়নি। সমস্তাবিল্ল ফরাসী রাজ্যের পক্ষে সে সময়ে টিপুকে সাহায্য করে ইংরেজদের সংগে পুনরায় যুদ্ধে ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব ছিলোনা। এই দৌত্যের বিফলতার জন্য টিপু ফ্রান্সের প্রতি এতো বীভৎশ হয়ে পড়লেন যে ফ্রান্সের নামোচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু ফ্রান্সপ্রত্যাগত আকবর আলি খাঁ ও মহম্মদ ওসমান খাঁ সেই দেশের ঐশ্বর্য ও সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের এতো অমুস্বাদী হয়ে পড়েছিলেন যে প্রায়ই ফ্রান্স ও ফরাসীদের প্রশংসা করতেন। এই অপরাধে পরিশেষে তাঁদের প্রাণনাশ করা হলো। (Il les fit a mettre a mort)। এ সম্বন্ধে জাঁতিল মন্তব্য করছেন যে ফ্রান্সের যে ঐশ্বর্য ও সম্পদের গুণগান করার জন্য টিপুর দূত ফ্রান্সের মৃত্যু ঘটলো নিয়তির চক্রান্ত ঠিক সেই সময়ই তার ধ্বংসের ব্যবস্থা হচ্ছিলো বিদ্রোহমূলক আন্দোলনের দ্বারা। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে জাঁতিলের মতো একজন প্রাচীনপন্থী রাজভক্তের কাছ থেকে এ ধরনের মতপ্রকাশ অপ্রত্যাশিত নয়।

ভারত যুতির শেষের দুই অধ্যায়ে পাঁচজন বিখ্যাত মহিলা ও ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে বোধ করি উক্ত ইংরেজ শাসকের প্রতি জাঁতিলের অশুকুল মনোভাবের জন্য। জানা যায় যে ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপীয়েন্টের সময় জাঁতিল দুইটি ফরাসী পত্রিকায় হেস্টিংসের অকৃষ্ট প্রশংসা রচনা করেছিলেন।

পাঁচটি সুবিখ্যাত মহিলাদের মধ্যে পোর্চুগীজ জাতীয় জুলিয়ানা দাকোটা সব চেয়ে স্বল্প পরিচিত। ইনি ঘটনাচক্রে আওরঙ্গজেবের দরবারে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের (অবিহ্বল বাহাদুর শাহের) শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জুলিয়ানার বিচক্ষণতার সাহায্যেই মাকী বাহাদুর শাহ তাঁর ভাই আজমকে পরাজিত করতে পারেন। নানাতাবে সজ্ঞাটের দ্বারা সমাদৃত হয়ে তিনি মোগল রাজমুকুটের রক্ষিকা

নিবৃত্ত হন এবং মহম্মদ শাহের রাজত্ব পর্যন্ত মোগলদরবারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে থাকেন। বাহাদুর শাহ প্রায়ই বলভেন জুলিয়ান। পুরুষ হলে আমি তাকে উজিরের পদে বহাল করতাম। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আগ্রার গির্জার প্রাচীরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

জুলিয়ান। লম্বকে জাঁতিলের এতো জানবার কারণ হচ্ছে যে তাঁরই এক দোহিত্রী-স্থানীয়ার (থেরেস্‌ স্‌ভেলহা) সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস

অমলেশ ত্রিপাঠি

নেপলস যাত্রায় রচিত একটি যুগ্মমুষ্টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একই জন্তলয় হেরোডোটাস ও থুকিডিডিসের আবক্ষ প্রতিকৃতি দুটো বিপরীত দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্রীসের দুটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের এই বোধ হয় যথার্থ রূপ—অসম অথচ অবিচ্ছিন্ন, পরিপন্থী তথাপি পরিপূরক। একজনের প্রেরণা পারসিক শৃঙ্খল মোচনের উন্নাসে উদ্দীপ্ত, বিদেশী বর্করের প্রতিরোধে সম্মিলিত গ্রীসের নৈতিক ও আত্মিক ঐক্যের সুরে বাঁধা। তার মধ্যে প্রকাল পেরেছে গ্রীক সভ্যতার সংগ্রাম-লব্ধ স্মৃতিচিহ্ন বীৰ্য্য, বিজয়-লব্ধ স্মৃতিচিহ্ন আত্ম-প্রত্যয়। আরেকজনের প্রেরণার পশ্চাতে গ্রীকজগতের অস্ত্রনিহিত বৈতবান—তার শক্তিতে শক্তিতে প্রতিযোগিতা ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরী, তার কেন্দ্রাতিগ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভয়াবহ জৈগী-সংঘর্ষ, তার বিকৃতকীর্তি নায়কদের অদূর-দর্শিতা ও অর্থলিপ্সা এবং সাধারণ নাগরিকদের অন্ধবৈর্য্য ও গড্ডলিকা সুলভ আচরণ। হেরোডোটাসের ভূগোল হারকিউলিসের ভ্রম থেকে পারস্পর্য্যন্ত প্রসারিত, অহুসন্ধিংসা নৃত্য, প্রাণীত্ব, সমাজত্ব এমনকি অলৌকিক পুরাণ ও অবিদ্যায় কাহিনী

বাদ দেয় না, কাল শতাব্দীর গণ্ডী সহজোত্তীর্ণ। তাঁর বিষয়বস্তু—ঐচ্ছিক মানুষের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নয়, তার জীবনের সামগ্রিকরূপ। থুকিডিডিসের দিগন্ত গ্রীক জগতে সীমাবদ্ধ, উপজীব্য—সমসাময়িক কাল এবং বিষয়বস্তু নগররাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে তার নাগরিক, যে একান্ত ভাবেই অ্যারিষ্টটেলীয় রাজনৈতিক জীব। নারী, দেবতা ও Oracle এর স্থান “পেলোপনেসীয় যুদ্ধে” নেই। হেরোডোটাসের ইতিহাসে মহাকাব্যের যুক্তপক্ষ বিস্তার, থুকিডিডিসে ট্রাজিডির অসহনীয় নিবিড়তা। হেরোডোটাসের ইতিহাসে সোফিস্টের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী চারণের (rhapsode) রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, থুকিডিডিসে সে দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুবাদী কোটাল্যনীতির ইন্ধনে প্রথরতর। অথচ অ্যাথেন্সের অভ্যুদয়ের মধ্যেই লুকিয়েছিল তার পতনের বীজ। হেরোডোটাসে যার প্রস্তাবনা, থুকিডিডিসে তার পরিণতি, উভয়ে মিলে থুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেন্সের উত্থান ও পতনের মহিমান্বয় কাহিনী সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের আদর্শ হেরোডোটাসের বহু উর্ধ্বে থুকিডিডিসকে স্থান দিয়েছে। বস্তুতঃ গবেষণা ও রচনা-পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনায় দ্বিতীয়কে শিরোপা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। প্রথমে তুলনায় তিনি চের বেশী যুক্তিবাদী, নিরাসক্ত এবং নৈরব্যক্তিক। প্রথম পারসিক অভিযান ঘটেছিল হেরোডোটাসের জন্মের (৪৯০-৪৮০ থুঃ পুঃ) সমকালে, দ্বিতীয় পারসিক অভিযান তাঁর বাল্যকালে। সেই গ্রীক পারসিক সংগ্রাম তাঁর ইতিহাসের উপজীব্য। পূর্বসূরী মিলেটাসবাসী হিকাটিউসের রচনাবলী, নানা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ-লব্ধ স্বকীয় অভিজ্ঞতা—এই তিনটি ছিল তাঁর মূল্য উপাদান, হয়ত কিছু কিছু শিলালিপির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপাদানগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেননি, তা না হলে তিনি লিখতেননা—স্পার্টাবাসীরা অরেটিসের অস্থির জোরে যুদ্ধে জেতে, জেরেকসিসের স্থলবাহিনীতে ১,৭০০,০০০ সৈন্য ছিল, নেবুচাদনেজার ছিলেন নারী বা আল্প্‌ একটা নদীর নাম। মিসরীরা কি ভাবে সমাধি দেয়, ড্যানিয়ুব অঞ্চলের অধিবাসীরা গন্ধ-সুঁকেই মাতাল হয়, ভারতবাসীরা অশুষ্ক আত্মীয়দের খেয়ে ফেলে এবং ভারতীয় পিপীলিকা (যারা পেয়ালের চেয়ে বৃহদাকার) সোনা খুঁড়ে বার করে, অ্যাথেনা

দেবীর নারী পুরোহিতের কত বড় দাড়ি গজিয়েছিল—কোন মহাদার কাহিনীই তিনি উপেক্ষা করেননি। আশ্চর্য্য কি যে রায়ের অণুবীক্ষণ তাঁর ইতিহাস ভ্রমণকারীর রোম্যান্স বলে প্রতীয়মান হয়েছিল! আরওই তিনি বলেছেন তিনি ইতিহাস লিখছেন—“To the end that time may not obliterate the great and miraculous deeds of the Hellenes and the Barbarians and especially that the causes for which they waged war with one another may not be forgotten.” কিন্তু আসল বিষয়বস্তুতে আসতে গিয়ে কত অবাস্তব এবং অবাস্তব ঘটনারই না তিনি অবতারণা করেছেন। লিভিয়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে জাইক্সেস ও ক্রেসাসের কাহিনী তাঁকে বলতেই হয়, সিসটিসের বৃত্তান্ত শেষ হতে না হতে তিনি হেলেন ও প্যারিসের প্রণয় বর্ণনা করতে বসেন। দেবদেবী বা ওরাক্সের প্রতি তাঁর অসীম, সেমিলি, হেরাক্লিস ও ডায়োনিসাসের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করার ক্ষমতা তাঁর চেষ্টার ক্রটি নেই। বস্তুতঃ কারণ ও কার্যের পরম্পরা, যা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের প্রাণ, সে বিষয়ে হেরোডোটাস শিশু সুলভ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের চূর্ব্বার গতির পশ্চাতে তিনি দেখেছেন ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর ক্রিয়া এবং তারও পশ্চাতে অমোঘ নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান। দেবতার মাহুনের সূখে ঈর্ষান্বিত, তথা জাতির শ্রীবৃদ্ধিতে, অতএব উভয়েই অলীক এবং অগম্য, এমন একটা ইতিহাস দর্শন হেরোডোটাসের ছিল।

অথচ থুকিডিডিস যেন তাঁর সৃষ্টি থেকে আপন সত্যকেও বিলুপ্ত করেছেন : “Thucydides, an Athenian wrote the history of the war between the Peloponnesians and the Athenians...” উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক এই তৃতীয় পুরুষের উল্লেখে অভিভূত হয়েছিল, আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর সংযমে। যেখানে গ্রীক পারসিক সংগ্রামের ক্রমিকা লিখতে গিয়ে হেরোডোটাস করেক অধ্যায় ব্যয় করেছেন সেখানে পেলোপনেশীয় যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সমগ্র গ্রীক ইতিহাসের চুখক দিতে থুকিডিডিসের এক অধ্যায়ও লাগেনি। কারণ, ঐতিহাসিক কারণ-কার্য পরম্পরা নির্দেশে তিনি সম্পূর্ণ বৃত্তিবাদী। তিনি ইতিহাসকে ব্যক্তিগত কাহিনীর অগ্রক্রম বলে ভাবেননি, ইতিহাসকে

দেখেছেন বিচিত্র রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রসূত প্রবাহরূপে। খুব স্পষ্ট অথচ স্বল্প ভাষায় প্রথমেই তিনি বলেছেন—নৌবল, বাণিজ্যবল, সাম্রাজ্যবল, এই তিনের সমাহার হ'ল রাষ্ট্রীয় শক্তির চিরন্তন উৎস, তা অ্যাথেন্সের গৌরবের মূলে এবং স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্রের ঈর্ষার কারণ (এখানে লক্ষ্যীয় যে হেরোডোটাস দেবতার ঈর্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন)। পেলোপনেশীয় যুদ্ধের অবস্ফাবিতার অবতারণা এই ভাবে করেই তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল বিষয় বস্তুতে চলে গেছেন। তারপর কোথাও কোন অবাস্তব কথা নেই, দেবতা ও নারী নিরুদ্দেশ, এমনকি পার্থিননের উল্লেখও করেছেন অ্যাথেন্সের আর্থিক শক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে। অ্যাথেন্সের প্রখ্যাত নাগরিক এবং ৪২৪ খৃঃ পূঃ এ নির্বাচিত নৌ সেনাপতি হয়েও তিনি পরমশত্রু স্পার্টা বা করিঙ্থের প্রতি অছায় কটাক্ষ করেননি, অ্যাথেন্সের অনুসৃত নীতির অবধা সমর্থন করেননি, এমন কি পেলোপনেশীয় যুদ্ধে আপনার কলহরম্ম অংশও গোপন করার চেষ্টা পাননি। কেন তিনি যথাসময়ে অ্যান্টিপোলিস রক্ষা করতে পারেন নি—সে বিষয়ে বিচ্যুত আলোচনা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হত বিশেষতঃ যখন এই অপরাধে তাঁকে বিশবৎসর ব্যাপী নির্দাসন ভোগ করতে হয়েছিল। অথচ একটি মাত্র নৈব্যক্তিক উল্লেখ দ্ব্যতীত আর কিছু তাঁর ইতিহাসে মেলেনা এ বিষয়ে। এমন সংঘব বিস্ময়কর, অনেকটা অতি-মানবিক।

উনবিংশ শতাব্দীকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল তাঁর পদ্ধতির অনস্বীকার্য জ্যেষ্ঠতা। প্রথমতঃ তিনি স্থান ও কালের গভী সন্নির্গ করে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন। হেরোডোটাসের বিষয়বস্তু এত বিরাট যে তাঁর পক্ষে প্রত্যেকটি তথ্যের যথার্থ নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ উপর্যুক্ত কারণে হেরোডোটাস উপাদানের মূল্যভেদ করতে পারেন নি। তাঁকে অল্প অনুসন্ধানই স্কান্ত হতে হয়েছিল এবং সবচেয়ে মনোহারী তথ্যটি গ্রহণ করেই তৃপ্ত হতে হয়েছিল। “Little pains do the vulgar take in the investigation of truth accepting readily the first story that comes to hand.” এয়েন হেরোডোটাসের প্রতি পরাঘাত। প্রথমেই যে উপাদান হাতে এসেছে থুকিডিডিস তাকে

বিশ্বাস করেননি, এমন কি নিজের স্মৃতিকেও নয়। যেটুকু তথ্য তিনি লোকপ্রমুখাৎ সংগ্রহ করেছিলেন কি কঠিন পরীক্ষাই না তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে : “The accuracy of the report being always tried by the most severe and detailed tests possible.” তিনি জানেন বিভিন্ন দ্রষ্টা একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে এবং তার কারণ ভ্রমশীল স্মৃতি বা গোপন পক্ষপাতিত্ব। ঐতিহাসিকের এ-সব বিপদ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ও সাবধানতা আশ্চর্য্যকর্মের আধুনিক। তাঁর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে ও সচেতন ছিলেন বলে তিনি মুখবন্ধে তার সাফাই গেয়েছেন।

গুরুগম্ভীর পিউরিটান থুকিডিডিস ছুটি জিনিস ঘৃণা করতেন—ইউরিপিডিসের ভাবানুভূতি ও হেরোডোটাসের ধর্ম্মাঙ্কতা। উনবিংশ শতাব্দীর সংশয়ী মন স্বতঃই এতে সায় দিয়েছে। বিশেষতঃ থুকিডিডিস যে ইতিহাসের একটা utilitarian মূল্য নির্দেশ করেছিলেন তা তাদের মনঃপূত হয়েছিল : “The absence of romance in my history will, I fear, detract somewhat from its interest but if it be judged useful by those inquirers who also desire an exact knowledge of the past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things must resemble if it does not reflect it, I shall be content.”

ইতিহাস কোন ধর্মগত বা দার্শনিক ভাবনার আশ্রয়স্থল নয়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আধার। ডলটোয়ারের universal history ও মিশ্লের রোম্যান্টিক ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী উনবিংশশতাব্দীর Utilitarian ইতিহাসের এ ঘেন ফতোয়া। গ্রীস্যান, ব্যাঙ্কে প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা, যারা ইতিহাসকে মনে করতেন অতীত রাজনীতি এবং রাজনীতিকে বর্তমান ইতিহাস, তাঁরা থুকিডিডিসের মধ্যে ক্লাসিক আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন।

বৃগ্ন বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা বদলেছে। ফলে প্রব্রহ্মীন স্বাক্ষর চোখে থুকিডিডিসকে দেখা আজ অসম্ভব। বলা বাহুল্য সে যুগের গ্রীক ইতিহাস ব্যাপক আলোচনা করার ফলে নানা নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তার আলোকে সে যুগের মানস আমাদের কাছে স্পষ্টতর

ভাবে প্রতীয়মান, সে যুগের সমস্তা ও সর্বট নৃতনতর রূপে প্রতিভাত। তারি পটভূমিকায় থুকিডিডিসের ইতিহাসের দোষগুণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করতে হবে।

প্রথমতঃ ইতিহাস মানে যে শুধু রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা বা বিশ্লেষণ এমন কথা বিংশশতাব্দী অস্বীকার করেছে। হেরোডোটাসের মধ্যে এ সংকীর্ণতা ছিলনা। তিনি ছিলেন হেলিকারনেসাসের অধিবাসী। আইওনিয়ান গ্রীকদের দৃষ্টির দিগন্ত এসিয়ার সংস্পর্শে এসে প্রসারিত হয়েছিল। তাদের রাষ্ট্রগুলি যে কেবল পূর্ব পশ্চিমের মিলন ক্ষেত্র ছিল তা নয়, পূর্ব-পশ্চিমের ভাবধারার সংঘাতে এবং সময়ের সযুগ ছিল। হেরোডোটাসে তাই দেখি স্বভাবসিদ্ধ পরমতসতিমূর্ত্তা, একটা সংস্কারোষ্ঠার বিশ্ব নাগরিক-স্থলত রসবোধ। নির্ধারনের ফলে বহুদেশ তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব তিনি প্রয়োগ করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে। সাধারণ গ্রীক নগর রাষ্ট্রের বৈপায়নতা তাঁকে ছোঁয়নি। যখন অ্যাথেন্সে এসে তিনি বসবাস করছেন তখনও বিদেশী বলে নাগরিক রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিলনা। তাই তার বুদ্ধিলিপ্সা, কলহ-পরায়ণতা, দলীয় দীর্ঘা, ঘেঘ, যড়যন্ত্রের জালে তিনি জড়িয়ে পড়েননি। অতএব শক্তির সাধনাই যে রাষ্ট্রের চরম সাধনা এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতির চাবিকাঠি একথা তিনি স্বীকার করেননি। ইতিহাসকে ভূগোল, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সামাজিক বিবর্তনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া তিনি আদৌ উপলব্ধি করেননি। এবং থুকিডিডিস সে বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী অবহিত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক লিবারেল ঐতিহাসিকদের চোখে সেটাও সমগুণ। ঊনবিংশ-শতাব্দীর ম্যাকপলটিক প্রবুদ্ধ জার্মান ঐতিহাসিক ও সোশ্যালডার্কইনিজিম প্রবুদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং বিংশশতাব্দীর মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক সবুধে লিবারেলদের আশাভঙ্গ হয়েছে। শূভরায় তাঁরা হেরোডোটাসের সংযত রোমান্টিকতা, অলঙ্ঘ্য মানবিকতা ও সুস্থ empiricism পছন্দ করেছেন। থুকিডিডিসের অতিমাত্রিক আত্মসচেতনতা এবং প্রচ্ছন্ন নীতিবাদ তাঁদের ভাল লাগছে না।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে থুকিডিডিস রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক

এবং অর্থ নৈতিক অগ্রগতির মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যবসাবাগিজ্য বাদ দিয়ে কোন সভ্য সমাজের কথাই তিনি ভাবতে পারেন না। মূলধন ব্যতীত কোন অগ্রগতি সম্ভব তিনি মনে করেন না। কিন্তু এইজন্যই তিনি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্ববর্তী ইতিহাসকে (এবং সেই সঙ্গে গ্রীক পারসিক সংঘর্ষের ইতিহাসকে) অবহেলা করেছেন। যে সামাজিক ব্যবস্থা স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়নি, যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা শক্তির বৃদ্ধিতে ও বিস্তারে সহায়তা করেনি থুকিডিডিস তার সঙ্গে নিকটস্থক। খৃঃ পূঃ পঞ্চমশতাব্দীর অ্যাথেন্সের শক্তির মাপকাঠিতে পূর্বতন ইতিহাস অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়েছিল এবং পারস্য যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা একান্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। থুকিডিডিসের ইতিহাস দর্শন অনিবার্য ভাবেই তাঁকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ এবং তৎপ্ৰসঙ্গে অ্যাথেনীর সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত লিখতে প্ররোচিত করেছিল।

সে দর্শনের মূল কথা হল—মানব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তা। শক্তিমান দুর্বলকে পদানত করতে চায়, শক্তির আবেগনের চেয়ে শক্তির মোহ আকর্ষণ করে বেশী। এই নৈর্যাত্তিক স্থায়ী ইতিহাসকে চালিত করছে পুনরাবৃত্তির চক্রপথে।

উনবিংশ শতাব্দীর Social Darwinism এর মত এ যে নির্ভুল, দুর্বলের পক্ষে এর প্রয়োগ মারাত্মক, এ যে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী—এমন প্রশ্ন থুকিডিডিসের মতে অবাস্তব। তদানীন্তন দার্শনিকেরা একটি অল্প-মানের (hypothesis) সূত্র অবলম্বন করে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌল বিধান অব্বেষণ করছিলেন, থুকিডিডিসও তেমনি মানব প্রকৃতির এই সূত্রটি অবলম্বন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি চিরন্তন বিধান আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। হিপোক্রাটিস প্রবর্তিত চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর পদ্ধতিকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। পেলোপনেসীয় যুদ্ধ তাঁর কাছে ব্যাধি ছিলনা, ছিল ব্যাধির লক্ষণমাত্র। আর যেমন বৈজ্ঞানিক নিপুণতার সঙ্গে তিনি অ্যাথেন্সের প্লেগের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক তেমনি নিপুণতার সঙ্গে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর নগর রাষ্ট্রের ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। চিকিৎসকের চোখে রোগ বিচারে রোগীর ধর্মবিশ্বাস অবাস্তব, থুকিডিডিসের চোখেও ইতিহাস বিচারে নৈতিক প্রশ্ন অবাস্তব।

কর্ণফোর্ড মনে করেন এই পূর্ব ধারণার ফলে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ তাঁর চোখে এক গ্রীক ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে। অ্যাথেন্সের অগ্রগতিও যেমন অনিবার্হ মনে হয়েছে, স্পার্টা ও করিন্থের অ্যাথেন্স ভীতিও তেমনি অবশ্যস্বার্থী মনে হয়েছে। ব্যাংকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স-প্রাসীয় যুদ্ধের কল দেখে প্রাসীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে higher necessity উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি থুকিডিডিসও পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ফল দেখে তার পশ্চাতে higher necessity-র ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক কখনই এমন ব্যাখ্যার প্রস্তর দেবেনা। তার কাছে মনে হবে থুকিডিডিসের higher necessity হেরোডোটাসের oracle বা deux ex machina'র উল্টোপিঠ। তার মতে প্রতিটি ব্যক্তির এবং প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনন্ত কারণ তা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রসূত। তাছাড়া মানবচরিত্রই ঐতিহাসিক বিবর্তনের একমাত্র নিয়ন্তা নয়। মানব চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক—মানবচরিত্রও পারিপার্শ্বিক নিরপেক্ষ নয়—উভয়ে মিলে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। দৃশ্যমূলক বস্তুবাদীরা ত' আরো গভীরে যেতে চাইবেন।

থুকিডিডিসের ইতিহাস দর্শন তাঁর বক্তৃতাবলীতে সন্ধিক পরিদৃষ্ট। গ্রীকট্রাজেডির কোরাসের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে। এগুলির মাধ্যমে তিনি আপন বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। “My habit has been to make the speakers say what was in my opinion demanded of them by the various occasions.....”এর কতটা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি এবং কতটা থুকিডিডিসের নিজের ব্যাখ্যা? এর অনেকগুলি বক্তৃতা তাঁর মনগড়া, যেমন স্পার্টায় করিন্থের প্রতিনিধির বক্তৃতা; অনেকগুলি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শেষে লেখা—যেমন অ্যাথেন্সের প্রতি-নিধির বক্তৃতা বা পেরিক্লিসের বিখ্যাত ‘কিউনারেল স্পিচ’। প্রত্যেকটি বক্তৃতার রচনারীতি, তা স্পার্টাবাসী বা অ্যাথেন্সবাসী, পেরিক্লিস বা অ্যালকিবিয়াডিস, বেই দিক না কেন, হুবহু এক, অর্থাৎ থুকিডিডিসের নিজস্ব রীতি। এছাড়া জার্মান পণ্ডিত জেগার তাঁর Paideia গ্রন্থে বলেছেন—This is a very important device, explicable not by a historian's passion for exactitude but by a politician's wish to penetrate to the ultimate political ground for every

event.” এর কোনটিতে অ্যাথেনীয় অগ্রগতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কোনটিতে অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সমর্থন—সব গুলিতে ভবিষ্যৎ-যুগীয়দের কাছে আবদান—ম্যারাথন ও স্টালামিসের যুদ্ধে নেতৃত্ব অ্যাথেনকে সাম্রাজ্য গঠনের নৈতিক অধিকার দিয়েছে। মেলিয়ান বিতর্কে (Melian debate) যদিও তিনি উভয়পক্ষেই যুক্তি উত্থাপন করেছেন তবু তার মধ্যে সে যুগের অ্যাথেন্সের Zeitgeist স্পষ্ট বা বাহ্যিককে natural right এর সমতুল্য মনে করত।

তিনি যে কেবল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন তা নয়। নিরাসক্তির দাবীও তাঁর টেকেনা। তিনি ছিলেন পেরিক্লিস-পন্থী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মেগারা সংক্রান্ত ডিক্রীর কথা তিনি চেপে গিয়েছেন। ক্রিওন সঙ্কে তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়েছেন। নিকিয়াসের প্রতি গোপন পক্ষপাত। পেরিক্লিস জীবিত থাকলে পেলোপনেনসাসের যুদ্ধে অ্যাথেন্সের জয় লাভ ঘটতো এবং সাম্রাজ্যের পতন হ’তনা এমন বিশ্বাস অনুচ্চারিত হলেও স্পষ্ট। পেরিক্লিসের নির্মোহ ভবিষ্যদ্বাণী, সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা ইত্যাদি সঙ্গুণাবলী পরবর্তী কোন অ্যাথেনীয় নেতার ছিলনা এবং তার অভাবই মূলতঃ সাইরাকিউজ অভিযান প্রভৃতি নীতির বৈকল্যের কারণ এমন ইঙ্গিত “পেলোপনিসীয় যুদ্ধে” ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

নিকিয়াসের বক্তৃতায় থুকিডিডিসের আসল প্রতিপাল ধরা পড়ে। একদল অ্যাথেনীয় নেতা মনে করতেন, অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্যের উন্নতি এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে তার বাধাবন্ধহীন বিস্তারের ওপর। সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে যুদ্ধের ভয়েও খেমে যাওয়ার উপায় নেই, থামলেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ও ভয়াবহ শ্রেণীসংঘর্ষের সম্ভাবনা। অ্যালকিবিয়াডিস ছিলেন এই দৃষ্টিসাহসী বিপক্ষনক নীতির প্রতীক। আরেক দল নেতা ছিলেন একেবারে যুদ্ধ-বিরোধী, এমনকি সাম্রাজ্য বিস্তার যদি যুদ্ধের কারণ হয় তবে সাম্রাজ্য বিরোধী। পেরিক্লিস ছিলেন এই দুই চরম পন্থী ধলের মধ্যবর্তী। অর্থের লোভ তাঁকে বশীভূত করেনি, জনগণকে সত্য কথা বলার সাহস তাঁর ছিল। অল্প নেতারা জনগণের প্রসাদভাজন হবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে তাদের যুগের কাছে আপন শুভবুদ্ধি বলি দিয়েছেন। পেরিক্লিস ছিলেন জনগণের কর্ণধার, তাদের তিনি চালাতেন, তাদের দ্বারা চালিত হতেন না। তাঁর আমলে নায়ে গণতন্ত্র হলেও অ্যাথেন্স ছিল

“a monarchy under the foremost man”। অসংযত গণতন্ত্রের দলীয় কলহ ও ভীক স্বার্থপর নেতৃত্ব থেকে থুকিডিডিস মুখ ফিরিয়েছেন সেই অভিজাত শাসিত গণতন্ত্রের প্রতি যা সোলোন একদা প্রবর্তন করেছিলেন, ক্লিস্থেনিস ও থেমিস্টোক্লিস পুষ্ট করেছিলেন এবং পেরিক্লিস উন্নতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেছিলেন। এমন নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাবই অ্যাথেন্সের পতনের কারণ, নাহ’লে সাম্রাজ্যের মধ্যে বা শক্তির সাধনার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন অমঙ্গল বা দুর্বলতা আছে থুকিডিডিস তা মনে করতেন না।

এই পেরিক্লিস-পন্থী-সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কি এবং কেন থুকিডিডিস তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন? এর উত্তর নিহিত আছে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেনীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে তথা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে।

খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর অ্যাথেন্সে একটা বড় অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। লোভ স্বপ্নের আবির্ভাব, মুদ্রাপ্রবর্তন, বর্ণমালার আবিষ্কার ও উপনিবেশ বিস্তার গ্রাম্যকলের জোতদার ও সহর্যাকলের বণিক-শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এই প্রথম সম্ভব হ’ল মুনাফার ভিত্তিতে পাত্র-শিল্প ইত্যাদির দ্রুত উন্নতি। কিন্তু মূলধনের অভাবে শিল্প আশ্রয় করলো দাসত্ব; মুদ্রা যেমন একদিক দিয়ে ছোট জোতদারদের অভিজাত ভূমায়িকারীর কবল থেকে উদ্ধার করল, তেমনি আর এক দিক দিয়ে তাদের মহাজনশ্রেণীর হাতে তুলে দিলে। বাইরের শস্ত আমদানি হওয়ায় তাদের শস্যের দাম কমে গেল, অথচ যে সব শিল্পজাত দ্রব্য তারা ব্যবহার করত তার দাম বাড়তে লাগল। ভূমি বন্ধক রেখে তাদের জোগাড় করতে হ’ল মূলধন বা ঋক্ততার টাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করতে হ’ল। এক শ্রেণীর দ্যুঘী (hectamoroi) জমি হারিয়ে বর্ণাদারে পরিণত হল।

সোলোনের সংস্কার এই নব অভ্যুদিত বণিক ও শিল্পী-শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করলে—ধনের পরিমাণ অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বণ্টন রক্ত সম্বন্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত অলিগার্কির ভিত নড়িয়ে দিলে। কিন্তু সোলোনের সংস্কারের ফলে অধঃপর্ণা দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলেও ভূমিহীনরা ভূমি পেলে না। সোলোন বুঝেছিলেন নাগরিকত্বের মধ্যে সমান ভাগে ভূমি বণ্টন করে দিলেও অ্যাটিকা ঋণশস্ত্রে কোনদিন

আত্মনির্ভর হতে পারবে না। তাকে অল্প উপায়ে ধন বৃদ্ধি করতে হবে। অ্যাথেন্সের কাঁচামাল বা শিল্প উপাদানের অভাব ছিল না—পেটালিকাসের মার্বেল, লরিয়নের রূপো, পাত্র নির্মানের উপযোগী উৎকৃষ্ট মাটি। অভাব ছিল শুধু শিল্পীর, কারিগরের। তাই তিনি সচেতন ভাবে কারু ও শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিলেন এবং তদর্থে বিদেশী কারিগরদের সাদর আহ্বান জানালেন, এজিনার মুদ্রামানের পরিবর্তে গ্রীক জগতের অধিকাংশ বাজারে গ্রহীত ইউরিয় মুদ্রামান চালু করলেন। ফলে যে inflation ঘটল তাতে বণিক-শ্রেণীর সমধিক সুবিধা হ'ল। তাদের মূলধন আগে আসত বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকে, inflation-এর ফলে তারা ধার শোধের সময় প্রচুর লাভ করলে। তাছাড়া দলে দলে ভূমিহীন প্রজা কাজের খোঁজে অ্যাথেন্সে চলে এল এবং অতি অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হ'ল।

সোলোনের অস্থানে এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভে এল বিদেশী বণিক ও শিল্পীরা, এল গ্রামাঞ্চল থেকে ভূমিহীন কৃষক। অ্যাথেন্সের লোকসংখ্যা উভয়ের অভ্যাগনে অতি উচ্চত বেড়ে গেল। খাদ্য সমস্যা ধারণ করল প্রবলাকার। খাদ্য সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বহির্বাণিজ্য প্রসারের প্রয়োজন হল। বহির্বাণিজ্য রক্ষার জন্য বাড়াতে হ'ল সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌ-বল। নৌ-শক্তি বৃদ্ধির ফলে কাঠ, লোহা, ত্রোজ ইত্যাদির চাতিদা বাড়ল। খাদ্য ও এসব জিনিষের দাম দিতে শিল্প সম্প্রসারণ করতে হ'ল। তার মূলধন এল লরিয়নের রৌপ্যখনি থেকে, মুনাফা এল দাস ও ভূমিহীন প্রজার জম-শোষণের থেকে। পিসিস্ট্রেটাসের নীতি এই সম্প্রসারণে সাহায্য করল। তিনি দার্দানেলসের অনেক স্থানে উপনিবেশ বিস্তার করলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলেন।

সোলোন, পিসিস্ট্রেটাস ও ক্লিসথেনিসের আমলে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ক্লিসথেনিসের সংবিধানে সর্বনিম্ন তথা দরিদ্রতম শ্রেণীর কোন স্থান ছিল না। তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিদ্রোহী ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ মানসেই তিনি পারশ্বের শরণাপন্ন হন। থেমিস্টোক্লিস এঁদের মত অভিজাতবংশীয় ছিলেন না। অ্যালেকসান্ডার নিউকমের আশ্রয়তা থেকে তিনি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিচ্যুত করে স্বীয়

প্রতিষ্ঠা স্থাপন করলেন। তাঁর সমসাময়িক মিলটিয়াডিস অভিজাত হয়েও অ্যালকেমেওনিড বংশের প্রতিযোগী ফিলেডে বংশের লোক। পারস্ত-বিরোধী নীতিতে এ দু'য়ের মিল হ'ল। মিলটিয়াডিস যখন পারস্ত অভিযানে বিফল হলেন, অ্যালকেমেওনিড বংশীয় মেগাক্লিস প্রতিশোধের স্বযোগ পেলেন। অধ্যাপক টমসন বলেন—তাঁকে বাঁচাবার জ্ঞা তখন থেমিষ্টোক্লিস বিশেষ কোন চেষ্টা পান নি। তাঁর অশ্রেয় থেমিষ্টোক্লিসই অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পেলেন। অ্যালকেমেওনিড বংশীয় মেগাক্লিস, ক্যানথিপস, অ্যারিষ্টাইডিস পর পর বিতাড়িত হলেন।

থেমিষ্টোক্লিসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অ্যাথেনীয় নৌশক্তির পুনর্গঠন। এর সঙ্গে অ্যাথেন্সের দরিদ্রতম নাগরিকদের (যাদের সমর্থনের ওপর থেমিষ্টোক্লিসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত) ভাগ্য জড়িত ছিল, কারণ তারাই নাবিকের কাজ করত। লরিয়নের হোপ্যাথনির আয় তিনি মোবাহিনী সম্প্রসারণে নিয়োগ করলেন। তাঁরই বীর্য ও চাতুর্যের ফলে স্থালানিস ও মাইকেলে অ্যাথেনীয় নাবিক জেরেকসিসের বিপুল বাহিনীকে পরাভূত করলো। এজিহান সমুদ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য অ্যাথেন্সের করায়ত্ত হোল। থেমিষ্টোক্লিস বুঝতে পেরেছিলেন এ-বিজয়কে বাণিজ্যবিস্তারের কাজে লাগাতে গেলে পারস্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা প্রয়োজন। তা না হ'লে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অ্যাথেন্সের একচেটিয়া ব্যৱসায় স্থাপন হবে না, বুধা অর্থ ও লোকসংখ্যা ঘটতে থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ফিলেডে ও অ্যালকেমেওনিড বংশের মধ্যে একটা বোকাপড়া হয়েছে। অ্যারিষ্টাইডিস ও কাইমন থেমিষ্টোক্লিসের বিরুদ্ধে মিলিত হলেন এবং পারস্তের সঙ্গে বড়যন্ত্রের অপরাধে থেমিষ্টোক্লিসকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন। থেমিষ্টোক্লিসের স্পার্টাবিরোধী ও পারস্ত-মৈত্রীর নীতি বাণিজ্য-বিস্তারের পক্ষে অসুকল ছিল, কারণ পারস্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার আর প্রতিযোগিতা করবার সামর্থ্য ছিল না। এ নীতির বিরোধিতা করে ও স্পার্টার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে পুনরুত্থাখিত অভিজাতশ্রেণী গণতান্ত্রিক অগ্রগতি রোধ করতে চাইল। তাই দেখি ৪৬৪ খৃঃ পূঃ স্পার্টার হেলট-বিক্রোহের সময় অ্যাথেন্সের ৪০০০ সৈন্য স্পার্টার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে দক্ষা করতে চলেছে।

ইতিমধ্যে ডেলসের যুক্তরাষ্ট্রের আড়ালে অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পররাষ্ট্রনীতি মিশরে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে

গিয়ে শোচনীয় ভাবে বিফল হ'ল এবং অনেকটা রক্তস্রব পুনরুৎকার বাসনায় এক্তিরা অবরোধ করে জোর করে তাকে ডেলস রাষ্ট্রসভ্যে যোগদান করতে বাধ্য করলো। পেরিক্লিস যখন গণতন্ত্রকে পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন তিনি এই সর্বনাশা নীতি পরিত্যাগ করলেন এবং থেমিস্টোক্লিসকে অনুসরণ করলেন। ৪৪৮ খৃঃ পূঃ পারস্তের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। পশ্চিমে অ্যাথেন্সের যে তিনটি বাণিজ্য-প্রতিযোগী ছিল—করিন্থ, করকাইরা ও সাইরাকিউস—তাদের সহজেও এই নীতি গৃহীত হ'ল। ৪৪৫ খৃঃ পূঃ করিন্থের সঙ্গে অ্যাথেন্সের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হল।

পেরিক্লিসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে বণিকজ্ঞেয়ী ছিল তার স্বার্থ যে কোনরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন *adventurism* এর প্রতিকূল। ক্রীট থেকে ক্রিমিয়া পর্যন্ত এজিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের ওপর কর্তৃত্ব তাদের প্রয়োজন ছিল এবং অ্যাথেনীয় নৌশক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে তা মিলেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের পূর্ব কি পশ্চিম প্রত্যন্তে কর্তৃত্ব কাম্য হলেও তার জ্ঞাত যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। সে এলাকায় তারা চেয়ে ছিল অবাধ বাণিজ্যাদিকার এবং পেরিক্লিসের নীতি তাই স্থাপন করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্য ও অবাধ বাণিজ্য এই দুই অস্ত্রের প্রয়োগে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড যেমন সীমাহীন সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিস-শাসিত অ্যাথেন্সও তাই স্বপ্ন দেখেছিল। এই শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে অবশিষ্ট আকাক্ষার কারণ মিলবে।

৪৮০ খৃঃ পূঃ থেকে ৪৩১ খৃঃ পূঃ মধ্যে অ্যাথেন্সের পরিবর্তন বৈপ্লবিক। ঐতিহাসিক গমের (Gomme) হিসাবে ৪৮০ খৃঃ পূঃ অ্যাথেন্সের নাগরিক সংখ্যা ছিল ১৪০,০০০। ৪৩১ খৃঃ পূঃ নাগরিক সংখ্যা বেড়ে হয় ১৭২,০০০, মেটিকদের সংখ্যা হ্রাস—২৮,৫০০ এবং দাসের—১১৫,০০০। গার্ণে ইত্যাদির মতে দাসের সংখ্যা ৪০০,০০০ এবং নাগরিকের—১৮০,০০০। গম তা ভুল মনে করেন। খনি অঞ্চল বাদ দিলে মাথাপিছু দাসের সংখ্যা এত বেশী হয়না। তাক্কাড়া গার্ণে রাষ্ট্রনিয়োজিত ক্রীত দাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেননি।*

* A. W. Gomme—The Population of Athens in the fifth and fourth centuries B. C. Oxford 1933.

যাইহোক ৪৮০ খৃঃ পূর্বের ভুলনায় পেলোপনেসীয় বৃদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কি নাগরিক কি দাসের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল শিল্পনানিজ্যের প্রসারের জন্য এবং রোপ্য খনির চাহিদা মেটাতে। অ্যাটিকার অর্ধেক লোকই অ্যাথেন্সের নগর প্রাকারের অভ্যন্তরে বাস করত। এত লোকের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা অ্যাটিকার বহুভূমির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ছোট ছোট জোতে বিতরুত জমি উৎপাদনের উপযোগী ছিলনা এবং মূলধনের অভাব ও তার প্রতিকূল ছিল।

কিন্তু কি দিয়ে এত খাদ্য কেনা হবে? পূর্বেই দেখেছি সোলোন পিসিস্ট্রেটাস গ্রন্থ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা শিল্পের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মূলধনের অভাবে সে উদ্দেশ্য সফল হ'লনা। পেরিক্লিসের সময় অ্যাথেন্সের বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ থেকে ৬০০ ট্যালেন্ট। অ্যাথেন্সের নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় এর চেয়ে বেশী ছিলনা। শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে এ মূলধন নগণ্য। মূলধনের অভাবে বৃহৎভাবে উৎপাদন সম্ভব হ'লনা। ডেনস্থিনিউসের পিতার খাট তৈরীর কারখানায় কুড়িজন দাস কাজ করত, অন্ত্রশাস্ত্রের কারখানায় বত্রিশজন। কেফালসের বর্মের কারখানায় সবচেয়ে বেশী শ্রমিক খাটত—তাও ১২০ জন। এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। অধিকাংশ কারখানায় মালিকসহ চার পাঁচজন কাজ করাত, মালিকের মূলধন প্রায় ছিলনা, যত্নপাতি ছিল স্বল্প। যারা জিনিষপত্র করতে চাইতো তারা কাঁচা মাল নিয়ে আসতো। বিভিন্ন মৃৎপাত্রের অঙ্কিত চিত্র থেকে বোঝা যায় মালিক নিজেই প্রায় সর্বদা শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করত।*

এসব কারখানায় কেবল দাসরাই কাজ করত এমন মনে করা ভুল। অ্যাথেন্সের দরিজ নাগরিকরা অনেক সময় দাসদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বাধ্য হ'ত। সেই প্রতियোগিতায় তাদের মজুরী এতই কম যে যায় যে তাদের পক্ষে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম দাসশ্রম উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ছিলনা, বরং মূল্যের অল্পপাতে ও খাইখরচের দাম ধরলে দাসশ্রম স্বাধীন নাগরিকদের জামের চাইতে কম লাভজনক হ'ত। রোপ্যখনির মালিক ব্যতীত অসংখ্য

দাস-মালিকরা নিজে খাটিয়ে বা ভাড়া খাটিয়ে খুব লাভ রাখতে পারতো না। পরে দাসের দাম কমেতে কমেতে ছুই বা তিন মিনে (mine) হয়ে পড়ায়।^৩ তখন মালিকদের প্রচুর লাভ হতে থাকে। বেলজের মতে দাসপিছু বাৎসরিক লাভ বেড়ে পড়ায় শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ড্রাচমা, কোন কোন ক্ষেত্রে ১২০ ড্রাচমা। যেসব দাস রোপ্য খনিতে খাটত তাদের মালিকরা মুনাফা পেতেন ২০ থেকে ৫০%। বলা বাহুল্য, টাকা ধার দিয়ে ৮ থেকে ১০% সুদ মিলত বলে পুন্ডিপতিরা স্বভাবতঃই দাসে টাকা খাটাতো থাকে। খনি অঞ্চলে লাভের হার অধিক থাকত বলে সেখানেই বহুল পরিমাণে দাস নিয়োগ হতে থাকে। ৪৩১ খৃঃ পূঃ প্রায় ২০,০০০ ক্রীতদাস লরিয়নে খাটছিল।^৪ একা নিকিয়াসের ১০০০ এর বেশী দাস ছিল তাদের ভাড়া খাটিয়ে তিনি মাথাপিছু দিনে এক ওবোল (obol) অর্থাৎ বছরে ১০ ট্যালেন্ট লাভ রাখতেন।

এভাবে যেটুকু মূলধন শিল্পে আসত তাও চলে যেতে থাকে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ে এবং খনি অঞ্চলে। দাসের ভাড়া বেড়ে যাওয়ার ফলে ছোট ছোট শিল্পীরা বিপদে পড়ে। উপরন্তু লরিয়নের খনি থেকে প্রচুর রোপ্য উৎপাদনের ফলে inflation দেখা দিয়ে আরেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। যতদিন অ্যাথেন্সীয় শিল্পের দাম সম্ভা ছিল ততদিন বাইরের বাজারে তার একটা চাহিদা ছিল। inflation-এর ফলে তার দাম বেড়ে গেল এবং বাইরের চাহিদা পড়ে গেল। অ্যাথেন্সীয় শিল্পের-জগতে দেখা দিল দুর্ভোগ, বেকার সমস্যা প্রকটাকার ধারণ করল। বণিক ও জাহাজের মালিকরা এতদিন শিল্পী ও কারিগরদের অঙ্গত। এবং মূলধনের অভাবের সুযোগ নিচ্ছিল। কিন্তু তারা নিজেও খুব স্বচ্ছল ছিলনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বণিক সেই জাহাজের মালিক এবং কাপ্তেন ছিল। অ্যাথেন্সীয় পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় তারাও অনুবিধায় পড়ল। অ্যাথেন্সের প্রতিযোগী রাষ্ট্রেরা সরেক্ষণ নীতির আশ্রয় নিয়ে সে অনুবিধা-
- পারও বাড়াল।

পেরিক্লিস এই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। প্রথমতঃ মূলধনের অভাব যে কোনরূপে পূরণ করতেই হবে, নইলে শিল্পের

৩। হেরোডোটাসের সময় দাসের দাম ছিল ২০০ ড্রাচমা।

৪। Ardaillon—Les Mines du Laurion dans l' antiquité.

সমুদ্র দূর হবেনা। দ্বিতীয়তঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতেই হবে নইলে ব্যবসা-বাণিজ্য টিকবেনা। তৃতীয়তঃ এজিয়ানে ও কৃষ্ণসাগরে কর্তৃত্ব রক্ষা করতেই হবে—নইলে খাচ্চা সম্রাট নিশ্চিন্ত হওয়া যাবেনা এবং চতুর্থতঃ দরিদ্রতম শ্রেণীর জন্য একটা ব্যবস্থা করতেই হবে নইলে সামাজিক বিপ্লব ঠেকানো যাবেনা।

শেষের সমস্যাটি তাঁকে সমধিক চিন্তিত করেছিল কারণ তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর রাজনৈতিক প্রভুত্ব নির্ভর করেছিল দরিদ্রতম নাগরিকদের সমর্থনের ওপর। পূর্বেই বলেছি দাস-প্রতিযোগিতার ফলে তাদের মজুরীর হার অত্যন্ত কমে যায়। এরকমিউম নির্মাণের যে হিসাবপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখি ক্রীতদাস এবং স্বাধীন নাগরিক সবই দৈনিক এক ওবোল ছায়ে পারিশ্রমিক পাচ্ছে। খুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জিনিফতের নাম বেড়ে সোলোনের সময়ের চেয়ে প্রায় দু'তিন গুন হয়েছিল। নাগরিকদের জীবন-যাত্রা নির্বাহের নিয়তম ব্যয় হয়েছিল দুই ওবোল*, অর্থাৎ তাদের মজুরীর দ্বিগুণ। ডাইকাট্‌স বা জুরীদের জন্য দিনপিছু দুই ওবোল করে ভাতার ব্যবস্থা করে পেরিক্লিস এই শ্রেণীর সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান করলেন।^৬ এতেও যখন কুলোল না তখন পেরিক্লিস তাঁর বিরূপ নির্মাণ-সূচী গ্রহণ করলেন। ত্র্যাগোৎ এর মতে ৪৪৭ খুঃ পুঃ থেকে ৫৩১ খুঃ পুঃ এর মধ্যে পার্থিনন ও অফ্রাফ্র স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের অমর নিদর্শন নির্মাণ করতে কমপক্ষে ৮০০০ ট্যালেণ্ট অর্থাৎ ৯,৮০০,০০০ পাউণ্ড লেগেছিল।^৭ ক্যাভেনাক ব্যয়ের পরিমাণ আরো কমালেও ৪০০০ ট্যালেণ্টের কম খরচ নিশ্চয়ই হয়নি। এই নির্মাণ সূচী বেকারদের কর্ম দিল, বিদেশী জিনিষের চাহিদা বাড়িয়ে বণিকদের এবং কট্টাষ্ট জুগিয়ে মধ্যবিত্ত পুঞ্জিপতিদের সুবিধা করে দিল। প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করে পেরিক্লিস বণিকদের আরো সুবিধা করে দিলেন।

এতে নাগরিকরা খুসী হল কিন্তু কোথা থেকে এত অর্থ এল? এখানেই পেরিক্লিসের শেষ জীবনের সাক্ষাৎবাদের চাবিকাঠি। অর্থ এল

৬। Cambridge Ancient History vol. V. p. 22.

৭। পেরিক্লিসের আগে এদের ভাতা ছিল এক ওবোল, ক্রিগন ৫২৫ খুঃ পুঃ তা আরো বাড়িয়ে তিন ওবোল করেন।

৭। Froincolle, Les Finances des cites Grecques.

ডেলসের যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার থেকে এবং পরে তাদের ওপর চাপানো কব্জার থেকে। ডেলসের রাষ্ট্রসভ্যের কাকের জন্ত অ্যাথিষ্টাইডিস যে বার্ষিক টাকা নিরূপণ করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল ৪৬০ ট্যালেন্ট। ৪৫৪—৫৩ খৃঃ পূঃ নিরাপত্তার অজুহাতে যখন তা অ্যাথেন্সে নিয়ে আসা হ'ল তখন টাকা জমে জমে প্রায় ৩০০০ ট্যালেন্ট হয়েছে। তার পর দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণের জন্ত প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্রের ওপর দেয় টাকার এক ষষ্টিতম অংশ কর নির্ধারিত হল। ৪৪৮খৃঃ পূঃ পারস্যের সঙ্গে সন্ধি হওয়া সম্বন্ধে টাকার হার বজায় রাখা হ'ল। ৪৪৩খৃঃ পূঃ অশাস্ত্র নায়কগণ যখন পেরিক্লিসের নীতির বিরোধিতা করলেন তখন তাদের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হ'ল। একচ্ছত্র পেরিক্লিস অ্যাথেন্সের রাষ্ট্রীয় কোষাগার, অ্যাথেনা দেবীর কোষাগার এবং সম্রাজ্যের কোষাগার একীভূত করার চক্রম দিলেন। সে অর্থ প্রথম প্রযুক্ত হ'ল স্তামল ও বাইজানটিয়ামের বিজ্রোহ দমনে। লরিয়নের রোপা, সাম্রাজ্যের কর এবং বিরাট রাষ্ট্র পরিচালিত নির্মাণ নৃতী যে inflationary spiral নৃতী করল তাতে ঐ অর্থ নিঃশেষ হতে বেশী দেরী লাগল না। থুকিডিডিসের মতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সব কোষাগার মিলিয়ে নৃত্যাধিক প্রায় ৬০০০ ট্যালেন্ট পড়েছিল।

পূর্ভাগ্যবশতঃ পেলোপনেশীয় যুদ্ধের মত দীর্ঘ ও ব্যাপক যুদ্ধের ব্যয়ের তুলনায় তা অতি নগণ্য। যদি স্থল ও নৌবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যের বেতন ধরা যায় দৈনিক ১ ড্রাচমা তাহলে ১৫৮০০ স্থলসৈন্যের মাত্র ছ'মাসের খরচ লাগে—৪৭৫ ট্যালেন্ট ৫০০ যুদ্ধ জাহাজের (প্রত্যেক জাহাজে ১৮৮ জন নাবিক ও অফিসার ধরে সর্বসাকুল্যে ৫৬,০০০) খরচ লাগে ১৬৮০ ট্যালেন্ট—মোট ২১৫৪ ট্যালেন্ট। বস্তুতঃ একমাত্র পটিডিয়ার যুদ্ধেই থুকিডিডিসের মতে ২০০০ ট্যালেন্ট ব্যয়িত হয়েছিল। শুধু এ হিসাবের কথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না—কেন অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্য দিন দিন আরও অভ্যাচারী হয়ে ওঠে এবং কেন তার পতন অনিবার্য।

শুভরাং পেরিক্লিসের নেতৃত্বে অ্যাথেন্স সম্মিলিত গ্রীসের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে বিজয়ী হ'ত এমন ধারণার প্রভাব দিয়ে থুকিডিডিস মহাভুল করেছিলেন। নিকিয়াস বা ক্লিওন বা অ্যালকিবিয়াডিসের নেতৃত্বে তা আরো অসম্ভব ছিল। পেরিক্লিস নিশ্চয়ই শাস্তির পথ বেছে নিতেন

কিন্তু তার মূল্য স্বরূপ সাম্রাজ্য ত্যাগ সম্ভব ছিল কি? অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের সাফল্যই নির্ভর করছিল সাম্রাজ্যের ওপর। সাম্রাজ্য শোষণ ও দাসত্বম শোষণের ফলে সম্ভব হয়েছিল দরিদ্রতম নাগরিককে সমৃদ্ধ রেখেও বিরাট সভ্যতার সৌধ রচনা। তিনি যে অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও বামপন্থী মাৎস্তস্ত্রায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন তার কারণ দাসব্যতীত সম্ভ্রান্ত সকল শ্রেণীই তাঁর আমলে মোটামুটি খুশী ছিল। সাম্রাজ্যের অর্থ নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করে লরিয়নের মালিককে যথেষ্ট দাস শোষণ করতে দিয়ে এ নীতি সকল হয়েছিল, থুকিডিডিস বা নিকিয়াসের অর্থ দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করে নয়। সাম্রাজ্য ছিল বলে করকাইরার মত শ্রেণী সংঘর্ষ অ্যাথেনে বাধেনি কিন্তু তার দাম দিয়েছে অ্যাথেনের নাগরিক, এজিনার বণিক ও লরিয়নের ক্রীতদাস। এই সাম্রাজ্যবাদই সংঘম হারিয়েছে অ্যালকি-বিয়াডিসের হাতে। শ্রেণী সাম্য নষ্ট হয়েছে ক্লিওনের হাতে। মনে রাখতে হবে থুকিডিডিস ছিলেন থেসসজবংশাবতঃস, থেসের বহু রৌপ্য খনির মালিক। তাঁর শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ একান্তভাবে জড়িত ছিল সাম্রাজ্য রক্ষা ও শ্রেণীসাম্য রক্ষার সঙ্গে। এর কোনটি বিপন্ন হলে তাঁর সমূহ ক্ষতি। তাই আশ্চর্য্য নয় যে তিনি পেরিক্লিসের মধ্যপন্থা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অ্যাথেনীয় ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ চক্ষ্য করেছেন এবং তার বিচ্যুতিতে দেখেছেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধে পরাজয় ও সাম্রাজ্যের পতনের অবশ্যস্বাবী কারণ।

জাতীয় আন্দোলন অগ্নিযুগের ভূমিকা

শ্রীমতী সেনগুপ্ত

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে অধ্যায়টি অগ্নিযুগ নামে পরিচিত, নানা কারণে সে সহক্ষে সাধারণের ধারণা আজকের দিনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সে যুগের বিপ্লব আন্দোলন গুপ্ত থাকায় এবং এষ্ট আন্দোলনে লিপ্ত নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় কোন সংহতি না থাকার জন্ত এর যথার্থ রূপ এবং কার্যপদ্ধতি সাধারণ লোক কোনদিনই জানতে পারে নি। বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তদন্তের জন্ত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাউলাট কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, তা মোটামুটি প্রামাণ্য বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এই যুগের অনেক নেতার মতে এই রিপোর্ট যে শুধু অসম্পূর্ণ তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভুল এবং বিভ্রান্তকারী। অগ্নিযুগ সহক্ষে যে সব পরস্পর বিরোধী এবং অনৈতিহাসিক মতামত শোনা যায় তার জন্ত প্রধানতঃ এই ধরনের পরিস্থিতিই দায়ী। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ পর্যন্ত যে বিপ্লব আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত অগ্নিযুগই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। সত্যিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে অগ্নিযুগকে বিচার করার যথেষ্ট অবকাশ তাই আজও আছে।

অগ্নিযুগের সঠিক সীমারেখা নিয়ে যথেষ্ট মতবৈধ আছে। তার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এর আরম্ভ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর যখন জাতীয় আন্দোলন মহাস্বা গান্ধীর নেতৃত্বে এক নতুন খাতে প্রবাহিত হল তখন এর সমাপ্তি। সংক্ষেপে বলা চলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্নিযুগ নামে পরিচিত। অবশ্য এই যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, সমস্ত বিপ্লব-বাদ সম্ভবতঃ কিছু আগেই শুরু হয়েছিল। অনেকের মতে গত শতাব্দীর

শেষে শ্রম-দমনের অজুহাতে খেতাজ কর্মচারীদের ভারতীয়-দলনের বিরুদ্ধে শৃণায় চাপেকার ভাড়াবয়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয় তাই অগ্নিযুগের প্রথম প্রকাশ। অপর পক্ষে ভারতীয় সমস্ত বিপ্লব আন্দোলন ১৯১৯-২০ সালের পরেও বহুদিন পূরোদমে বিভ্রান ছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ১৯০৫ এবং ১৯১০-২০ সালের মধ্যেই এই বিপ্লব-বাদ চরমরূপ ধারণ করে। বিপ্লব-বাদই অবশ্য এই যুগের একমাত্র কথা নয়। জাতীয় আন্দোলনের অস্বাভাবিক পর্যায়ের সংগে তুলনা করলে এই যুগের অস্বাভাবিক কয়েকটি বিশেষত্বও সহজে চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে অগ্নিযুগের একটি নিজস্ব চেহারা আছে, যা একে জাতীয় আন্দোলনের অন্য যুগগুলি থেকে পৃথক করে রেখেছে। সেই চেহারাটাকে সৃষ্টিয়ে তোলাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এর আলোচ্য বিষয় শুধু সমস্ত বিপ্লব আন্দোলন নয়— সামগ্রিকভাবে সে যুগটা।

সারা দেশের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ব্রিটিশ-রাজ যখন বাংলা-দেশকে দুইভাগ করল তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে সারা ভারতের বিপ্লবীমানস এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে জাতীয় অসন্তোষ ধূনায়িত হয়ে উঠেছিল এবং যার ফলে সমস্ত বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা টিউম প্রমুখ ব্রিটিশ রাজপুরুষদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল * কংগ্রেসের সৃষ্টির ফলে কিছুটা প্রশমিত হলেও ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের ফলে এবার তা রূপ নিল সমস্ত বিপ্লব-বাদের মধ্যে। প্রত্যক্ষ কারণ আপাতদৃষ্টিতে শুধু বাংলার ব্যাপার হলেও এই আন্দোলন ক্রমশঃ অজবিস্তর সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে এর প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বর্তমান উত্তর প্রদেশ। কিন্তু বংগভঙ্গই সমস্ত বিপ্লব আন্দোলনের কারণ একথা মনে করা ভুল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিশ্চল হওয়ার পর বিপ্লব-বাদ নিঃশেষ হয় নি। অস্ত্র-সলিলা কল্লধারার মতো ভারতের মানসিক চেতনার মধ্যে প্রবাহিত ছিল। নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতি আপাত-বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। লর্ড ডাফরিনের গৃহপোষকতায় ১৮৫৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি অনেকটা সমস্ত

* Lyall-Life & Lord Dufferin, Wedderburn—A. O. Hume. Father of Indian National Congress.

বিপ্লবের আশঙ্কারই ফল—উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় চেতনাকে বিপ্লব-বাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা বারবার এই ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয় তাদের প্রকৃত কায়ম রাখার জন্য কিন্তু কখনও সাফল্যলাভ করে না বেশীদিনের জন্য। ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম এক্ষেত্রেও হয় নি। অল্পকিছুদিনের জন্য অবদমিত হলেও ভারতের বিপ্লবীমানস ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসকের ‘চ্যালেঞ্জ’ গ্রহণ করল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের ইতিহাস এই ‘চ্যালেঞ্জেরই’ উত্তর। অগ্নিযুগ তাই কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, পূর্বকার বিপ্লব আন্দোলনের ধারার সংগে অবিলম্বে যোগসূত্রে বাঁধা।

অগ্নিযুগ সম্পর্কে যে কোন আলোচনায় প্রথম স্থান তাই এযুগের সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের। ১৯০৫ সালের কিছু আগে থেকেই বাংলায় কিছু কিছু গুপ্ত আন্দোলন গড়ে ওঠার চিহ্ন পাওয়া যায়। বিপ্লব আন্দোলন সাধারণতঃ কোন দেশেই বিরাট মল্লরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি। এদেশেও বিপ্লব-বাদের ধারক সমিতিগুলি প্রায় সবই ছিল গুপ্ত এবং সীমাবদ্ধ। সর্বভারতীয় সংগঠন দাবী করতে পারত একমাত্র অম্মশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বিপ্লব আন্দোলন অনেকটা একসূত্রে বাঁধা ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের সংগে এইসব অঞ্চলের বিপ্লবীদের সবসময়ই ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। উত্তরভারতে বিপ্লব-বাদ প্রচারের জন্য বাংলা থেকে রাসবিহারী বসু প্রেরিত হন এবং শচীন সাত্তাল, আমীর চাঁদ, আবোধবিহারী, দামোদর স্বরূপ এবং পিঙ্গলে প্রকৃতির সহযোগে সারা উত্তরভারতবাসী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পাঞ্জাবে বিপ্লব আন্দোলনের নেতা ছিলেন সর্দার অজিত সিং, আমীর চাঁদ, সুকী অম্বাপ্রসাদ ও হরিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সুপ্রসিদ্ধ ‘গদর পার্টির’ কিছু সদস্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাঞ্জাবের বিপ্লব আন্দোলন সতেজ করে তোলেন। মহারাষ্ট্র বিপ্লব-বাদের প্রসার প্রায় বাংলার সংগে সংগেই হয়। বীর সাতারকর প্রতিষ্ঠিত ‘অভিনব ভারত’ নামক সমিতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিযুগের সমস্ত বিপ্লব আন্দোলনের নানা দিকগুলি এখন আলোচনা করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের প্রথম বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ে তাকে সম্মানবাদ নামে অভিহিত করা যায়। যদিও ব্রিটিশ-শাসকদের প্রচারে

সাধারণ লোক সমস্ত আন্দোলনটিকেই সন্ত্রাসবাদ নামে জানে, সন্ত্রাসবাদটো আন্দোলনের সব নয়, একটিনাত্র দিক। নানা ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাধ্যো ত্রিটীশ রাজপুরুষ এবং ত্রিটীশ সমর্থক ভারতীয় মহলকে বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি মন্থকে সচেতন করে তোলা এবং দেশের চতুর্দিকে সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা ত্রিটীশ শাসনের ভিত্তি দুর্বল করে তোলাই ছিল সন্ত্রাসবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। অগ্নিযুগের গোড়ার দিকে ১৯০৭ সালে নারায়ণগড়ে বাংলার হেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নরের দ্বৈন বিক্ষোভের সাধ্যো উড়িয়ে দেওয়া, ১৯১১ সালে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমামিক্ষেপ প্রকৃতিকে সন্ত্রাসবাদের উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। এধরণের আপাতবিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে কোন সুস্থর প্রসারী উদ্দেশ্য দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় একটা চমক লাগানোর মনোভূতি।

তদানীন্তন যুগের লোক যাকে স্বদেশী বা রাজনৈতিক ডাকাতি বলে জানত তাকেই আমরা বলতে পারি অগ্নিযুগের বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অনেক সময় একই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদ এবং স্বদেশী ডাকাতির পর্যায়ে ফেলা যেত। তবে এরা যে বিপ্লব-আন্দোলনের দুটি বিভিন্ন দিক একথা অনস্বীকার্য। স্বদেশী ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব আন্দোলনের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ। সে যুগের অনেক ধনবানলোকের সহায়ভূতি অর্জন করা সবেও আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজনও বেড়েই চলেছিল। অমূল্যলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার সি. মিত্র এবং অন্ততম নেতা পুলিনবিহারী দাস সমিতির ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেদের সবার এমন কি পারিবারিক অলঙ্কারও বিসর্জন দেন। এত করে যখন অর্থের অভাব মেটে নি তখন স্বদেশী ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। অনেক সময়ে অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যেও এ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ ১৯১৫ সালে কলিকাতায় অস্ত্রশস্ত্র বিক্রেতা রডাকোম্পানীতে ডাকাতির কথা বলা চলে। নদী-নালা-বহুল পূর্ববঙ্গেই অবশ্য স্বদেশী ডাকাতি সর্বাধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। “এতে সরকারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত হল বটে, কিন্তু খুন ডাকাতির

জঙ্গ হৃৎসবরণ, বীরব, সাহসিকতা, কীর্ষী, জেল সবটাতে মিলে একটি রোমান্টিক আকর্ষণের সৃষ্টি করল যুবক মহলে। এতে কর্মীও যাচাই চরে যেত। যাদের মন দুর্বল—ভীর্ণতা আছে অন্ধরে—তারা ছুতানাতা ধরে সরে পড়ত।”

বিপ্লব আন্দোলন তথা অগ্নিযুগের আরও একটি বৈশিষ্ট্য যুবসংগঠন। বাংলা, পাকিস্তান, মহারাষ্ট্র সর্বত্রই গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য যুবক সমিতি। আসলে এরা সবই ছিল বিপ্লবী দলের শাখা প্রশাখা। কিন্তু বাইরে রূপ ছিল ব্যায়ামচর্চা এবং অছাশ্রু আপাত নির্দোষ সংগঠনী কার্যকলাপ পরিচালনা করার প্রতীকানের। এধরনের সমিতি ছাত্র ছোটো উদ্দেশ্যে সমিতি হত। প্রথমতঃ এর মধ্য দিয়ে বিপ্লব আন্দোলন পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি থেকে নিজের রূপ অনেকখানি প্রচ্ছন্ন রাখতে পারত। দ্বিতীয়তঃ সত্যিকার বিপ্লবের কাজে যখন নতুন কর্মীর প্রয়োজন হত তখন সাধারণতঃ তা সংগৃহীত হত এধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে। লাঠিখেলা, অসিচালনা, কৃত্রিম যুদ্ধ, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৃতি কর্মধারার মধ্য দিয়ে এইসব সমিতি সবলময়ই একদল তরুণ ও স্নদক্ষ কর্মী রাখত যারা সময়মত নিজেদের হাতে বিপ্লব-বর্তিকা ঢুলে নিতে পারত। অবশ্য পুলিশের চোখে নিজেদের আসলরূপ ঢেকে রাখতে বেশীদিন সক্ষম হয়নি এরা।

অগ্নিযুগ সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় ভারতের বাইরে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা একরকম অপরিহার্য। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দোলন চরমরূপ ধারণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর। পৃথিবীময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রকৃত্ত অর্জনের উদ্দেশ্যে জার্মানীর প্রচণ্ড সামরিক শক্তি যখন গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন ভারতীয় বিপ্লবীরা আশার রেখা দেখলেন। জার্মানীর সাহায্যে ভারতে বিপ্লব আন্দোলন সফল করবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠল এবং এর অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা বার্লিনের ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি (Indian Independence Committee) নামক বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন। কোন কোন মহল থেকে এভাবে জার্মান সাহায্য গ্রহণের নিন্দা করা হয়েছে

নীতির লোহাই দিয়ে। ‘বাংলায় বিপ্লববাদ’ পুস্তকে নলিনীকিশোর গুহ বলেন “জার্মানীর সাহায্যগ্রহণ ব্যাপারে সকল বিপ্লববাদী সায় দেয় নাই।” কিন্তু দেশের বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই মতের কিছু সত্যতা স্বীকার করে নিলেও ভারতের বাইরের বিপ্লবীগণ সবাই যে জার্মানীর সাহচর্যে ব্রিটিশ-সিংহকে বিতাড়নের আশা পোষণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তু এধরণের উপায়ের আশ্রয় নেওয়াতে কোন আপত্তি ওঠা উচিত নয়। ইতিহাসে এই ধরণের নজিরও প্রচুর। যুগান্তকারী রুশ বিপ্লবের সময়ও জার্মান সাহায্যের সুযোগ গ্রহণের দৃষ্টান্ত আছে। বালিনের ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতির প্রথমদিকের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল নানা ভাষায় লিখিত পুস্তিকা, ম্যানিকেট্টো প্রভৃতির সাহায্যে ইউরোপ ওখা সারা বিশ্বের স্বাধীন জনসমাজের নিকট ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার মধ্যে। ১৯১৫ সালের মাকামাখি সময় থেকে সমিতি যথার্থ বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ করে। ইউরোপে ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব-বাদ প্রচার শুরু হয়, যদিও সামগ্রিকভাবে এ প্রচেষ্টা বিফল হয়েছিল। সমিতির আহ্বানে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অনেক যুবক ও ছাত্র নানাদেশ থেকে বালিনে সমবেত হয়। অনেককে সমিতির অর্থ সাহায্যে গোপনে ভারতে পাঠান হয় দেশের বিপ্লবী সমিতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করার জন্তু। প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার ‘গদর পার্টি’ এবং এর প্রধান নেতা রামচন্দ্রের সম্বলিতভাবে কাজ আরম্ভ করায় বিপ্লবীদের লোকবল অনেক বেড়ে যায়। গদর পার্টির প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই দলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এবং বিশেষ করে শিখদের সংখ্যাধিক্য।

বালিন সমিতির অন্ততম প্রধান কাজ ছিল জার্মান সাহায্যের সাহায্যে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ, প্রধানতঃ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যান্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারলাভ করে। চীনের সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সান-ইয়াং-সেন এবং জাপানের নেতা কাউট্-ওকুসা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ সহায়ত্ব হৃদয় প্রাচ্যের ভারতীয় বিপ্লবীগণ লাভ করেছিলেন। এই সময়কার একটি বিপ্লব পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। এতে চীন, থাইল্যান্ড এবং আফগানিস্তান থেকে স্থলপথে যুগপৎ ভারত

আক্রমণ এবং তিনখানি অস্ত্র-জাহাজের সাহায্যে পাঞ্জাব এবং বাংলায় বিপ্লব শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিঙ্গাপুরে শিখ বিদ্রোহ। মহাদুতের প্রায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ভারতের দ্বারদ্বার মধ্যপ্রাচ্যেও প্রসারিত হয়। নিখিল ইসলামের খলিফা তুর্কীর সুলতান ত্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ত্রিটিশ পক্ষে সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমান সিপাইসম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও তুর্কী এবং ইরানের বিপ্লবীদের সাহায্য লাভ করার ফলে এদের কাজের অনেক সুবিধা হয়ে যায়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী দল ‘নবীন তুর্কী’র নেতা এন্ডার পাশাও ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় বিপ্লব-আন্দোলনের প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯১৫-১৬ সালের ভারতীয় জার্মান মিশন (Indo-German Mission)। বাল্ভিন কমিটি এবং জার্মান প্রধান মন্ত্রী বেথম্যান হোলভেগের উদ্যোগে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অধ্যাপক বরকতুল্লা এবং জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ হেনটীগ্ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত এই মিশন তুরস্ক ও ইরানের মধ্য দিয়ে আফগানিস্থানে উপনীত হয় এবং আমীর হবিবুল্লাকে তুর্ক-জার্মান পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করার চেষ্টা করে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এই সময় ভারতের বিভিন্ন দেশীয় মূপতি এবং নেপালের মহারাজাকে বিপ্লবীদের দলে আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতে ত্রিটিশ শাসন কায়ম রাখার জগুই যে জ্ঞানীর সৃষ্টি, সে জ্ঞানী খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আবেদনে কর্ণপাত করে নি। আমীর হবিবুল্লাও মিশনকে সাপরে গ্রহণ করা সম্বন্ধে নিজের সামরিক শক্তি এবং ভারতে বিপ্লব আরোজনের স্বল্পতার দোহাই দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে রাজী হন নি। অগ্নিযুগের অনেক বিপ্লবী নেতার মতে ১৯১৫-১৬ সালের ত্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকটসময়ে যদি আমীর ভারত আক্রমণ করতেন তা হলে সমগ্র উত্তর ভারতে অনতিবিলম্বে প্রচণ্ড বিপ্লব আরম্ভ হত যার পরিণামে ত্রিটিশের ভারত ত্যাগ খুব অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। এই মত কতদূর যথার্থ তার বিচার করা আজকের দিনেও সম্ভব নয়।

বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্তুতম নেতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেরও নিম্নলিখিত উক্তি মনে রাখবার মত। “এই অজ্ঞাত নগণ্য বিদেশস্থ বৈপ্লবিক

যুবকদের কার্যের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। এ-দেশের লোক যখন লণ্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের ঘারে দ্বারবানের বা কেরানীর নিকট থাকা খাওয়াকে বা তথ্য আবেদন ও নিবেদনের মালা লইয়া অস্থানীয় বিনয় করাকে ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত মান করিতেন, তখন এই নগণ্য যুবকেরা জাতীয় সম্মুখে দেখাইয়াছিল যে ভারতীয়েরা অছাত্ত গভর্ণমেন্টের কাছে সমানভাবে আদৃত হইতে পারে, ভারতীয় রাজনীতিকারেরা অছা পরাক্রান্ত গভর্ণমেন্টের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। যখন দেশের নেতারা কৃপমণ্ডকের দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিকে কংগ্রেসের গঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই সময় এই অছাত্তকুলশীল যুবকেরা ভারতীয় রাজনীতিকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ভাষায় ভারতের বৈদেশিক স্বতন্ত্রীতি স্থাপনের অগ্রদূত। ভবিষ্যৎ এই কার্যের ফলাফল বিচার করিবে।” কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকা সত্ত্বেও এই মতের মূলে অনেকখানি সত্যতা আছে।

নিছক সশস্ত্র বিপ্লব-বাদের আলোচনা বাদ দিয়া অগ্নিযুগের অছাত্ত দিক, সর্বোপরি চিন্তা-জগতের প্রতি তাকালেও এর স্বকীয় সহজেই চোখে পড়ে। এ যুগের নানা ধরনের কর্মধারা সবই একদিক থেকে এক বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এককথায় এই চিন্তা-ধারাকে বলা চলে স্বদেশী। স্বদেশী মনোভাবের উৎপত্তি হয়েছিল প্রথমতঃ তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ থেকে এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সংস্কৃতি এবং আগের অহুষ্ঠানাদির প্রতি মনোজ্ঞাত অনুরাগ ও আস্থা থেকে। স্বদেশী মনোভাব অল্পবিস্তর সারা ভারতেই দেখা দিয়েছিল, তবে বাংলাদেশেই বর্তমান ছিল এর চরমরূপ। তার কারণ-এর প্রত্যক্ষ কারণ বঙ্গভঙ্গ কংগ্রেস-কর্তৃক জাতীয় ছবিপাক বলে ঘোষিত হলেও মূলতঃ ছিল বাংলারই সমস্যা। স্বদেশী আন্দোলন প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে বঙ্গভঙ্গের সারা দেশজোড়া প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, অর্থাৎ যেদিন সরকারীভাবে বঙ্গবিভাগ চালু হল, সমস্ত বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। কলিকাতা মহানগরীর অনেক অধিবাসী উপবাস করে এবং খালিপায়ে হেঁটে এই জাতীয় শোকের দিন উদ্‌যাপন করেন। জাতীয় ঐক্যের প্রতীকরূপে রাখীবন্ধন অহুষ্ঠানের প্রবর্তন হয় এইদিন প্রধানতঃ

শুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উত্তোগে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই দিনের হরতালকে বলা যায় ভবিষ্যৎ জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ এবং অনেক অরণীয় দিনের পূর্বাভাস। ক্রমশঃ স্বদেশী মনোভাব রূপ নেয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজীভাষা তথা ইংরেজ-সম্পর্ক হচ্ছে কেন্দ্রে জাতীয় ভাবধারা এবং চালচলন পুনঃপ্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী বাংলা তথা বিপ্লবী ভারতের মানস চেতনা গূর্ত করে তুললেন। স্বদেশী মনোভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায় মুকুন্দদাস প্রবর্তিত স্বদেশী যাত্রায়। এই যাত্রার মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনের নানা নীতিবোধ ও সংস্কারের মহিমা এবং বিদেশী আচার ব্যবহার তথা সমস্ত শাসক সমাজের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ সারা দেশে প্রচার করা হয়। সে যুগের সংবাদপত্রগুলিও স্বদেশী মনোভাবের জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল। অগ্নিযুগ মানসের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এই স্বদেশী মনোভাব। এ যুগের সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই মধ্য দিয়েই এই চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অগ্নিযুগের প্রাণময় 'বন্দে মাতরম্' এই মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। স্বদেশী মনোভাবের সংগে নিকটসম্পর্কে আবদ্ধ এবং একদিক থেকে এরই বহিঃপ্রকাশ এই ধরণের আরও তিনটি বিষয়ের আলোচনা না করলে অগ্নি-যুগের যথার্থ রূপায়ণ অসম্পূর্ণ থাকে—অর্থনৈতিক বয়কট, হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান এবং জাতীয় শিক্ষা।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র প্রযুক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বয়কটই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী। আধুনিক ইতিহাসে কমবেশী সাক্ষ্যের সঙ্গে এই অস্ত্র প্রয়োগের আরও অন্ততঃ তিনটি উদাহরণ দেওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে এবং তার পরেও ব্রিটেনাগত পণ্য, প্রধানতঃ চা বর্জনের কথা অনেকেরই জানা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ বিপ্লবীগণও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে প্রয়াসী হন। তৃতীয়তঃ, অগ্নিযুগের প্রায় সমসাময়িক কালে, ১৯০৫ সালের মে মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতশীল বাগিদারীভিত্তি প্রতিবাদে চীনদেশে আমেরিকান পণ্য বর্জনের ক্ষমতা এক প্রচণ্ড আন্দোলন হয়। ওমেলির মতে অগ্নিযুগের বয়কট আন্দোলন এইসব ঐতিহাসিক

নজিরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ বিদেশীপণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বণিক স্বার্থকে আঘাত করা এবং দ্বিতীয়তঃ দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন। গোড়ার দিকে বিপ্লবীদের ধারণা ছিল এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শিল্পপতি সমাজ তাদের সরকারের নীতির বিরুদ্ধবাদী হবে এবং তাদের চাপে পড়ে সরকার বঙ্গবিভাগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সনাম-বস্ত্র নেতা দাদাভাই নোরজী এবং প্রধানতঃ চরমপন্থীদের উল্লেখ্যে বয়কট এবং দেশীয় শিল্পের প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বয়কট আন্দোলনের সাক্ষরতার জন্য প্রধানতঃ প্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। গ্রামে, নগরে, হাটেবাড়ারে সর্বত্রই স্বেচ্ছাসেবকের দল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে বিদেশী পণ্য বেচাকেনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পরবর্তীকালের গান্ধীজীর সত্যাত্মক আন্দোলনের কয়েকটা দিক, মারক ত্রব্য বর্জন প্রভৃতি, আমাদের অগ্রযুগের বয়কট আন্দোলনের কণা স্মরণ করিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভীতি-প্রদর্শন বা অজ্ঞানতা-সাম্রাজ্যিক কার্যকলাপ যে না হয়েছিল তা নয়। তবে ব্রিটিশ লেখকেরা প্রধানতঃ এটুকু লিখেই বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু সাময়িক উদ্বাদনার বশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জিত হলেও বয়কট আন্দোলনের সাক্ষরতা চিরস্থায়ী হয় নি। কারণ শাসক শক্তির সক্রিয় প্রতিবন্ধিতা এবং দেশীয় মূলধনের বহুতার ফলে আন্দোলনের অপর দিক, অর্থাৎ স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন কখনও খুব বেশী সফল হয়ে উঠতে পারে নি। বয়কট আন্দোলনের অগ্রতম প্রধান ফল অবশ্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিকাশ। কয়েক দশক পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা বেড়ে যায় এবং এদেশের তুলার বাজার হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে উঠে। এই সময় থেকেই কার্যতঃ এদেশের বস্ত্রশিল্পের আরম্ভ। বয়কট আন্দোলন ছিল এই শিল্পের সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগের সদ্যবহার করে এই শিল্প নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলে এবং অধঃশতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় বস্ত্র শুধু নিজের দেশে নয়, এশিয়া মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অংশে নিজের আধীনতা কায়েম করে নেয়। কিন্তু স্বল্পপুঞ্জির ছোট ছোট শিল্পের পক্ষে বৈশীদিন বিদেশী পণ্যের সংক্ষেপ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অনেক ধরনের শিল্পের সূচনাই ভারতে হয় নি। তাই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্বাদনা যখন নিঃশেষ হয়ে

এল, বিদেশী পণ্য আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আন্দোলনকারীদের অত্যধিক উৎসাহের ফলে সাধারণের কোন কোন অংশ আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠল। বিশ শতকের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন বিদেশী পণ্য বর্জনের আর একটি ঢেউ উঠেছিল তখন তার বিরুদ্ধে আপত্তি এসেছিল প্রধানতঃ এই সব মহল থেকেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও বয়কট আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। বরং তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকেরা এক সময় আন্দোলনকে সশস্ত্র বিপ্লব-বাদ অপেক্ষাও ভয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। অগ্নিযুগের যতটুকু সাফল্য তার মূলে বয়কট আন্দোলনের অবদান অনেকখানি।

ধর্মজগতেও অগ্নিযুগের নিজস্ব ধারাগুলি সৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মনেতার নানা সংস্কারমূলক কর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হয়েছিল তা উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে অগ্নিযুগে। এই যুগের বিপ্লব আন্দোলন তথা সমস্ত কর্মধারার সঙ্গে অত্যন্ত সম্পর্কে আবদ্ধ এই ধর্মের অভ্যুত্থানের ধারা। স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ও উদ্দীপনাময়ী লেখনী ও বাণীর প্রভাব সে যুগের শিক্ষিত সমাজে এতই প্রবল ছিল যে এক সময় তাঁর কিছু প্রবন্ধ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। অগ্নিযুগের সব ধর্ম-বিদ্বেষের একটা মূল স্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন নয় :— পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ অপেক্ষা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ঐশ্বর্য্য ঘোষণা। এই ধর্মবিদ্বেষ থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে আর একটি ধারণার উৎপত্তি হল যে বস্তুবাদী ব্রিটিশের নিকট অমৃতের পুত্র ভারতীয়দের পরাধীনতা স্বীকার করা অর্থে নিজেদের ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা। অগ্নিযুগের সব কিছুর মধ্যেই এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার সক্রিয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত নেতা শ্রীঅরবিন্দ বোস, ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায় এবং লোকমাত্র তিলক প্রভৃতির জীবনে রাজনীতি ও ধর্ম একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন লেখক এই ধর্ম আন্দোলনকে ‘রিভাইভ্যান্সিট’ বা অভ্যুত্থানবাদী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরও কয়েকজনের লেখার মধ্যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গঠন করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্থধর্মের ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন করা। স্তবরাং পুরোপুরি

অস্বাভাববাদী বললে সম্ভবতঃ অগ্নিস্থগের ধর্ম আন্দোলনের মতার্থ বিচার করা হয় না।

বৈদেশী আন্দোলনের সব কিছুর মধ্যে ধর্মের আবেদন দেওয়ায় আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য সহজসাধ্য হয়েছিল। কারণ একথা ঠিক যে সাধারণ জনসমাজ ধর্মের নামে যতটা উত্তেজিত হয় ততটা আর কিছুতে নয়। তাই বিপ্লবীদের আরাধ্যা দেবী কালীর নামে বিদেশী বজ্রবর্জনের আবেদন ও সপথ গ্রহণের ফলে দেশে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল। মহারাষ্ট্রে তিলকপ্রবর্তিত গণেশ-পূজা এবং শিবাজী উৎসবও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোবৃত্তি এবং জাতীয়তাবাদ প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের দিকে তাকালে একথা অস্বীকার করা যায় না যে আন্দোলনের সংগে ধর্মের যোগাযোগ এর সাফল্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। প্রথমতঃ যে মুহূর্তে একত্রীকৃত চরমপন্থী নেতা সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং আর্থধর্মের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব এই দুই ভিত্তির উপর জাতীয় আন্দোলনকে স্থাপন করার চেষ্টা করলেন সেই মুহূর্তে জাতীয় আন্দোলন তার প্রগতিশীল রূপ অনেকখানি হারিয়ে ফেলল। আর, পি, দত্তের মতে এট যুগ থেকেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বাদ এবং সামাজিক রক্ষণশীলতার অশুভ যোগাযোগ আরম্ভ। এই সংযোগের সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় তিলকের জীবনে। এই জনপ্রিয় শক্তিশালী নেতা একদিকে যেমন ব্রিটিশ-বিরোধী চরমবাদ প্রচারের জন্য বিখ্যাত। অপরদিকে তেমনি তাঁর অনেকখানি উৎসাহ এবং উদ্বীপন। নিয়োজিত হয়েছিল শিশু-বিবাহের স্বপক্ষে জনমত সংগঠনে এবং গো-সংরক্ষণ সমিতি প্রতিষ্ঠায়। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মদর্শনের পুনরুজ্জীবনের সাহায্যে জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের এই হাত্তকর মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা আন্দোলনের সাফল্য অনেকখানি বিলম্বিত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ যদি শুধু হিন্দুদের দেশ হত তাহলে হয়ত জাতীয় আন্দোলনের সংগে ধর্মের যোগাযোগ এতই ক্ষতিকর হত না। কিন্তু অত্যধিক উৎসাহের বলে অগ্নিস্থগের চরমপন্থী নেতারা অনেককেই ভুলে যান যে ভারত বহু ধর্মাবলম্বীর বাসভূমি এবং এদেশের জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফল মারাত্মক হতে পারে। কার্যতঃ অগ্নিস্থগের এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাধারা জাতীয় আন্দোলন

থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশের বিচাতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' যে আন্দোলনের প্রেরণা দায়ী, কালী এবং গণেশ যে আন্দোলনের আরাধ্য শক্তি, বৈদিক ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য, সে আন্দোলনকে ভারতীয় মুসলিম সমাজ খুব স্বাভাবিক কারণেই কখনও আপনাত বলে মনে করতে পারে নি। অল্পসংখ্যক মুসলিম অবশ্য অগ্নিবুগের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্রভাবে এই সম্প্রদায় বরাবরই এই আন্দোলনকে বিদেশীমূলক সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিল। অগ্নিবুগের কোন নামকরা নেতা এই সন্দেহের মনোভাব ঘুচিয়ে এদের সমগ্রভূতি অর্জনের চেষ্টা করেছেন বলে জানা যায় না। অথচ সারা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবদান অনেকখানি। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের দূরে চলে যাওয়া আরম্ভ, যার চূড়ান্ত পরিণাম অর্ধশতাব্দী পরে এই কুখ্যাত দেশবিভাগ। শুধু সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়, তার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ পরবর্তী ইতিহাসের আর একটি কুখ্যাত ঘটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আরম্ভও অগ্নিবুগ থেকেই দেখান যায়। সুতরাং সমস্তদিক বিচার করলে এই কথাটিই পরিষ্কৃত হয়ে উঠে যে অগ্নিবুগের জাতীয় আন্দোলনের সংগে ধর্মের যোগাযোগ শুধু নীতির দিক দিয়ে অপ্রশংসনীয় নয়, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবেও মারাত্মক কলত্র হতেছিল।

ব্রদেশী মনোভাবের সত্ত্বতম প্রকাশ অগ্নিবুগের জাতীয়শিক্ষা আন্দোলন। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করার যে পরিকল্পনা করা হয় তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষারও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিদেশী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া কেরানী তৈরী করার শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ থেকেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উৎপত্তি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি যে শুধু চিন্তাশীল ভারতীয়দের বিচলিত করেছিল তা নয়, স্থার উইলিয়াম হাটোরের মত স্বল্পপুরুষও এর বিরূপ সমালোচনা করে গিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই কাজে তিনি স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, চরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কাছ থেকে

যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। প্রধানতঃ এঁদের উৎসাহে এবং রাজা হুবোধ চন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতির অসামান্য দানশীলতার ফলে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৬)। প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রংপুরে। ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার ছাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ পরিভ্রমণ করে জাতীয় স্কুল-কলেজে যোগ দিল। সমিতির আহ্বানে অরবিন্দ ঘোষ বরোদারাজ্যের উচ্চপদ ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র বেতনে পরিষদ পরিচালিত জাতীয় কলেজের অধ্যাক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। কারিগরী এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থাও পরিষদ করেছিল, যার ফল আজও সুপ্ত হয় নি। বাংলার বাইরে বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, বেঙ্গাল প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলনের চিহ্ন দেখা গেলেও এই আন্দোলন কখনও সর্বভারতীয় হয়ে উঠতে পারে নি। বিপ্লব আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও শক্তিহীন হয়ে এল। কিন্তু সরকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এর সামান্য সাফল্য স্মরণীয়।*

অগ্নিবৃগের বিপ্লব আন্দোলনের সর্বশেষ এবং সর্বপ্রচণ্ড রূপ দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। ভারতে এবং ভারতের বাইরে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভারতীয় বিপ্লবীর ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিশালী সাহায্যে ত্রিটিশশক্তিকে এক মারাত্মক আঘাত হানবার চেষ্টায় প্রতী হন। এই আন্দোলনকেই কোন কোন লেখক আখ্যা দিয়াছেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম। কিন্তু সত্যিকার সংগ্রামে পরিণত হবার পূর্বেই এই আন্দোলন বিনষ্ট হয়। ভারতে এর একমাত্র বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যায় সন্ত্রাসবাদের আচমকা প্রাদুর্ভাব। সরকারী হিসাবে জানা যায় ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এক বাংলাদেশেই ২১০টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর অগ্নিবৃগের আপাতব্যর্থতা খুবট স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সন্ধিক্ষণেই জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। প্রধানতঃ অগ্নিবৃগের ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজির নূতন আদর্শবাদের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলন সমস্ত বিপ্লবের পথ পরিভ্রমণ করে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। ১৯১৯-২০ সালই তাই অগ্নিবৃগের শেষ সীমারেখা টানবার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়।

* Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee—A Phase of the Swadeshi Movement.

এ-যুগের বিপ্লব-ধানের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করলে প্রথমেই চোখে পড়ে এর রাজনৈতিক আদর্শবাদের অস্পষ্টতা। যে কোন বিপ্লবী-দলের সাফল্যের মূলে এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রেরণা অবশ্যস্বাভাবী। অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণ ব্রিটিশের বিভাডন সম্পর্কে একমত হলেও স্বাধীন ভারতের রূপ, জাতীয় সরকারের গঠন ও প্রকৃতি এইসব বিষয়ে কোন স্পষ্ট সন্তোষজনক যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন নি। সাধারণভাবে সব বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যই একটি কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে : স্বরাজ। কিন্তু স্বরাজের রূপ কি সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা বা মঠেকা ছিল না। চরমপন্থীদের নিকট স্বরাজ অর্থ ছিল ব্রিটিশ সম্পর্ক-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা। আবার কোন কোন মহল স্বরাজের অর্থ করতেন ব্যক্তির রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। পরবর্তী যুগের গান্ধীবাদীরা এই লেবোক্ত অর্থই গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শবাদে স্পষ্টতা ও মঠেকার অভাব প্রথম থেকেই আন্দোলনের অগ্রগতিকে অবলম্বন ও বিভিন্নগামী করেছিল। অস্পষ্ট চিন্তাধারার অন্ত্যন্তম লক্ষণ ছিল বিপ্লবী আদর্শবাদ ও আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অত্যধিক যোগ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে-বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীগণ আগাগোড়া এই হিন্দু অত্যাখ্যানবাদের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। স্বদেশে অবশ্য আন্দোলনের প্রথম থেকেই একটি স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল। একেই আমরা বলতে পারি ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয়তঃ আন্দোলনের কয়েকটি সাংগঠনিক দুর্বলতাও এর অগ্রগতিকে সব সময় মন্থর করে রেখেছিল। সাংগঠনিক দুর্বলতা বলতে এক্ষেত্রে সমগ্রভাবে আন্দোলনটিকে ধরা হচ্ছে, বিশেষ বিশেষ বিপ্লবী দলকে নয়। কারণ তারা অনেক সময়ই সুসংগঠিত ছিল। বিপ্লবীরা কখনই দল বা নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে নি। অসুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতির মধ্যে অবশ্য খুব একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক ছিল না। একত্রে কাজের নজিরও আছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বহুধাবিভক্ত হওয়ার ফলে আন্দোলনের শক্তি সমগ্রভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ পায় নি। এই একক নেতৃত্বের অভাব বিদেশের বিপ্লবীদের আন্দোলনকেও ব্যাহত করেছিল। উপরন্তু ছিল স্বদেশ এবং বিদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে নিয়মিত সংযোগের অভাব, যা ১৯১৪-১৫ সালে সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

অগ্নিযুগের বিপ্লব-বাদ বার্ষিক হওয়ার চতুর্থ এবং পঞ্চম কারণ, যথাক্রমে জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় জনিক-শ্রমিক-বিশ্বাসঘাতকতা। আধুনিক যুগে যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা সত্যেই অহুমান করা যায়। এই যুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্ট্যালিনের মত বিপ্লবীদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক হওয়া উচিত মাতৃসম। জনসাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতে যতকণ তার প্রতিষ্ঠা ততকণ সেটু দল অপরাহ্মেয়। কিন্তু যে যুদ্ধে সে জনসাধারণের সহায়ত্বিত্তি তারিয়ে ফেলে তখন তার বিনাশ খুব সহজসাধ্য। ইংরেজ এবং ফরাসী বিপ্লব থেকে বৃহৎ করে আধুনিক ইতিহাসে যতগুলি প্রগতিশীল বিপ্লব হয়েছে সবগুলিতেই নেতৃত্ব বৃক্ষিয়া শ্রমিকের হাতে থাকলেও সাফল্য অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে জনসাধারণের বিপ্লবী অগ্রগতির ফলে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষণও ছিল জনসাধারণ বিশেষতঃ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি মনোভাগ্যে অমিকসমাজ এবং বহু যুগের নিখাতিত কৃষকসম্প্রদায়ের সহযোগিতার অনিবার্য প্রয়োজনাত। এই সমোয় ইতিহাসিক সত্য অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এই আন্দোলন তাই দেশের কৃষক-শ্রমিক তথা বিপুল জনসাধারণের মনে কোন সহায়ত্বিত্তি জাগাতে পারে নি। বিপ্লবী নেতা শচীন সাম্র্যাল লিখেছেন—“ভারতের বিপ্লব-ল ভারতবাসীর নিকট চির উপেক্ষিত হইয়াছে।” এই অভিযোগ সত্যি, কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে বিপ্লব-বাদ প্রচার করার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নিঃসন্দেহ। অগ্নিযুগের বার্ষিকতার মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে জনসাধারণের সহযোগিতার মূল্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনে যে আসমুদ্রহিমাচল সারা দেশ প্লাবিত হয়েছিল তা আসলে গণশ্রমিকের জাগরণের অবজ্ঞাবাহী ফল। এইখানেই জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যিকার অবদান।

কিন্তু অগ্নিযুগের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বার্ষিকতার ইতিহাস বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ অন্ততঃ বারটি দিকে জাতীয় আন্দোলনে অগ্নি-যুগের মূল্যবান অবদান নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ অগ্নিযুগের সমস্ত বিপ্লব-বাদ ১৯১৯-২০ সালেই দেশে হয়ে যায়নি। যদিও এখন থেকে জাতীয় আন্দোলনের মূলধারা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস গণজাগরণের

ধাতে প্রবাহিত হয়েছিল তবুও এর পাশাপাশি আপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব-পূর্ণ কিন্তু নগণ্য নয়, একটি সশস্ত্র বিপ্লবের ধারার অস্তিত্ব অস্বতঃ ত্রিশ দশক পর্য্যন্ত দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৯ সালের মসি-মিটো এবং ১৯১৯ সালের মট্টেঙ্ক-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারও একদিক থেকে অগ্নি-যুগেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই দুই সংস্কারেই মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্যে ভারতীয়দের আংশিকভাবে প্রবেশ করিয়ে ক্রমবর্ধমান বিপ্লব আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের কোন কোন অংশের সহানুভূতি অর্জন করে জাতীয় আন্দোলনকে বিভক্ত করা। অগ্নিযুগের তৃতীয় ফল বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার। বিপ্লব আন্দোলনের একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গ। প্রধানতঃ বিপ্লব আন্দোলনের চাপে পড়েই ব্রিটিশ শাসক ১৯০৫ সালে যে ঘটনাকে অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছিল তাকে ১৯১২ সালে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পরিশেষে একথা স্বীকার করা উচিত, যে জাতীয় আন্দোলনে অগ্নিযুগের সবচেয়ে বড় অবদান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রূপ পরিবর্তন। জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাণ্ডিত করাই ছিল কংগ্রেসের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা ডিউন নিজে স্বীকার করে গিয়েছেন যে তাঁর পরিকল্পনা অল্পব্যয়ী কংগ্রেসের ভূমিকা ‘সেফটি ভাল্ভের’ কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার যে স্বপ্ন লর্ড ডাফরিন দেখেছিলেন তা সফল না হলেও মোটামুটিভাবে হল। যেতে পারে ১৮৮৫ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি কংগ্রেসের ভূমিকা সত্যিই সেফটি ভাল্ভের মত। প্রতিবৎসর শীতকালে জাঁকজমকের সংগে কোন বড় নগরে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট শাসন-সংস্কারের জন্য অল্পনয় বিনয় করার মধ্যেই ছিল অগ্নিযুগের কংগ্রেসের কাজ সীমাবদ্ধ। আদিযুগের নেতাদের দৃষ্টিশক্তিই যে কেবল স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনা ছাড়িয়ে বেশীদূর যায় নি তা নয়, এঁদের নানা বিরুদ্ধি এবং এযুগের কংগ্রেসের কার্যবিবরণীতে অনেকসময় রাজভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখা যেত তা ইতিহাসে বিরল। প্রথম পর্বের এই দাসজনোচিত আত্মদেষ্টা থেকে ১৯২০-২১ সালের বিপ্লবীরূপ বহুদূর। এই দূরত্ব অতিক্রম করে কংগ্রেসের যথার্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা একদিক থেকে অগ্নিযুগের ফল। অগ্নিযুগের শুরু থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে তিলক

বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লাললাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থী দল গড়ে উঠেছিল। এঁরা কংগ্রেসের ভূমিকা বিপ্লব আন্দোলনের নেতা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রধানতঃ এঁদের উদ্ভোগেই ১৯০৬ সালের অরবীন্দ কলিকাতা কংগ্রেসে বিদেশী আন্দোলনের সমর্থনস্বত্বকে একটি প্রস্তাব এবং আন্দোলনের একটি পটিকল্পনা গৃহীত হয়। বাংলার দাবী জাতীয় দাবী বলে ঘোষিত হয় এই অধিবেশনে। চরম-পন্থী-নরমপন্থী বিরোধের পরিণাম ১৯০৭ সনের তুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীদের কংগ্রেস পরিত্যাগ। দীর্ঘ নয়বৎসর নরমপন্থী নেতৃত্বের অধীনে কংগ্রেস, বিপ্লব আন্দোলন থেকে অনেক দূরে সরে ছিল। ১৯১৬ সালের যুগান্তকারী লক্ষ্মী কংগ্রেসে চরমপন্থীগণ আবার কংগ্রেসে ফিরে এল। তবে দুই বৎসর পর ১৯১৮ সালে নরমপন্থীরা নিজেরাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে উদারনৈতিক ফেডারেশন গঠন করে। ১৯১৮ সাল থেকেই কংগ্রেস ব্রিটিশ নির্দেশিত 'সফট ভালভের' ভূমিকা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী জন-সাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকার দিকে এগিয়ে যেতে ল'গল এবং পরিশেষে জাতীয় আন্দোলনের সংগে একাত্ম হয়ে গেল। জাতীয় কংগ্রেসের এই সংগ্রামী বিপ্লবীরূপ পরিগ্রহকে বলা যায় অগ্নিযুগের সংজ্ঞায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

জাতীয় আন্দোলনে অগ্নিযুগের স্থান নির্ণয়ে সর্বশেষ আধুনিক ইতি-হাসের অন্য কয়েকটি বিপ্লব আন্দোলনের কথা অপরিহার্যভাবেই মনে আসে। ইতালীর ঐক্যের ইতিহাসে কার্বনারি আন্দোলন বা রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে মার্সনিক এবং পরবর্তী নিউলিষ্ট আন্দোলনের কথা অনেকেরই জানা থাকে স্বাভাবিক। বিদেশী অস্ত্রিয়ান শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক ঐক্যের দাবীতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইতালীতে কার্বনারি আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। এই শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে বালিয়াতে অভ্যুত্থানী জারভদ্রের শোষণের অবসানের জন্য মার্সনিক এবং এর উত্তরাধিকারী এবং অধিকতর ধ্বংসাত্মক নিউলিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। অগ্নিযুগের মতই এই দুই আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়েছিল রাজনৈতিক আদর্শবাদের অম্পটতা, জনসাধারণের বিমুখতা ও সংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি দ্বারা। অথচ অগ্নিযুগের মত প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা দুই আন্দোলনই দেখা গিয়েছিল। আবার

এদের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই যথাক্রমে ইতালী এবং রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলন অনেক নূতন শিকাগাত করে এবং পরিণামে জয়যুক্ত হয়। তিনটি আন্দোলনকে এক সঙ্গে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে ইতালীয় ঐক্যের ইতিহাসে কার্বনারি আন্দোলনের যে স্থান, রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে নারদনিক-নিহিলিষ্ট আন্দোলনের যে স্থান, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্নিযুগের স্থান অনেকাংশে তাই-ই। মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভাডনে অসফল হলেও জাতীয় আন্দোলনে এই যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, আগেই বলা হয়েছে। অগ্নিযুগের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ভারতবাসী যে শিক্ষাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির সম্পূর্ণ প্রয়োগে অসমর্থ হলেও জাতীয় আন্দোলন অনেক পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠল। সর্বোপরি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও উদ্বোধনা, জলন্ত দেশপ্রেম এবং অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অমূল্য প্রেরণার উৎস হয়ে রইল।

ইতিহাস



পঞ্চম খণ্ড]

সালঙ্কন—বৈশাখ, ১৩৬১-৬২

[তৃতীয় সংখ্যা]

ইতিহাসের রীতি

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত

১

ঘটনা ঘটে অবিস্মরণে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। কালে নিরবচ্ছিন্ন, দেশে পৃথিবীব্যাপী মানবসমাজে বিধৃত এই ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাস নয়। তাকে ইতিহাসের উপাদান বললে মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু সত্যও প্রকাশ হয় না। কারণ ঐতিহাসিক যে ইতিহাস রচনা করেন তার সঙ্গে এই ঘটনাপ্রবাহের সম্বন্ধ বস্তু ও তার উপাদান-কারণের সম্বন্ধের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। ইতিহাস রচনার বিষয়কে কালে খণ্ডিত ও দেশে সীমাবদ্ধ করতে হয়। অল্পস্থায়ী ঘটনা কি বহুশতাব্দীব্যাপী ব্যাপারের ইতিহাস—ওয়াটারলু যুদ্ধ কি রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, নন্দকুমারের কান্না কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে দুই মহাযুদ্ধের ইতিহাস—সব ইতিহাস খণ্ডিত কালের, সীমিত দেশের ইতিহাস। কালের খণ্ড ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দেশের গতি স্বল্পবিস্তার বা দূরপ্রসারী, এইমাত্র প্রভেদ। নিরবধি কালে বিপুল পৃথিবীর সকল মানুষের ইতিহাস নেই। অনেক ঐতিহাসিক যাকে ঘটা করে বলেন বিশ্ব-ইতিহাস, সে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন

অধ্যক্ষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামাল্য:—(১৯৫৪) তৃতীয় বক্তৃতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।

কালের ইতিহাসের সমষ্টি মাত্র। তাদের মধ্যে সে অন্তরঙ্গ যোগ নেই যাতে ঐসব বিভিন্ন ইতিহাস এক ইতিহাস হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ইতিহাসের বিশ্বকোষ বিশ্ব-ইতিহাস নয়। এবং বিশ্ব ঐতিহাসিকদের বিশ্ব সব সময় বিশ্বের একটা টুকরো, যেখানকার মানুষের কর্মকলাপ ও সভ্যতার গতি-পরিণতির সঙ্গে ঐতিহাসিকদের সঘর্ষে পরিচয়। কারণ ঐতিহাসিক যে সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার মানুষ তার সঙ্গে ঐ টুকরোটটির সঘর্ষে নিকট ঐতিহাসিক আত্মীয়তা। ইবন্ খলুফনের বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের অভিযানে আরবদের সত্যতা ও অসত্যতা যে ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল তার ইতিহাস। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত, ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরের ইউরোপ ও দক্ষিণ তীরের আফ্রিকা—এই ছিল ইবন্ খলুফনের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব। হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস তাঁর absolute বা পরব্রহ্মের মানসের জিকের ছকে ছকে বাস্তবে পরিণতির ইতিহাস। সৃষ্টির অন্তর্গত আদৌলিকীর প্রেরণায় জিকের খেলার এ পরিণতি হেগেল দেখেছেন কেবল ভূমধ্যসাগরের চার পাশে ও পশ্চিম ইউরোপে। মানসের কল্পনায় যাই থাকুক, বাস্তবে ঐ ভূখণ্ডই হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব। ইতালিয়ান দার্শনিক ক্রোচে এক জায়গায় বলেছেন যে, —‘সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস, একথাটা প্রাহেলিকা নয়, সত্য’। সে সত্যকে প্রাহেলিকায়ুক্ত করতে ক্রোচের দার্শনিক বাগ্‌বিত্তি তাকে বেশ ঘোরালো করে তুলেছে। কিন্তু ও কথার মধ্যে একটা সহজ অদার্শনিক সত্য আছে। ঐতিহাসিক যে ইতিহাসই রচনা করেন, নিকট কি দূর-অতীতে, তিনি তাঁর ঘটনাবলীকে দেখেন নিজের দৃষ্টি কোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তার সমসাময়িক কালের বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ। তার ফলে বিশ্ব-ইতিহাসকার যখন নিজের প্রিয় ও পরিচিত দেশ-কাল চেড়ে অনাস্বীয় দেশ-কালের ইতিহাসের দিকে তাকান তখন সে দৃষ্টিকোণ থেকে সে ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রায় দেখা যায় না, দেখা যায় ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কমবেশী বিকৃত রূপ। অথচ নিজের দৃষ্টিকোণ ছাড়া কোনো নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ নেই। এমন মানুষ অবশ্য আছে যার অন্তর্দৃষ্টি অতি অপরিচিত সত্যতার ও মর্মস্থান দেখতে পায়। কিন্তু এরকম বিশ্ব-মানবের লখ্যো কম। এবং তাদের বিশ্ব-ইতিহাস-রচনায় হাত লাগাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

২

ইতিহাস সীমাবদ্ধ দেশে ষষ্ঠকালের ইতিহাস। কিন্তু সে সীমার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট কালে যত মানবীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনা মানুষ নিজে ঘটায় বা যা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, তার কথ্যমাত্রই ইতিহাসের উপাদান। সে ইতিহাস যে বিগতের হোক, যত বিস্তৃত যত-ঘটনাবহুল হোক।

অশোক মগধের সিংহাসনে বসলেন পিতার উত্তরাধিকারে। পিতামহ ও পিতার যুদ্ধাধিত বিশাল সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী সম্রাট হলেন। সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দক্ষিণে কিছু দূরে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান দেশ, হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত-বৃহৎ ও দেশভ্রমার বিজ্ঞানসম্মত, scientific frontier—বৃটিশ ভারত-সাম্রাজ্যে যার অভাবে সাম্রাজ্য-পর্বী লাট কর্তন দীর্ঘকাল ফেলছিল। এষ্ট বিস্তারিত রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু থেকে রক্ষার জন্য অশোককে কোনো নতুন যন্ত্র তৈরী করতে হয় নি। পিতামহ ও পিতার গড়া হস্ত্যদ্রব্যপদাতির যুদ্ধনিপুণ বিরাট স্থায়ী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন ও শাস্তির জন্য কোনো নতুন ব্যবস্থা অশোক প্রবর্তন করেন নি। পিতৃপিতামহ-প্রবর্তিত নানা শ্রেণীর রাজস্বাভ্যাস, তাদের সংঘ ও সংহতি, সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, একালের ভাষায় extensive bureaucratic organisation। সৈন্য, অমাত্য, লোক ও বাণিজ্য চলাচলের রাজপথ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের শাসনে ও ভোগে অশোকের রাজত্বের সাত বৎসর অভ্যস্ত হল; অতঃপরে, বসনে, রাজকীয় আড়ম্বরে মগধের পূর্ব পূর্ব সম্রাটদের মত। বঙ্গোপসাগরের পারে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরাপথে অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। পিতামহ কি পিতা সে রাজ্য জয় করেন নি সম্ভব তাঁদের অগ্রসরণে অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করলেন। রাজ্যের সীমা বাড়তে শক্তিমান রাজারা বা সচরাচর করে থাকেন। “পেলে দুই বিঘে প্রস্বে ও দীঘে সমান হইবে টানা”। কলিঙ্গ জয় হল। যুদ্ধে বহু লোক হত হল, বহু লোক বন্দী হল, বিজিত দেশের লোকেরা বহু হঃখদুঃখ ভোগ করল এরকম যুদ্ধে যা স্বাভাবিক, সব সময় ঘটে থাকে। কিন্তু অশোকের মনের উপর তার ফল হল যা বুদ্ধজয়ী রাজার মনে সচরাচর হয় না। পর-রাজ্যজয়ের নৃশংসতায় অশোকের মনে অনুশোচনা এল। সাময়িক অনুতাপের বিলাস নয়; সম্রাটের জীবনের

গতি-পরিবর্তন হল। রাজ্যশাসনের লক্ষ্য বদলে গেল। অশোকের প্রতীতি হল রাজার রাজ্যের বড় জয় নয়, বড় জয় আব্রাহম। সে আব্রাহমের উপায় যে শীলাচরণ গৌতম বুদ্ধের উপদেশে দেশে শৃঙ্খতা ছিল অশোক নিজের জীবনে তার অনুশীলন আরম্ভ করলেন। তাঁর পূর্বে নিশ্চয় হল, রাজার রাজ্যশাসন প্রচার কেবল বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধির চেষ্টায় সফল নয়, রাজার বড় কর্তব্য প্রজাদের জীবন তাঁর নিজের জীবনের মত এই শীলের নীতিতে গড়ে তোলা। অশোক সাম্রাজ্যময় এই শীলের প্রচারের এবং প্রজাদের জীবনে শীল রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা করলেন। সম্ভব যে bureaucracy সমস্ত সাম্রাজ্যে রাজ্যশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই bureaucracy হল এই প্রচার ও রক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্র। সুতরাং নীতি প্রচারের পেছনে রাষ্ট্রশক্তির চাপ নিশ্চয় ছিল। রাজার উচিত কি না প্রজার ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবন নিয়মিত করার চেষ্টা নিজের আদর্শ অনুসারে, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভালো কি মন্দ, খুব তর্কের বিষয়। যেমন তর্কের বিষয় অশোকের রাজশক্তির চেয়ে বহুগুণ ক্ষমতামূলী বর্তমানের রাষ্ট্রের উচিত কি না প্রজার জীবনকে নানা দিক থেকে নিয়মিত, conditioned, করার চেষ্টা, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভালো না মন্দ। অশোক জীবনযাত্রার আদর্শের উপদেশ সাম্রাজ্যময় স্থায়ী রূপ দিয়ে লিখে দিলেন পাহাড়ের গায়, আশ্চর্যগড়ম পাথরের স্তম্ভে। গৌতম বুদ্ধের সঙ্কল্পের উপদেশ তিনি জানলেন নিখিল মানবের হিতের জন্য। সুতরাং কেবল নিজের প্রজাদের মধ্যে তার প্রচারে অশোক তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষে তাঁর নিজের রাজত্বসীমার বাইরে এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে অল্প সভ্যতার মানুষের নানা রাজ্যে তিনি প্রচারক পাঠালেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগ স্থাপন আরম্ভ হল। দু'হাজার বছরের বেশী হয়ে গেছে, তার ফল ও প্রভাব পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি।

এক রাজার রাজত্বের চল্লিশ বছরের ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে তার গুরুত্বপূর্ণতা কঠিন।

এই চল্লিশ বছরে অশোকের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনের প্রতিদিন, ঘটনা ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ চাষী দিনের পর দিন মাটি চাষ করে লক্ষ কলিয়েছে। লক্ষ লক্ষ কুমার কামার ও শিল্পীরা নানা শিল্পজব্য গড়েছে।

লক্ষ লক্ষ বিভাশিক্ষার্থী ছাত্র বিভাগে পাঠ নিয়েছে। শিক্ষকেরা তাদের পড়িয়েছে। পড়িতেরা জ্ঞানচর্চা করেছে। কবিতা কাব্য রচনা করেছে। চুখ-শ্রমে অগণিত কোকের প্রতিদিন জীবন কেটেছে। অশোকের রাজত্বের ইতিহাসে এসব লক্ষ্যকোটি ঘটনার স্থান নেই। এ চল্লিশ বছরের মানবীয় ঘটনার তুচ্ছাতিতম ক্ষুদ্র অংশ বেছে নিয়েই তবে অশোকের রাজত্বের ইতিহাস রচনা সম্ভব। যদি অশোকের কালে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব হত, যেমন জানা যায় বর্তমান কালের কোনো রাষ্ট্রের প্রজাদের; যদি প্রজাদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দ, শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে তাদের গতি ও উন্নতির পূর্ণ ও যথার্থ খবর পাওয়া যেত,—হু পুরুষ পূর্বকার বিদেশী আগন্তকের খণ্ড বিবরণের ছিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করতে না হত, এবং অশোকলিপির কথাবস্তু, ও সাম্রাজ্যের সব অংশে সে অনুশাসন পাথরে বুনে প্রজাসাধারণের পড়ার জন্য ছড়িয়ে রাখার তথ্য, লিপির অক্ষরের স্ফুটোল, লিপিবাহী স্তম্ভের বিন্যাসের সঠিকতা ও মন্বনতা, পশুলাহ্ন স্তম্ভশীর্ষের আশ্চর্য কারিগরি—এসব থেকে একটা মোটামুটি অনুমানের উপর নির্ভর করতে না হত, তবে অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস-লেখককে রাষ্ট্রীয় ও রাজ্যের কর্মসূচীনের বিবরণ মাত্র দিয়েই ইতিহাস লিখতে হত না; সে কালের আর্থিক সামাজিক ও সভ্যতার ইতিহাস, প্রচলিত ইংরাজী সংজ্ঞায় যাকে বলে economic, social ও cultural history, সব মিলিয়ে অশোকের রাজত্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারতেন। কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ ঘটনা এ সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি, সে ইতিহাস লেখা সম্ভব হত এসব ঘটনার প্রতিটির বিশেষত্ব অর্থাৎ ঘটনাত্ত বর্ণন করে, তা থেকে সাধারণ তথ্য ও গুণ্য নিকাশন করে। সে কালের নিখিল ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিমাণের কোনো পরিমাণগত তুলনা থাকত না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শূন্যতাই সব, বস্তু নাই বললেই চলে। নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ-বস্তুর হু-চাট্টা বিন্দু অসীম দূরে দূরে এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। ইতিহাসের যা বস্তু তা অবস্তু ঘটনার মহাকাশে গুটি-কয়েক বিন্দু। সেই বিন্দুগুলি বেছে নিয়েই ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। ইতিহাসের দেশ ও কালের সীমার যে সংখ্যাভীত ঘটনা ঘটে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ ইতিহাসের উপাদান।

তুলনায় প্রায় সব বাদ দিতে হয়, রাখতে হয় অতি সামান্য। বাছাই করে কতটুকু রাখতে হবে নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপর ও তাঁর ইতিহাস রচনার লক্ষ্যের উপর।

৩

আচার্য মেইটল্যাণ্ড তাঁর ইংলেণ্ডের ব্যবহারশাস্ত্রের ইতিহাসে ঘটনার অবিকল্পিততাকে বলেছেন 'সেলাই-মুক্ত ঠাসবুননিপট'—“a seamless web”। ঐতিহাসিক এই পটে নানারঙা সূতোর সেলাই দিয়ে ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন। কোনো প্যাটার্নের ঘের খুব বড়, যেমন মসেনের জুলিয়াস সিজারের ক্ষমতাসীল পর্ষদ রোমের রিপাবলিকের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস। আরও বড় ঘের, যেমন গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস, মারকাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল দখল পর্যন্ত প্রায় তেরো শতাব্দীর ইতিহাস। কোনো ঘের তুলনায় অনেক ছোট। যেমন আচার্য যত্নাথের ঔরংজেবের রাজত্বের ৫০ বছরের ইতিহাস, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূচনার ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এ পটের দুই ডাইমেনশন দেশ ও কাল। কোনো ইতিহাসের ঘের কালের ডাইমেনশনে দূরপ্রসারী, দেশের ডাইমেনশনে তুলনায় ছোট। যেমন ইতিহাসের প্রকৃত আরম্ভ থেকে আলেকজেন্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত তিন শ বছরের গ্রীসের ইতিহাস। দেশের ডাইমেনশনে প্রকাণ্ড, কালের ডাইমেনশনে অত্যন্ত খাটো। যেমন পৃথিবীর বহু অংশে ব্যাপ্ত বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ বছরের ইতিহাস। ইতিহাসের ঘের কালে ও দেশে কত বড়, কি কত ছোট হবে তার কোনো স্বাভাবিক মাপ নেই। সে মাপ নির্ভর করে ঐতিহাসিক কতটা কালের ও কতখানি দেশের কথা বলতে চান। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহাসিক যুদ্ধারম্ভ থেকে যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত লিখতে পারেন। কিন্তু সে মহাযুদ্ধের প্রকট কলাকলণ যুদ্ধবিরতিতেই শেষ হয় নাই। তার সংঘাতে পৃথিবীর নানা খণ্ডে যুদ্ধের মধ্যে ভাঙাগড়া আজও চলছে। ঐতিহাসিক এ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর সময় পর্যন্ত পৃথিবীর নানা খণ্ডে এই ভাঙাগড়ার বিবরণ তাঁর ইতিহাসের অন্তর্গত করতে পারেন। অথবা, একটিমাত্র দেশ, যেমন ইংলেণ্ডে কি মার্কিন দেশে, তার কলাকলণের বিবরণে ইতিহাস শেষ করতে পারেন। দেশ ও কাল যাদুঘরের মনের সৃষ্টি কি না দার্শনিকেরা তার বিচার করেন। কিন্তু ইতিহাসের দেশ ও কাল যে ঐতিহাসিকের মনের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই।

দেশ ও কালের ঘেরের মধ্যে ঐতিহাসিক ইতিহাসের যে প্যাটার্ন বোনের সে প্যাটার্ন কত চোড়া? তার মাপ নির্ভর করে প্রথমত ও প্রধানত, ঐতিহাসিক যে ধরনের ইতিহাস রচনা করেন, ঐ নির্দিষ্ট দেশ ও কালে সে ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বহুলতা বা বিরলতার উপর এবং সেসব ঘটনার জ্ঞানের প্রাচুর্য বা দৈছের উপর। মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যে চোড়া প্যাটার্ন তার তুলনায় বৈদিক যুগ থেকে মগধ সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বকাল পর্যন্তের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্যাটার্ন অত্যন্ত সরু, এবং তা হবেই হবে। ঐ প্রাচীনতর কালের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান যে তুলনায় খুব বিরল কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাই ঘটেছিল অত্যন্ত কম। লোকের জীবনে রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব ও প্রাধাত্য ছিল কম, কারণ রাষ্ট্রগুলি ছিল শিথিলবন্ধন। সম্ভব অহুসকারের ফলে এ যুগের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান ক্রমে অনেক বাড়বে, কিন্তু সে জ্ঞান প্রধানত হবে বিচ্ছিন্ন সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান। এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অল্পবিস্তর ধারাবাহিক ঘটনার সূত্রায় বেঁধে ইতিহাসের প্যাটার্ন বোনা সম্ভব হবে, সে ভরসা করতে সাহস হয় না। কিন্তু প্রাচীনতর কালের জ্ঞান, কি ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে, বেশীর ভাগ এইরকম বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। মানবীয় ঘটনার বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রত্নতত্ত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল ইতিহাসের মালমশলা মনে করা সত্যদৃষ্টি নয়। যে নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পূর্ব থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়, সে জ্ঞান ইতিহাসের মালমশলা। কারণ সে জ্ঞান ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর একটু বেশী চোড়া করে, অথবা কাক পূর্ণ করে সে প্যাটার্নের বুননিকে আরও একটু ঠাস-বুননি করে। কিন্তু যে জ্ঞানের এরকম সংযোগ স্থাপন করা যায় না, যা বিচ্ছিন্নই থেকে যায়, সে জ্ঞান মূল্যহীন নয়। মানুষের পরিচয় দেয় বলেই মানুষের কাছে তার মূল্য। মহেঞ্জোদাড়ো কি ক্রীটের মাটি খুঁড়ে মানুষের যেসব চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে সেসব মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি কুম্ভাসাগরের সভ্যতার ইতিহাসের স্পষ্ট যোগ স্থাপন করা যায় নি। এবং কোনোদিন যদি না-ও যায়, মানুষের এই পরিচয় মানুষের বিশ্বয় জাগাবেই। সে বিশ্বয় ইতিহাস

যে বিশ্বয় আগায় তার সমগোত্র। শেলির Ozymandius এর মত

Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand
Half sunk, a shattered visage lies,

Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.

কিন্তু ইতিহাসের প্যাটার্নের চওড়ার মাপ কেবল ঘটনার ও তার জ্ঞানের প্রাচুর্য কি বিয়লতার উপর নির্ভর করে না। ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপরে নির্ভর করে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগে ইতিহাসের সৃষ্টি। যে ঐতিহাসিক তাঁর কল্পিত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কোনো ঘটনার যোগ দেখতে পান না তাঁর ইতিহাসে স্বভাবতই সে ঘটনার স্থান নেই। প্রতিভাবান ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সঙ্গে অল্প ঘটনার ঐতিহাসিক যোগ দেখতে পান, সাধারণ ঐতিহাসিকের যা চোখ এড়িয়ে যায়। সেই ক্ষুদ্র ঝাঁঝ ইতিহাসের প্রতিভাবান অষ্টা তাঁদের ইতিহাসের প্যাটার্ন অনেক সময় বেশী চওড়া। তাঁদের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার স্থান আছে, সাধারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাসে যাদের স্থান নেই।

৫

দেশ ও কালের অচ্ছিন্ন ঘটনার পটে কিছু ঘটনা বেছে নিয়ে ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের ছবি আঁকেন। ইতিহাসের ঝাঁঝ বড় পটুয়া তাঁদের ছবিতে ছোট পটুরাঘের ছবির তুলনায় অনেক সময় ঘটনার রেখা অনেক বেশী। কিন্তু কোন্ ইতিহাসে কত ঘটনা বেছে নিয়ে স্থান দেওয়া যায় তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। ঐতিহাসিক বহু রকম ঘটনার নানা রঙের সূতোয় তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন। কিন্তু এমন রঙের সূতো আছে যা সে প্যাটার্নের সঙ্গে match করে না। সে সূতাকে প্যাটার্নের পাশে পাশে চালিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু তা দিয়ে প্যাটার্নের অঙ্গ বৃদ্ধি করা চলে না।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, ইতিহাস বলতে লোকে সাধারণত যা বোঝে তা, যে, দেশ ও কালের পূর্ণ পরিচয় দেয় না, তা স্মরণ করে অনেকে

এই অন্তর্হীন ইতিহাসের উপর কিছু বীতজ্ঞক হয়েছেন। তাঁরা বলেন, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হবে এমন ইতিহাস যা উদ্দিষ্ট দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিকের পরিচয় দেবে। কেবল রাষ্ট্র গড়া-ভাঙার পরিচয় নয়; সামাজিক পরিবর্তন, ধনতাত্ত্বিক বিবর্তন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তার ফলপরিবর্তন; ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান—সব কিছুর উত্থানপতন-পরিবর্তনের পরিচয় দেবে। কোনো দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিক না জানলে যে সে মানুষকে সম্পূর্ণ জানা হয় না এ তো স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে tautology। কিন্তু এক ইতিহাসে, অর্থাৎ এক রকমের ইতিহাসে, এসমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়, তাও স্বতঃসিদ্ধ। তা জানাতে ও জানতে একই দেশ ও কালের বিভিন্ন রকমের ইতিহাস লিখতে ও পড়তে হয়। কোনো short cut নেই। এক জায়গায় সব কিছু পেয়ে যাব এটা অসম্ভব মনের কল্পনা। তারা মানুষের ইতিহাস নিবিড় করে জানতে চায় না। এক এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে অনেকে যেমন সকল জ্ঞানের জ্ঞানী হতে চায়।

এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখ অবশ্য থাকবে। তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সীমার বাইরে এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যার মূল্য রাষ্ট্রীয় ঘটনার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। তেমনি এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ঘটনার উল্লেখ থাকবে। কতক সাহিত্যের ইতিহাসকে কালক্রমিক কাঠামো দেবার জন্য, কতক সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের উপর রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল, সেই জন্য। কিন্তু এলিজাবেথের যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস জানা যাবে এ আশা তেমনি ছুরাশা, যেমন ছুরাশা সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস প'ড়ে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জানা যাবে।

রাষ্ট্রীয় ঘটনার ইতিহাসের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক যুগের জীবনের অন্য অনেক দিকের পরিচয় দিতে গেলে তা কি ক'রে সম্ভব করা যায় তার নমুনা মন্সেনের রোমের ইতিহাসে আছে। রোমান রিপাবলিকের উত্থান ও ধ্বংসের ইতিহাসকে তার উপযোগী নানা পর্বে মন্সেন ভাগ করেছেন। প্রতি পর্বের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণ সমাপ্ত ক'রে তার শেষে সে পর্বকালের ধর্ম ও শিক্ষা সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে ছ-একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। প্রেক্ষাই জ্ঞাতাদের রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার ও বিপ্লবের চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা,

মেরিয়াসের বিপ্লব ও ডুসাসের সংস্কারের প্রয়াস, প্রাচ্যে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ (মম্সেনের মতে ম্যারাথনে প্যান্ঠাত্য ও প্রাচ্যের যে প্রকাণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল, বহুদিন স্থিমিত থাকার পর তারই একটা ছোট অধ্যায় ; এবং মম্সেনের কল্পনায় তাঁর কাল পর্যন্ত এ সংঘর্ষ যেমন হাজার হাজার বছর চলেছে, তেমনি পরবর্তী কালেও হাজার হাজার বছর চলেবে), সিনা ও সালার কার্য ও অকার্য—এই নব্বই বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, মম্সেন যাকে বলেছেন রোমান ইতিহাসে সবচেয়ে অগৌরবের যুগ, এগারো অধ্যায়ে তার বর্ণনা দিয়ে, মম্সেন একটি অধ্যায়ে সে যুগের রোমান রিপাবলিকে নানা জাতি, তাদের অবস্থা, ধর্ম ও শিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন, এবং আর একটি অধ্যায়ে সাহিত্য ও শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ; সালার মৃত্যু থেকে রোমান রিপাবলিকের ধ্বংসের উপর জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত চৌত্রিশ বছরের চিন্তাকর্মী ও নিঃশ্বাসরোধী অতিক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ঘটনা-প্রবাহের ইতিহাস আবার এগারো অধ্যায়ে বর্ণনা করে, তার শেষে সে যুগের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের বিবরণ দিয়ে একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন ।

এসব অধ্যায়গুলি মম্সেনের ইতিহাসের পরিশিষ্ট মাত্র । মূল ইতিহাসের প্রাণে নয় । তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্নের পাশে বিভিন্ন বড়ের সূতো দিয়ে একটু বুননি-করা । স্বয়ং করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ঘটনাই একমাত্র ঘটনা নয়, অল্প ব্যাপারও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল । মম্সেন কখনও কল্পনা করেন নি যে তাঁর এইসব বিবরণ সেসব যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের এমন বিবরণ দিয়েছে যে এসব ব্যাপারের প্রতিটির স্বতন্ত্র ইতিহাস লেখার ও পড়ার আর প্রয়োজন নেই । প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয়ের স্বতন্ত্র জ্ঞান যাদের নেই তারা মম্সেনের বিবরণ পাড়ে কিছুই বুঝতে কি জানতে পারবে না ।

মানুষকে অর্থও করে দেখাই ডাকে সত্য করে দেখা । কিন্তু খণ্ড খণ্ড করে প্রথমে তার পরিচয় না নিলে ডাকে অর্থও করে দেখা অসম্ভব । ‘একং বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং’ নয়, সর্বকে জানলেই তবে এককে জানা যাবে । রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অবজাই দেশ ও কালের সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না । সে সম্পূর্ণ পরিচয়ের উপায় নয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে কাঁপিয়ে multi-purpose ইতিহাসে পরিণত করা । তার উপায় দেশ ও কালের নানা ব্যাপারের

স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া। তার অল্প স্বতন্ত্র সব ইতিহাসের প্রয়োজন। এসব স্বতন্ত্র ইতিহাস পাঠকের মননের জারক রসে এক হয়ে-তবেই দেশ ও কালের অর্থও পূর্ণ জ্ঞান দেয়। যে পাঠক সে অম-স্বীকারে প্রস্তুত মন তাদের অল্প রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে অল্প ইতিহাসের handbook অবশ্য জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সে handbookগুলি handbookই, ইতিহাস নয়।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ যে অল্প সব রকম ইতিহাসের আকর্ষণের চেয়ে বেশী তার কারণ সে ইতিহাস মানুষের কর্ম-অকর্মের, হুঃখ-সুখের, মহত্ব-হীনতার, ঘৃণ্য-মৈত্রীর, জয়-পরাজয়ের বিশিষ্ট কাহিনী। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস, কি ধনতন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসের মত নৈব্যক্তিক ব্যাপারের বিবরণ নয়। মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শের আকর্ষণ। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষ যে বলবান, সকল বিধিনিষেধের ব্যাখ্যায় একটি প্রয়োজ্য নিয়ম। ইতিহাসেও abstract 'সামান্য'র চেয়ে concrete 'বিশেষ' বলবান। তাদের মহিমা তখনই হৃদয়ংগম হয় বিদিশে তথ্যের মধ্যে যখন তাকে দেখা যায়।

৬

উনবিংশ শতাব্দীর নাকানামি একদল ইউরোপীয় ইতিহাস-লেখক বলতে আরম্ভ করলেন যে, ইতিহাস সাহিত্য নয়, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। এবং নিজেদের লেখা ইতিহাসের, পূর্বতনদের সাহিত্য-গদ্য ইতিহাস থেকে তফাত করার জন্য, নাম দিলেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস'—scientific history। সে সময় অনেক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির কাল। কিন্তু এক বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের যা পথ ও নিয়মকানুন, অল্প বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার সে পথে ও সে নিয়মকানুনে চলে না। পদার্থবিজ্ঞানের চলার রীতি ও জীবনবিজ্ঞানের চলার রীতি এক নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি রসায়নবিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি নয়। সকল বিজ্ঞানের সাধারণ কোনো বৈজ্ঞানিক রীতি নেই। যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ সে হচ্ছে, সত্যনিষ্ঠা, এবং বিনা প্রমাণে কি অপ্ৰচুর প্রমাণে কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা। এবং প্রমাণবিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারাকে পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা। যে ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, কল্পনাবিশ্রাস্ত নয়, সে ইতিহাসে এসব গুণ অবশ্য থাকবে। অর্থাৎ সে ইতিহাস হবে প্রামাণিক ইতিহাস, বিনা

প্রমাণে কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না, কোনো মোহতেই প্রমাণিত সত্যকে গোপন করবে না। কিন্তু মাত্র প্রামাণিক বললে ইতিহাসকে 'বৈজ্ঞানিক' নাম দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানের যে অসীম প্রেষ্টিজ, নামের মহিমায় তার কিছুটা ইতিহাস-বিজ্ঞায় টানা যায় না। এমন মনোভাব ও চেষ্টা নূতন নয়। পূর্বে যখন দর্শনের প্রেষ্টিজ ছিল বড়, এবং বহু বিজ্ঞানের শৈশবকাল, তখন পদার্থবিজ্ঞানের নাম ছিল natural philosophy। আজ স্থনীতি বিজ্ঞাকে moral philosophy না বলে বলি moral science।

কিন্তু ইতিহাস রচনাকে যারা বিজ্ঞান রচনা মনে করেছিলেন, তাঁদের রচিত ইতিহাসে তার ফল ফলছিল। ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন সাহিত্যের মত তার সুখপাঠ্য হওয়া দোষের, কারণ তা ভঙ্গী দিয়ে সাধারণ পাঠকের মন ভুলাবার চেষ্টা। ইতিহাস হবে বিজ্ঞানের মত নিবেট, অর্থাৎ solid, এবং তাতে রসের স্পর্শ থাকবে না। সাধারণ পাঠক সে ইতিহাস না-ই বা পড়ল, কারণ সাধারণ পাঠক সচরাচর বিজ্ঞানের পুঁড়ি পড়ে না। ফলে সেসব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এখন অসাধারণ পাঠকও পড়ে না।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্বের একটা সুবিধা যে, রচনাশক্তির তারতম্যে এক ঐতিহাসিক অল্প ঐতিহাসিকের চেয়ে খাটে। হয় না। কেননা রচনাশক্তিটাই অবাস্তব। কোনো রকমে সত্য তথ্যটা প্রকাশ করতে পারলেই হল। এবং আরও বড় সুবিধা আছে।

ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন গবেষণায় ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের নিয়মগুলি আয়ত্ত করে পরিচাল্য করলেই সকল ঐতিহাসিক সমান মূল্যের ইতিহাস রচনা করতে পারে। ঐতিহাসিক প্রতিভা বলে কিছু নেই। আছে নিয়ম মেনে চলা ও পরিচাল্য করা।

হাতে-হাতিয়ারে যারা কোনো বিজ্ঞানের চর্চা করে না, বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর মনন খারাব খবর জানে না, তাদের অনেকের ধারণা যে বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করে পরিচাল্যনিষ্ঠার ফল। বোড়শ শৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপে নব্যবিজ্ঞানের উদ্যেগকাল, ও তার সাফল্যে সকলে চমৎকৃত, সে সময় ইংলণ্ডের Francis Bacon এ নব্যবিজ্ঞান একজন উদুগাতা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Advancement of Learning-এ তিনি প্রাচীনকালের

কুসংস্কারবদ্ধ সত্য আবিষ্কারের এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, প্রাচীন মত যদি প্রাচীনদের মত বলে গ্রাহ্য করতে হয়, তবে আধুনিকেরাই প্রকৃত প্রাচীন, কারণ প্রাচীনদের চেয়ে আধুনিকদের বয়স অনেক বেশী। Francis Bacon আর একখানি পুঁথি লিখেছিলেন, যার নাম *Novum Organum*, অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের নূতন বিধি-বিধান। এ গ্রন্থে বেকন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের নিয়মগুলির এক তালিকা দিয়েছেন। তার ধারণা ছিল যে 'প্রাকৃতিক ব্যাপারের' অধ্যয়নে এই নিয়মগুলির প্রয়োগ করলেই সে ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হবে। এই আশায় ঐগ্রন্থে তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও তালিকা দিয়েছেন, যাতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সেসব ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে বাধাধরা নিয়ম প্রয়োগেই হয় তাতে বেকনের সন্দেহ ছিল না। অর্থাৎ নিয়ম মেনে নির্ভার সঙ্গে চর্চা করলে যে কেউ নিউটন কি ডারউইন, আইনস্টাইন কি প্লাঙ্কের তুল্য মূল্য সত্য আবিষ্কার করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নব নব উদ্বেগধারী বুদ্ধির আবির্ভাব অনাবশ্যক। বিজ্ঞানোৎসাহী বেকনের বিজ্ঞানে যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল না তার বড় প্রমাণ যে, দোড়শ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানে গণিতের স্থান সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদেরও ধারণা বেকনের বিজ্ঞানের ধারণার অমূল্য। যে কোনো ইতিহাস লেখক চেষ্টা করলেই গিবন কি মন্সেন হতে পারে।

৭

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দিন বিগত হয়েছে। এখনও ষাঁরা সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বলেন তাঁরা একটা চলতি নাম অড্যাসবশেই ব্যবহার করেন।

কিন্তু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের একটা ফল দূর হয় নি, বেশ টাঁকে আছে। সে হচ্ছে ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্বক্তা মনে করা।

বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অনেক কথা বলে। জোয়ার-ভাটার সময়, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ভবিষ্যতের যে কোনো দিনে গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান—স্বনে বলতে পারে। যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সেসব নিয়ম দিয়ে গণনা করে বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ বলে। ইতিহাস যখন

বিজ্ঞান তখন ইতিহাস কেন ভবিষ্যতের ঘটনা হুনে বলতে পারবে না? অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যেমন অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষা করে মানুষের সমাজে ঘটনা ঘটাব তেমনি সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। এবং সেই সব নিয়ম অনুসরণ করে বর্তমান কোনো মানবীয় ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস নাকি বলেছিলেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুগুলোর সংস্থান কেমন ছিল, তাদের গতির দিক ও শক্তির পরিমাণ কি ছিল, তা জানা থাকলে ভবিষ্যত সৃষ্টির সব তথ্য তিনি হুনে বলতে পারতেন। হালের বিজ্ঞানীরা অতটা সাহসিক নন। ওরা জেনেছেন যে সৃষ্টির ব্যাপার ও তার মালমশলার প্রকৃতি এরকম গণনায় ধরা দেবার মত নয়, অনেক বেশী জটিল। মানুষের সমাজের গতি-পরিণতি তার চেয়ে কম জটিল নয়। এ জটিলতার মধ্যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যৎ-বাণীর চেষ্টা যে কত নিরর্থক গিবনের ইতিহাস তার একটা ‘ক্লাসিক’ উদাহরণ আছে। গিবন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইওরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসে ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন, “and we may inquire with curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will illustrate the fall of that mighty empire and explain the probable causes of our actual security,” এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে তাঁর সমসাময়িক ইওরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। “The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation”। গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের ছ বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক

ইওরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর গলা আরম্ভ হয়েছে তার কোনো সন্দেহ গিবনের মনে হয় নাই।^১

যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্বক্তা হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর একবার ভেবে দেখা ভালো যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর কি না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণের উৎসাহ সে ভাবনা অনেক ঐতিহাসিককে ভাবতে দেয় না। তার এক নমুনা ইংরেজ লেখক টোয়েনবি। বহু বৎসর তাঁর বিস্তৃত ঐতিহাসিক ওয়ালোচনা শেষ করে শেষ দু'বৎসর সোজাহুজি অনেক ভবিষ্যৎ বাণী বলেছেন। এ কালের বিজ্ঞানীরা বলেন যে অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর গতিবিধি গোনা যায় না, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জের, অর্থাৎ massএর গতি-প্রকৃতি statistical উপায়ে গোনা যায়। টোয়েনবি কোনো বিশেষ ব্যাপারের ভবিষ্যৎ বাণী করেন নাই, গোটা মানব-সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছেন। সে ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণী ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইওরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি—যা একজন ইওরোপীয় লেখকের মনে হয়েছে, এসব ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা বেক, ইতিহাসের কোনো দিক থেকে নয়।

৮

এ কাল পর্যন্ত মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যতটুকু ইতিহাস জানা গেছে তাতে সে সমাজ ও সভ্যতার গতির এমন কিছু অলঙ্ঘ্য নিয়ম কি স্নেহিঁহি যাতে তার ভবিষ্যৎ গতির কথা কিছু বলা যায়? ইংরেজ ইতিহাস-লেখক H. A. L. Fisher তাঁর 'ইওরোপের ইতিহাস'এর ভূমিকায় লিখেছেন—
“One intellectual excitement has, however, been denied me. Men wiser and more learned than I have discerned in history a plot, a rhythm, a predetermined pattern.^২ These harmonies are concealed from me. I can see only one emergency following upon another as wave follows wave, only one great fact with respect to which, since it

১। এই উদাহরণটি নিয়েছি ১০০৪ সালের আবার একটি লেখা থেকে।

'ইতিহাস' (বিভিডা, প্রথম বর্ষ, আবার)

is unique, there can be no generalisations, only one safe rule for the historian : that he should recognize in the development of human destinies the play of the contingent and the unforeseen. This is not a doctrine of cynicism and despair. The fact of progress is written plain and large on the page of history ; but progress is not a law of nature. The ground gained by one generation may be lost by the next. The thoughts of men may flow into channels which lead to disaster and barbarism.

কুড়ি বছর পূর্বের লেখা ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নি ।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ বলা যায় এ বিশ্বাসের অন্তরে এই স্বীকৃতি লুকিয়ে আছে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিক হয়েই আছে । মানুষের কর্ম অকর্ম নিমিত্ত মাত্র । এ বিশ্বাস কারও মনে হতাশা আনে, কারও মনে উৎসাহ আনে । সমাজের ক্রমপরিণতিতে যে proletariat এর dictatorship অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যস্বাধী, এ বিশ্বাস কার্ল মার্কসের মনে উৎসাহ এনেছিল, এবং তিনি অগ্রচরদের মনে উৎসাহ এনেছিলেন এ বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক সত্য তার প্রমাণ প্রচার করে । এ বিশ্বাসের মূল কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়, মনের আকাঙ্ক্ষা । মানুষের ও তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ যদি প্রথম থেকেই নির্ণীত হয়ে থাকে, এবং তা যদি পূর্বেই জানা যায়, জানা যাবে ভবিষ্যৎ-ঐশ্বর্যের অপরোক্ষ দৃষ্টিতে, ইতিহাস-জ্ঞানের সরল পথে নয় । সুতরাং ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বাণী অপরোক্ষদৃষ্টি ঐশ্বর্যদের ছেড়ে দিয়ে, ঐতিহাসিকদের নিকট হওয়াই ভালো । মানুষের ইতিহাসের ঋজু কুটিল পথে বিভিন্ন গতির যে বিশ্বয়, মানুষের মনে সে বিশ্বয় জাগাতে পারলেই ঐতিহাসিক বল হবেন ।

ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত

শ্রীতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বশতাব্দীর প্রথম পাদে ইহাড়া পূর্ববঙ্গে অদেখী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারা অনেকই হুদতো টাঙ্গাইলের রামপ্রাণ গুপ্তকে ভালভাবেই জানেন, কিন্তু ঐতিহাসিক রামপ্রাণের পরিচয় অল্পকয়জন ইতিহাসাগরাগী ব্যক্তি ছাড়া অল্প কাহারও জানা আছে কিনা সন্দেহ। রামপ্রাণ চ বা তাঁহারও বেশী ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতার বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলিতে তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির হু একটির মাত্র সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সবকয়টি গ্রন্থ একত্রে পাওয়া যায় না। রামপ্রাণ যে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক ছিলেন তাহা নহে; ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদান কিছুই নাই। তাঁহার সময়ে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুসরণে রামপ্রাণ ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন; মূলগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য তিনি ইংরাজি ভাষায় অল্প বাঙালী পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফল তিনি আমাদের অগ্রগাঠ।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে বিখ্যাত মুন্সীবাংশে রামপ্রাণের জন্ম হয় (৯ ই ফাল্গুন, ১২৭৪ সাল)। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণপ্রাণ গুপ্ত। রামপ্রাণের পূর্বপুরুষ গিরিধর মুন্সী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে রংপুরে চিনির কুঠির দেওয়ান ছিলেন। যখন তাঁহার-বয়স আড়াই বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন হইতে তাঁহার মাতাই ছিলেন একমাত্র অভিভাবিকা। রামপ্রাণ আজন্ম রুগ্ন ছিলেন, স্বাস্থ্য-দোর্বল্যই ছিল তাঁহার প্রধান রোগ। তিনি বেশী পরিশ্রম করিতে

রামপ্রাণ গুপ্ত সম্বন্ধে সকল তথ্য তাঁহার পুত্র শ্রীমোহনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি।

পারিতেন না। প্রবেশিক। পরীক্ষার সময় প্রথম বৎসর অন্তঃস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার তিনি অঙ্কে ফেল হন। ঐতিহাসে ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পর বৎসর কলিকাতায় আসিয়া Ripon Collegiate School এ ভর্তি হন। এবারও তিনি অঙ্কে পাশ হইতে পারিলেন না। তাঁহার অঙ্ক পত্রের পরীক্ষক তাঁহার এক আত্মীয়কে পরে বলিয়াছিলেন, 'Here is a proof that an essayist cannot be a mathematician.'

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া রামপ্রাণ স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্কুল ত্যাগের পর তিনি চাকুরীর উদ্দেশ্যে কুচবিহারে যান। কুচবিহারে তিনি অল্পকাল থাকিয়া দিনাজপুরে আসেন। সেখানকার কালেক্টরীতে ছই বৎসর চাকুরী করার পর দেশে কিরিয়া আসেন।

রামপ্রাণের পৈত্রিক বিস্তার অভাব ছিল না। তাই তিনি চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরিয়া কেন্দারপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন হইতে স্বীয় ও আত্মীয় স্বজনের কুসম্পত্তি পরিচালনার ভার ছিল তাঁহার উপর। টাঙ্গাইলে বাস করার কয়েক বৎসর পরে তিনি hon. magistrate নিযুক্ত হন। কিন্তু ভাল না লাগায় ঐপদ তিনি ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে রামপ্রাণ সমাজ সংস্কারে মন দেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৩৩৩ সালের শেষভাগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৩৩৪ সালের ২৭শে ভাদ্র তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার সময়কার রাজনৈতিক ভাবধারা রামপ্রাণকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বঙ্গবাসী ও সঙ্গীতবী পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিতেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সাগ্রহে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার মতামত উল্লেখযোগ্য :—

“আমি বঙ্গভঙ্গের অত্যন্ত বিরোধী ছিলাম। স্বদেশী আমার প্রাণের বিষয়। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব হইতে আমি বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।.....হাটে হাটে, গ্রামে গ্রামে, বকুতা করিয়া বেড়াইতাম। দেশী তাঁতী ও জোলা দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য নানা প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলাম। Fly Shuttle এবং রেকার প্রচলনের

জন্ম অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম।.....বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী Liberal Partyকে আপনাদের অস্থূল বিবেচনা করিতেন, এবং জাহাদের সাহায্যে উন্নতি লাভের জন্ম আশাবিভ ছিলেন। এই সময়ে সে জুল ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা দল এই সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদল পূর্ববৎ আন্দোলন এবং একতা ও উচ্চশিক্ষা উন্নতির উপায় বলিয়া ধরিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরাজের আশুক্য লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হন, অস্থূল রাজনৈতিক আন্দোলন নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বৈদেশিক জিনিষের তথা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বয়কট আপনাদের মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন। শেষোক্ত দল হইতেই anarchist দল উদ্ভূত হয়।.....এই প্রসঙ্গে আমি গান্ধী আন্দোলন সম্বন্ধে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হুই রাজার বৎসর অবধি ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্মমূলক নীতি প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ পূর্ণনাত্রায় রহিয়াছে। আমাদের দেশেও কত মহাপুরুষ (অহিংসা) নীতি প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু হামরা হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাই নাই।

Mass হিংসা বিদ্বেষ ক্রোধশূন্য হইবে একপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। non-co-operation মহা অজ্ঞ। যদি শিক্ষিতগণ non-co-operation করেন তাহা হইলেই কাজ হইতে পারে। non-co-operation করিতে হইলে যে প্রকার একতা এবং স্বদেশ হিতৈষণা আবশ্যিক তাহা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এখনও জন্মায় নাই। আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষিতগণ মহাত্মা গান্ধীর নামের জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা ওকালতি, চাকুরী, উপাধি এবং স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দু মোসলমানের সংঘর্ষন আবশ্যিক। এজন্য হিন্দুর হায়া মোসলমানেরও স্বদেশপ্রীতি থাকা আবশ্যিক। Pan-Islamism মোসলমানের স্বদেশপ্রীতির পরিপন্থী। বর্তমান reform যে কিছু প্রকৃত অধিকার দিয়াছে তাহা পরিচালন উপলক্ষে একতা স্বদেশহিতৈষণা ও স্বার্থত্যাগ বিকাশ লাভ করতে পারে। যদি এই একতা স্বদেশহিতৈষণা ও স্বার্থত্যাগ উপহিত হয়

তবে ঐ সামান্য ক্ষমতার পরিচালনাই গবর্ণমেন্টে কাবু হইবেন এবং স্বরাজ-
লাভের পথ প্রশস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।”

কুচবিহারে থাকাকালীন রামপ্রাণের ইতিহাস সাধনা আরম্ভ হয়।
দিনের অধিকাংশ সময় তাঁহার কাটিত কুচবিহারের সাধারণ পাঠাগারে।
এই সময়ে তাঁহার লেখা ‘সিপাহী যুদ্ধকালে কলিকাতার অবস্থা’ শীর্ষক
প্রবন্ধটি ‘স্বকথা’ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকায় রিয়াজ-
উস-সালাতিন সম্বন্ধে অক্ষয় মৈত্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি
পাঠ করিয়া রামপ্রাণ ফারসী গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করিবেন স্থির
করেন। ছই জন মোলবীর সাহায্যে তিনি রিয়াজের বঙ্গানুবাদ করিতে
সমর্থ হন। ইহার কতকাংশ ঐতিহাসিক চিত্র নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত
হয়। হঠাৎ ঐ পত্রিকার প্রচার বন্ধ হওয়ায় সেই সময়ে সম্পূর্ণ অনুবাদটি
প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। রামপ্রাণ গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখিয়াছেন,
“রিয়াজের অনুবাদ কালে অক্ষয় বাবু সর্বদা পত্রাদি লিখিয়া আমাকে নানা
প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন। বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস প্রণেতা
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃ প্ররুত হইয়া প্রথম অংশের টীকা সংযোগ
করেন।”

‘রিয়াজ’ অনুবাদ করিবার সময় তাঁহার মনে চেলিস্ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ
সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে। রামপ্রাণ তাহাদের জীবনী পাঠ করেন। তাহারপর
ঢাকা-কলেজ লাইব্রেরীতে বাবরের আত্মচরিত পড়িবার সুযোগ পান।
তখন তিনি তাঁহার অশ্রুতম রচনা মোগলবংশ লিখিতে আরম্ভ করেন।
এই গ্রন্থটির অনেকাংশ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য
পত্রিকার নিয়ম ছিল, যে প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা
পত্রিকায় সর্বপ্রথম স্থান পাইত। সম্পাদক মুরেশ চন্দ্র সমাজপতি চেলিস্
খাঁ নামক প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। লেখক তাহাতে
বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলেন। মোগলবংশের বৈশিষ্ট্য এই যে
উহাতে লেখক কেবলমাত্র মোগল সম্রাটগণের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াই ক্ষান্ত
হন নাই; বার্ণিয়ে, মান্রিক, ও মাহুসির বিবরণীয় সাহায্যে মোগল যুগে
ভারতবাসীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন, এবং

পরিশেষে আবুল ফজল, বদাউনি প্রভৃতি কায়সী ঐতিহাসিকগণের জীবনী ও তাহাদের রচিত গ্রন্থের তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জুড়িয়া দিয়াছেন।

‘আরতি’ নামক পত্রিকায় রামপ্রাণের লেখা ‘দেবলাদেবী’ ও ‘অটোমান সাম্রাজ্য’ এই দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের তাগিদে তিনি মহম্মদের জীবনী লেখেন। ইহার প্রথমার্ধ ‘আরতি’ ও শেষার্ধ নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর তাক্সা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। রামপ্রাণ লিখিয়াছেন, “হজরত মহম্মদ আমার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।”

মহম্মদের উত্তরাধিকারগণের সম্বন্ধে তাঁহার রচনা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই, প্রবন্ধটি প্রবাসীতে স্থান পায়। খলিফাগণের ইতিহাস করেকটি প্রবন্ধের আকারে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এইভাবে ইসলাম কাহিনীর জন্ম হয়। ইহার পর ‘মোগলবংশের পূর্ববর্তি রূপে পাঠ্যরাজকৃত’ রচনা করেন। এইরূপে ইসলামধর্মের উত্থান হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবধি ভারতবর্ষের ইতিহাস রামপ্রাণ তাঁহার বিভিন্নগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

রিয়াজের বঙ্গানুবাদ ছাড়া তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে ‘মোগলবংশ,’ ‘প্রাচীনভারত,’ ও ‘প্রাচীন রাজমালা’। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনুরোধে রামপ্রাণ প্রাচীন ভারত রচনা করেন। ইহা বৈদেশিক পণ্টকগণের বিবরণী অবলম্বনে রচিত প্রাচীন ভারতের সত্যতার ইতিহাস। ‘প্রাচীন রাজমালা’ প্রাচীনভারতের sequel’ রূপেই রচিত হয়। ‘প্রাচীন রাজমালা’ ভূমিকায় রামপ্রাণ লিখিয়াছেন, ‘প্রাচীন গ্রীক রোমকগণ রাজ্যবিবরণ রচনায় অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ আপনাদের রাজবৃত্তান্ত মূলক পুরাণ শাস্ত্র অলৌকিক ঘটনারাশিতে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এইসকল বৃত্তান্ত হইতে সত্য উদ্ধার অতীব দুষ্কর ব্যাপার। এখনও উপাদান সংগ্রহ হইতেছে, তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া সম্যক রাজ্যবিবরণ রচনা করিবার সময় অভাপি আইসে নাই। কেন না একসময়ে যে তথ্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় অল্প সময়ে তাহাই আবার অভিনব প্রমাণেব আবিষ্কারে ও বিচারে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।’

রামপ্রাণের রচিত গ্রন্থকয়টি সাধারণ পাঠক ও ঐতিহাসিকদের নিকট

বিশেষ সমাদর পাইয়াছিল। Indian World (July 1906) ও Calcutta Review (April 1906) এই দুই পত্রিকায় রিয়াজের বঙ্গানুবাদের প্রশংসা সূচক সমালোচনা বাহির হয়। গ্রন্থটির পরিচয় দিতে গিয়া অক্ষয় নৈত্রী লিখিয়াছেন, “বঙ্গাঙ্গার ইতিহাস নাই। যাহা কিছু বঙ্গাঙ্গার ইতিহাস নামে পরিচিত তাহার অধিকাংশই বঙ্গালীর লেখনীপ্রসূত নহে। যাহা বা বঙ্গাঙ্গার লেখনীপ্রসূত তাহাও বিদেশীয় লেখকবর্গের চর্কিত চর্কণ মাত্র। গুপ্তন্যায় রিয়াজের সরল বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সবিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।” “প্রাচীন রাজমালা” সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, “(রামপ্রাণ বাবু) কেমন করিয়া যে ময়মনসিংহের মফঃস্বলে বসিয়া এত বই ও মালমসলা সংগ্রহ করিলেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। চীনদের, তিব্বতীদের তামিলদের ও এশিয়ার অন্যান্য জাতিরও সাহিত্য চাইতে তিনি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিদেশেরা যে এক একটি বিষয়ে নানামত প্রকাশ করিয়া থাকেন সেরূপ নানামত রামপ্রাণ বাবুর নাই। যে মতটা খুব যুক্তি যুক্ত তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসটা একটানা বহিয়া গিয়াছে। উহাতে সব খবর আছে অথচ পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না।”

ইতিহাসের প্রতি রামপ্রাণের গভীর অহুরাগ ছিল। কলিকাতায় কোন এক পুরাতন পুস্তকালয়ের মালিকের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন পুরাতন পুস্তকের সন্ধান পাইলেই তিনি সম্ভব হইলে তাহা টাঙ্গাইলে আনাইতেন। ভারতের নানাস্থান হইতে বহুমূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলে গৃহদাহের (১৩ই চেত্র, ১৩২৫) সমরু তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়।

মোগলবংশ, প্রাচীন রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে কি পরিশ্রমই না করিতে হইয়াছিল। প্রথমত মফঃস্বলে থাকার দরুন একস্থানে সব গ্রন্থগুলি একত্রে পাওয়া সম্ভব হয় নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে। রামপ্রাণ ইহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন গ্রন্থ অভিমত সহকারে পাঠ করিয়া তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং তারপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত সেগুলিকে সাজাইয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইয়াছে। রিয়াজের ভাষার সহিত বাঙালদের পরিচয় আছে

তাহারা সহজেই অহুমান করিতে পারিবেন, যে গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করা কত কঠিন। রিয়াজের বঙ্গানুবাদ বাংলার ইতিহাসে রামপ্রাণের শ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রচলিত অর্থে রামপ্রাণ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা প্রবেশিকাতে দুইবার চেষ্টা করিয়াও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে এই ব্যর্থতা তাহার উদ্বল ও অসম্বন্ধিত্বকে দমিত করিতে পারে নাই। তাহার অধিকাংশ সময় ও অর্থ তিনি ইতিহাস সেবায় ব্যয় করিয়াছেন। রামপ্রাণ আত্মকথায় লিখিয়াছেন, “অনেকে যশ এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষায় বই লিখিয়া থাকেন, আমার ভাগ্যে অর্থলাভ ঘটে নাই। কিন্তু আমি প্রচুর প্রশংসা পাইয়াছি।” ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় রামপ্রাণ তাহাতে ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে বাংলা দেশের ইতিহাস লইয়া রচিত কোনও প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে লেখককে রামপ্রাণ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

রামপ্রাণ গুপ্ত রচিত পুস্তকাবলী

- ১। প্রাচীন ভারত ৪১৮ পৃষ্ঠা, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা, ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাস।
- ২। প্রাচীন রাজন্য। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩০১, ৬১৭ পৃষ্ঠা।
- ৩। হজরত মহম্মদ।
- ৪। ইসলাম কাহিনী।
- ৫। পাঠান রাজবৃত্ত।
- ৬। যোগল বংশ। ৫১৬ পৃষ্ঠা, ১৩১১।
- ৭। রিয়াজ-উন্-সালাতিন—১৩১২—৩১৫ পৃষ্ঠা।
- ৮। ভারত মলনা—ভারতনারীর গৌরববয় কাহিনী।
- ৯। ঐতিহাসিক সন্দর্ভ—ভারত ইতিহাসের সমালোচনা।

তত্ত্বাবোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্ৰীদিলীপকুমার বিশ্বাস

(পূৰ্বাংকুতি)

বাঙলা ভাষায় ভারতবৰ্ষের পুৰাতত্ত্ব আলোচনার পথপ্রদৰ্শক যে তত্ত্ব-
বোধিনী সভা একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। এবিষয়ে সভার মুখপত্ৰ
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অবদান অসামান্য। ঐ পত্রিকার ১৭৭০ শকের
আৰম্ভ সংখ্যায় আবেগময়ী ভাষায় যা বলা হয়েছে তা উক্ত প্রসঙ্গে সভার
মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, ১ "বিদেশী পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদ-
কারিণী হুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রত্নিয়াছেন, আর
আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না, সে যে
কি ছলভি অমূল্য রত্নাকর তাহার অহুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না।
...ইহায়া পৰ্যবেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন কিন্তু স্বদেশের পুৰাতত্ত্ব
সন্ধান করা উচিত বোধ করেন না। ইউরোপবর্ষের অহুঃপাতি কোন
দেশের কোন স্থানে কি নগর? কোন বৎসর তাহা নির্মিত হইয়াছে? তাহা
তাঁহার দিগের সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনাদিগের এই
জন্মভূমির তরুণ বিবরণ জানিবার জন্ত কত ব্যক্তি সচেষ্টি হইয়েন?...আমার
দিগের কি মূল? পূৰ্বে কোন সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল?
কিরূপ ধৰ্ম ছিল? কি কি বিজ্ঞা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে
'ভারতবৰ্ষের' পুৰাতত্ত্ব কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে, কি
আন্বেষণের বিষয় ইহাও জানিবার জন্ত কেহ অগ্রসরী নহেন। ঐকি (গ্রীস)
রোম, জাপান, জৰ্ম্মেনি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক
ইতিহাস সামান্যতঃ কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোনদিন কোন গ্রন্থকৰ্ত্তা তদ্বিষয়ে
বিশেষ অহুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন ইহা জানিবার
জন্ত তাঁহারা কত উৎসাহী। নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থলওয়ালের

গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্ত কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব জানিবার জন্ত কে অভিশাপ করে? এসিয়াটিক রিসার্চ ও এসিয়াটিক সমাজের জার্নেল এন্ড কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইরূপে এসিয়া ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে যে কত চেঁচা চইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?" (প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে ও সমগ্র ঊনবিংশ শতকে প্রাচ্যবিজ্ঞা ও প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের কৌতূহল আকৃষ্ট হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হ'ল। এর উদ্দেশ্য ছিল এসিয়ার পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে অহসন্ধান। সেই সময় থেকে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সাংস্কৃতিক সমাজ সোৎসাহে প্রাচ্যবিজ্ঞানশীলন আরম্ভ করেন। এই যুগে এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ছিলেন মূল্যতঃ শাসক ইংরাজ গোষ্ঠীভুক্ত। সোসাইটির মাধ্যমে এঁদের কার্যকলাপ ভারতের অতীত সভ্যতার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছিল সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য্য, তাঁদের এই অহুশীলনের মূলে নিছক জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছাড়া কতকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষীয়-গণের মধ্যেও পুরাতত্ত্ব চর্চার একটি ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠতে দেখা যায়। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কৃতিত্ব কিছু স্বীকৃতি পেয়েছে।) কিন্তু বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমষ্টিগতভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাই যে প্রথম ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনা শুরু করেন, এ'সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সম্যক অবহিত বলে মনে হয় না।^{১২} ভারতীয়

১। রাজা রামমোহন ফরাসী এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নিবাচিত হন। রাজা রাধাকান্ত 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধান সংকলনের জন্য বেশ বিদেশে সম্বাসিত হয়েছিলেন।

২। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ডাঃ কালীকৃষ্ণ দত্ত তাঁর কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ভারতীয় নবজাগৃতি বিষয়ক পুস্তকে "অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির আবিষ্কার" বিষয়ক অধ্যায়ে তত্ত্ববোধিনী সভার নামোচ্চারণ কর্তব্য করেন নি (দ্রষ্টব্য K. K. Dutta—Dawn of Renascent India pp 49-72)। অথচ তত্ত্ববোধিনী যুগের এই বিশেষত্বটি বহু পূর্বেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (দ্রষ্টব্য তাঁর History of the Brahmo Samaj vol I pp 92-93)। যদিও এই প্রসঙ্গে "ইউরোপে পুরাতাত্ত্বিক ভারতবিষয়ক গবেষণা চলু হবার আগেই তত্ত্ববোধিনী সভা বাঙলাদেশে তা প্রবর্তন করেছিল,"—শাস্ত্রীমহাশয়ের এই উক্তি ঠিক নয়।

পণ্ডিতগণের পুরাতাত্ত্বিক আলোচনার পিছনে ছিল ভারতসংস্কৃতির স্বরূপটিকে আবিষ্কার করে তার আলোকে জাতিকে আত্মসচেতন করবার বাসনা, জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তিকৃমি নির্মাণ করবার প্রয়াস। এখানেই তাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য-ভারততত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য। তত্ত্ববোধিনী সভার ভারততত্ত্ব আলোচনার মধ্যেও এই আত্ম আবিষ্কারের প্রেরণা পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হয়েছিল। সভার আলোচ্য পুরাতাত্ত্বিক বিষয়গুলির মধ্যে অচ্ছতম প্রধান ছিল বৈদিক সাহিত্য। সে যুগে প্রথমদিকে বেদ উপনিষদকে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি মনে করা হত। বেদ বেদান্তের অজ্ঞানতায় বিশ্বাস পরিত্যক্ত হ'বার পরেও ব্রাহ্মসমাজে ধর্মের সঙ্গে বেদ উপনিষদের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিত হয়নি। বাঙলা দেশে বৈদিক সাহিত্যের চর্চা উত্তমরূপে প্রবর্তন করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রমানাথ ভট্টাচার্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য এবং তারকনাথ ভট্টাচার্য, মোটে এই চারজন ছাত্রকে বেদাধ্যয়নাধী হিসাবে বৈদিক শিক্ষার কেন্দ্র কাশীতে প্রেরণ করেন।^১ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বেদ স্বয়ং তিনবার জ্ঞাত এবং তার মধ্যে পরা ও অপরা বিভাগ বিষয় কি কি তা নির্ণয় করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাশী গিয়েছিলেন।^২ কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি সমূল ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ১৭৬৯ শকের (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ) কাক্তন সংখ্যা থেকে ১৭৯৩ শকের (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সর্বসমেত ১২৪৮ টি শ্লোকের অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর কামটি শেষ পর্যন্ত যদিও সমাপ্ত হয়নি তথাপি বাঙলা ভাষায় ঋগ্বেদ অনুবাদের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথই যে পথপ্রদর্শক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।^৩ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে

১। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ: ১০৮-০৯

২। ঐ পৃ: ১৩২-৩৫

৩। আত্মজীবনের বিষয় ত্রিখণ্ডেণচন্দ্র বাগল তাঁর দেবেন্দ্রনাথের জীবনী পুস্তিকায় দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্রপ্রচার আলোচন্য-প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ঋগ্বেদ অনুবাদের বিষয় উল্লেখ পর্বত করেননি। (দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ চাকুর—সাহিত্য সাধক চরিতমালা পৃ: ২৫-২৬)

রাজনারায়ণ বসু কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে এবং ঐ কার্যের জন্য বসু মহাশয় মাসিক ৬০ বেতনে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক নিযুক্ত হ'ন। ১১ তাঁর ঈশ, কেন, কঠ, হুগল ও ষেতাশ্বতর উপনিষদের অনুবাদ উক্ত প্রকাশনা পেয়েছিল। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা ও প্রচারের রামমোহন প্রবর্তিত ধারাটি এইভাবে তত্ত্ববোধিনী সভা অঙ্কুর রাখেন। প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ও এ কাব্যটি সমাপ্ত করেন নি; শেষ পর্যন্ত উক্ত মহাকাব্যের উপক্রমণিকা ভাগ মাত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল। সুখের বিষয় ছ'জন বাঙালী মনোবী তত্ত্ববোধিনী যুগে দেবেন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাগর কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অমূল্যরূপে পরবর্তীকালে সমগ্র অশ্বমেধ ও মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল। এঁরা হ'লেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। ক্ষেত্রোক্ত জন তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে কিছুকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং বাঙালীর ও বাঙলা সাহিত্যের এই দু'টি বিরাট কীর্তির গোড়াপত্তন যে তত্ত্ববোধিনী যুগে এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। রমেশচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন উভয়েই অকৃচ্ছিত পূর্ব সূরীদের স্বর্ণ স্বীকার করে গিয়েছেন। রমেশচন্দ্র তাঁর অশ্বমেধের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় দৃষ্টি করে বলেছেন “অনেকদিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের একটি হৃদয় অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর শেষ হইল না।” কালীপ্রসন্ন মহাভারতের অনুবাদকার্যে বিজ্ঞানাগরের প্রেরণা ও সহায়তা সম্পর্কে উল্লেখিত উল্লেখ করেছেন। ২ পুরাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী যুগের অপর যে নায়কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি জীৱনকমলকুমার দত্ত। “ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়” (দুই খণ্ড) এবং “প্রাচীন হিন্দু দিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার” এই দুইখানি গ্রন্থ এবিষয়ে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রথম গ্রন্থখানি বাহ্যতঃ H. II. Wilson-এর সুবিখ্যাত Sketch of the

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পৃ: ৫০—৫১

২। ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীপ্রসন্ন সিংহ (সাহিত্যসাধক চরিতমালা পৃ: ৩৬-৩৭)

Religious Sects of the Hindus পুস্তক অবলম্বনে রচিত হ'লেও তার হুবহু অনুবাদ নয়। অনেক স্থলেই অক্ষয়কুমার Wilson-এর মত সমালোচনা ও ভ্রম সংশোধন করেছেন এবং তিনি কিছু কিছু নতুন উপকরণ এবং তথ্যও বাঙালা সংস্করণে সংযোজন করেছেন। ফলে এখন পর্যন্ত ভারত-বর্ষের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুর নিকট গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য।

ঐখানির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পূর্বেই অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ অক্ষয়কুমারের নিজস্ব গবেষণার ফল। সে সময়ে উক্ত বিষয়ের চর্চা দেশে কি বিদেশে - স্বল্প একটা আরম্ভ হয়নি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একেত্রে ধারা আলোচনা শুরু করেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এতদিন পরেও তাঁর গ্রন্থ সম্পূর্ণ পুরাতন হয়ে যায়নি যদিও বর্তমান কালে উক্ত প্রসঙ্গে তাঁর নাম উল্লিখিত বা স্বাধীন স্বীকৃত প্রায়ই হয় না। স্বতন্ত্র ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে গ্রন্থটির অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার অগ্রপ্ৰেরণাজাত পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার এখানেই শেষ নয়। বস্তুতঃ এ' আমলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে প্রাচ্য বিজ্ঞাবিষয়ক কোনও পত্রিকা বলে ভুল হ'বার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ ভাবে এর পৃষ্ঠায় সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু শ্রুতি শাস্ত্র, প্রাচীন ভারতবর্ষের নদী বন পর্বত মালার বিবরণ, পুরাণের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকতা, ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার প্রভৃতি অগণিত বিষয়ে মূল্যবান ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এই ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধিৎসার পশ্চাতে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিজ্ঞানাগর, প্রভৃতির উচ্চম হাড়াও বীর মঙ্গল প্রভাব গভীর ভাবে কার্যকরী হয়েছিল তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বৃদ্ধ বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এশিয়াটিক সোসাইটির মতই তত্ত্ববোধিনী সভার পাঁচজন গ্রন্থাধ্যক্ষ বিশিষ্ট একটি গ্রন্থসভা ছিল। বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু' জামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, জীধর দ্বায়রত্ন, প্রভৃতি এই সভার সদস্য হয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার সুদীর্ঘকাল গ্রন্থ সম্পাদকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থসভার অধিকাংশ সভ্যের অগ্রমোদন ভিন্ন কোনও রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে

প্রকাশিত হবার উপায় ছিলনা। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৭০ সালের আয়ব্যয় স্থিতির হিসাবে মুখবন্ধ স্বরূপ গ্রন্থসভার সভ্যগণের, বিশেষতঃ গ্রন্থসম্পাদকের কার্যের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।^১ “কেবল গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের যত্ন ও উৎসাহে এবস্ত্রকার নানাবিধ হিতকর বিষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতেছে,.....গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের সভার কার্যের উন্নতিপক্ষে যে প্রকার উৎসাহ ও যত্ন এবং পরিশ্রম ইত্যাদি তাঁহাকে এখানে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সভার পরম সৌভাগ্য যে এমত গ্রন্থসম্পাদকের উৎকৃষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন।” এই স্তব প্রচেষ্টা ফলস্বরূপ হ’তে বিলম্ব হয়নি। তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় স্বদেশের অতীত সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা জাতীয় সভ্যতার মহত্ব সম্পর্কে দেশবাসীকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তুলছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে জাতীয় জীবন চর্চার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করবার কৃতিত্ব তত্ত্ববোধিনী সভা অনেক খানিই দাবী করতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ দেশীয় সব কিছুর প্রতি একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল।^২ এই তাজিল্যের হাত থেকে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও রক্ষা পায়নি। তত্ত্ববোধিনী সভা যেমন “এদেশের প্রাচীন জ্ঞানসম্পত্তির” প্রতি মুখ ফেরায়েল তেমনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর অন্ধা কিরিয়ে আনবার ক্ষণও বন্ধপরিকর হলেন। সভার সভ্যগণের মধ্যে দেবেশ্রনাথ, অক্ষয় কুমার, দৈবচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর, রাক্ষসলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র,

- ১। তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৭০ শকের সাধারণিক আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক : ভূমিকা পৃঃ ৩; শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্রবর্তী তাঁর দেবেশ্রনাথ-জীবনীতে এই গ্রন্থসভার কর্মপদ্ধতির একটি লক্ষ্য চিত্র দিয়েছেন (জ্যৈষ্ঠ্য : মহর্ষি দেবেশ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৭৭-৭৯) ; অনেক সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশার্থ রচনা নির্বাচন ব্যাপারে দেবেশ্রনাথের সঙ্গে গ্রন্থাধ্যক্ষগণের মতভেদ ঘটত। একটি পত্রে দেবেশ্রনাথকে এতদ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় (জ্যৈষ্ঠ্য : মহর্ষি দেবেশ্রনাথের পত্রাবলী পৃঃ ১০-১১)।

- ২। দিবনাথ শাস্ত্রী—রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য পৃঃ ১৯৪-৪৫

রাখালদাস হালদার প্রভৃতির কৃতিত্ব এবিধে অনন্তসাধারণ। বাঙলা ভাষা এদের নিকট কি অসীম আঁকার বস্তু ছিল দেবেন্দ্রনাথের উক্তি থেকে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৭৮২ শকাব্দের ২৫শে মাঘ দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্রে বলছেন।^১ “তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।” রাজনারায়ণ বাবুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের অষ্ট একটি পত্রের অংশ : ২ “জ্ঞানেন্দ্র বাবু ও ত্রিষ্টিয়ান হইয়াছেন, এষ্টকণে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা করিবার সাধ মিটিবে। পূর্বে আমার নিকট তিনি একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহার এই অসম্ভব প্রস্তাবে অস্বীকার হওয়াতে যদিও পূর্বে পূর্বে কখনও ব্রাহ্মধর্মের কথা কহিতেন, সেই অবধি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন।” ব্যক্তিগত জীবনেও দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত কাষে বাঙলা ভাষার প্রতি এই আস্থা ও অনুরাগ প্রকাশ পেল। তাঁর এক জামাতা তাঁকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লেখায়, তিনি সে পত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।^৪ তত্ত্ববোধিনী যুগে মাতৃভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম আস্থা ও অবিচলিত অনুরাগকে স্বদেশানুরাগেরই অঙ্গরূপে গণ্য করা হত। পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় এই মনোভাবের আরও স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।^৫ “আমাদিগের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কোন ইংরাজ স্কেনেচ অথবা জরমেন ভাষায় পত্র লিখেন? কোন ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে স্কেনেচ অথবা জরমেন ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন?... এমনকি আমরা সামান্য কথোপকথনে বার আনা ইংরাজী ও চারি আনা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত) পৃ: ৩০

২।

ঐ-পৃ: ৪১

৩। দেবেন্দ্রনাথের পিতৃব্যপুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্র বোহন ঠাকুর

৪। অজিত কুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৪৬৭

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৮ শক “স্বদেশানুরাগ” পৃ: ২৭-১০২

করিয়া থাকি।...যে তাব একটি বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা অনার্যাসে প্রকাশ করা যাউতে পারে তাহার পরিবর্তে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া আত্মভাষায় প্রতি বিরোধোচ্চারণ করা উচিত নহে।...সকল বিষয়ে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া আমরা মাতৃভাষায় কেন অবমাননা করিয়া থাকি? প্রকৃত স্বদেশাত্মরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।” অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার, অনঙ্গমোহন মিত্র প্রভৃতি একদল উৎসাহী ব্রাহ্ম সংস্কৃত মন্ত্রের পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজে বাঙলা ভাষায় উপাসনা প্রচলন করবার পক্ষ-পাতী ছিলেন এবং রাখালদাস হালদার এই মর্মে পত্র যোগে দেবেন্দ্রনাথকে অজুরোধ জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজে এঁরা সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙলা ভাষাতেই উপাসনা কার্য নির্বাহ করতেন। এইভাবে ঈশ্বর আরাধনাতেও তত্ত্ববোধিনী যুগে বাঙলা ভাষা স্থানলাভ করেছিল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একটি স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। সভার সভ্যরা অনেককি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এক এক জন দিকপাল; এঁদের সাহিত্যকীর্তি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার এবং বিভাসাগর বাঙলা গল্পকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন এ কথা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। ২ প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা সাহিত্যে প্রথম চলতি ভাষায় উপস্থান লেখেন এবং সহস্র সরল বাঙলা রচনারীতি প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্যে রাখানাথ শিকদারের সঙ্গে একযোগে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ‘মাসিক পত্রিকা’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সুতরাং তথাকথিত সাধু ও তার প্রতিক্রিয়ারূপ তথাকথিত চলিত বাঙলা-গল্প-রচনা রীতি তত্ত্ববোধিনী যুগেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

১। অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ২৪২—৪৩

২। অক্ষয়কুমার ও বিভাসাগর তাঁদের সাহিত্যকীর্তির অল্প স্বীকৃতি পেলেও এক্ষেপে দেবেন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে আমরা ভেদন সচেতন নই। স্থলের বিষয় দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা ক্রমশ: স্বীকৃত হতে আরম্ভ করেছে। ব্রজেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ: ৭২৪—৪০, মনোমোহন ঘোষ-বাংলা গল্পের চার যুগ পৃ: ৮২—৯২; বাণেশ্বর-বাঙলা সাহিত্যের একদিক পৃ: ১০১-১৩

সম্পন্ন নাই। ‘হতোম প্যাচার নক্সা’র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ এই চলিত রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”র জন্ম বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমরীয় ঘটনা। প্রথম বার বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত এর সম্পাদক ছিলেন। পরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সম্পাদক হন। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়সমূহে বাঙলা ভাষায় যে জ্ঞানগর্ভ অথচ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করা যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নিকট তা প্রমাণ করেছিল। সচিত্র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারেও এই পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় পথিকৃৎ এর প্রযত্নে বাঙলা ভাষা সকল রকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়ে শৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে উঠল। বাঙলার যে ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় দ্বণ্ডায় দেশীয় সংবাদপত্র ছুঁতেন না তাঁরা পর্যন্ত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।^১ রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ইংরাজীভাষায় লিখিত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এই পত্রিকা সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা অমরীয় : “People all over Bengal awaited every issue of that paper with eagerness... Discoveries of European science, moral instructions, accounts of different nations and tribes, of the animate and inanimate creation, all that could enlighten the expanding intellect of Bengal and dispel darkness and prejudices found a convenient vehicle in the Tattwabodhini Patrika.”^২ কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর এই কৃতিত্ব ও প্রভাবের মূলে সম্পাদক অক্ষয়কুমার প্রমুখ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং প্রতিভা থাকলেও, একে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত সাফল্য আখ্যা দেওয়া চলেনা। যে সমষ্টিচেতনা সর্বক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শবাদ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎসাহ করেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা তারই পরিচয়

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রানতল্লা সাহিত্য ও ভাষাকালীন বঙ্গসমাজ পৃ: ১১২-২০০

২। R. C. Dutta—The Literature of Bengal, pp 172-73

পাই। এই কারণেই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ অত্যল্পকালের মধ্যে বাঙলা দেশে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। “এর প্রতিক্রিয়া বা অনুরোধে উৎপন্ন একাধিক সাময়িক পত্র পত্রিকা ও পুস্তক বাঙলা গজের উন্নতি বিধানে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানকল্পদ্রুম (১৮৪৬); উপদেশক (১৮৪৭) সত্যার্থব (১৮৫০) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬) সোমপ্রকাশ (১৮৫৮) রহস্যসম্ভর্ষ (১৮৬৩) বামাবোধিনী (১৮৬৩) আদির নাম উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনীর একুপ বিস্তৃত প্রভাবের ক্ষুদ্র এই পত্রিকার আবির্ভাব কাল (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শনের আরম্ভকাল (১৮৭২) পর্যন্ত সময়কে বাঙলা গজের তত্ত্ববোধিনী যুগ নাম দেওয়া যেতে পারে।^১ ভেবে দেখলে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের এই মত বুদ্ধিবৃত্ত মনে হয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে প্রতিষ্ঠানের এতটা গর্ববোধ তার পক্ষ থেকে যে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ১৭৭১ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখা যায়, বাঙলা ভাষা শিক্ষাদানে সরকারী ঐনসীমতের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এর অংশবিশেষ উদ্ধৃতির যোগ্য।^২ “গবর্ণমেন্ট হইতে এ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা শিক্ষার কোনও উপায় হইল না। সংবাদ-পত্র সুস্পাদকেরা যত চাঁৎকার করুন কিছুতেই তাঁহারা সচেতন হয়েন না। এক্ষণে হিন্দুকলেজে বাঙ্গলা শিক্ষার নিয়ম আছে বটে, সে নামমাত্র নিয়ম। তথায় পাঠের লুপ্তলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই এবং কেহ তব্বিয়ে তত্ত্বাবধারণও করেন না। বাঙ্গলা শিক্ষা করা আর না করা এক প্রকার ছাত্রদিগের স্বৈচ্ছাধীন।...স্থানে স্থানে যে একশত বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি তাঁহাদেরিগের যেমন বহু তদনুযায়ী ফলোৎপত্তিও হইতেছে।...জেলার ইংরাজি বিভাগের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত বহু বেতনভোগী তত্ত্বাবধারণক নিযুক্ত আছে, কিন্তু ঐ একশত বাঙ্গলা পাঠশালার বিষয়ে তদনুসঙ্গ কি নিয়ম আছে? বরঞ্চ এই

১। মনোমোহন ঘোষ-বাংলা গজের চারযুগ পৃঃ ৮৩

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭১ শব, “বদেশীয় ভাষার বিভাগ্যাস”

প্রকার প্রবাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে ইংরাজি বিদ্যালয়ের তদ্বাবধারক তাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষার ন্যূনতা করিতে পারিলে ক্রটি করেন না।” পরবৎসর তত্ত্বাবধিনি পত্রিকাতে হিন্দুকলেজের তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর এক বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।^১ সেখানেও অভিযোগ করা হয়েছে, হিন্দুকলেজে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার প্রতি সমুচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী না হলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার অধিকতর কাম্য মনে করতেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে তত্ত্বাবধিনি সভার উদ্যোগে ‘তত্ত্বাবধিনি পাঠশালা’ নামক একটি বিদ্যালয়ভূমি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই পাঠশালা হুগলী জেলার বাঁশবেড়ি এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষা এবং বাঙলার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তো ছিলই উপরন্তু খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে প্রদত্ত খৃষ্টধর্ম শিক্ষার প্রতিবেদক হিসাবে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিষয়েও উপদেশ দেওয়া হত। বাঁশবেড়িয়াতে পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার যে বক্তৃতা করেন তার থেকে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বলেন ২ “আমারদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিজ্ঞা তাহা প্রচলিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিবিধ উপায় নুষ্টি হইয়াছে। তদ্বধ্যে পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে...অর্থশ্রেণী থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।” অক্ষয়কুমার বলেন, ৩ “বঙ্গভাষা বিস্তার দ্বারা স্বজাতীয় ধর্মরক্ষার নিমিত্ত যে এইরূপ পাঠশালা স্থাপনকরা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা কাহার না বিদিত হইতেছে? ...আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অভ্যাসের সহ্য করিতেছি, এবং ঐষ্টিয়ান ধর্মের যেকোন প্রাধিকার

১। তত্ত্বাবধিনি পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৭২ শক “হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালী” পৃ: ২২-২৩

২। তত্ত্বাবধিনি পত্রিকা, তাত্র ১৭৬৫ শক পৃ: ৫-৬

৩। তত্ত্বাবধিনি পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৫ শক পৃ: ১১-২

হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জ্ঞানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষেণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যিক হইয়াছে...এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিরাকরণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অর্ন্ত ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।^১ বাঙলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় তত্ত্ববোধিনী সভা সে অভাব পূরণেও ত্রুটি হন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অক্ষয়কুমার পদার্থবিজ্ঞা ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাদৃশ্যসরিক পরীক্ষা' শীর্ষক বিবরণে যা বলা হয়েছে তা স্মরণীয়।^২ "এই পাঠশালাতে পদার্থবিজ্ঞা এবং ভূগোলের উপদেশ-বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক।" পরে দেবেন্দ্রনাথের আহুকূলে ব্যারাকপুরেও একটি পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য কানীশ্বর মিত্র স্মৃতিসাগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটিও দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা থেকে বহিত হয়নি।^২ এ সবার থেকে বোঝা যায় তত্ত্ববোধিনী সভার নীতি ছিল বাঙলা ভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক মর্যাদা দান, ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা করা নয়।

এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ সভাসভার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দুকলেজের শিক্ষা প্রশ্নালীর যে সমালোচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা পাঠ করলে এবিষয়ে ধানিকটা ধারণা লভ্য। উক্ত প্রবন্ধে হিন্দুকলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাস ১৭৬৬ শক পৃঃ ১৪২

২। যোগেশচন্দ্র বাগল-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য সাংক্ চরিত্রমালা)
পৃঃ ৪০-৪১

সেগুলি যথাক্রমে এই : (১) হিন্দুকলেজে গণিত শিক্ষারই প্রাধান্য অধিক, ও সেই অনুপাতে সাহিত্য, ইতিহাস, নীতিবিজ্ঞান, প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে অবহেলা দেখা যাচ্ছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি দুই সমানভাবে মাজিত ও বহিত করা আবশ্যিক। কলেজ কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে মনোযোগী ন'ন; (২) হিন্দুকলেজে “লোকোপকারি শিল্পবিজ্ঞান” বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়না। তার ক্ষয় কলেজের পাঠ্য সাজ হবার পরে ছাত্রগণ জীবিকার্জনের উপায় সহজে খুঁজে পায়না এবং মধ্যবিত্ত পরিবার গুলি হৃদশোণিত হয়; (৩) ছাত্রগণ পদার্থ বিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যা (Physiology) তে উপযুক্ত শিক্ষা পায়না। ফলে তারা স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়না, অল্পবয়সে তাদের শরীর ভেঙ্গে যায়; (৪) কলেজের পাঠ্য তালিকা ত্রুটিপূর্ণ এবং ছাত্রদের উপযোগী অনেক সাম্প্রতিক গ্রন্থই তার অন্তর্ভুক্ত নয়; এবং (৫) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠনে অবহেলা (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)। সুতরাং সভার মতে আদর্শ উচ্চ শিক্ষা কি জাতীয় হওয়া উচিত তার কতকটা আভাস এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার অর্থকর ও সমাজ-কল্যাণকর দিক সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্ত অমৃত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। “শিল্পবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞান লোকযাত্রা বিধান প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের দুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধনসাধন করিতে পারা যায় তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্তব্য। এই সমস্ত সচ্ছিত্তা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না।……যে যে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজসংক্রান্ত সমস্ত বিভাগে তাহার অধ্যাপনা সংস্থাপন করা এবং যাহাতে সর্বসাধারণ তাহা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা করিয়া উন্নয়নকারী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।” উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জন-শিক্ষার প্রতিও এ যুগের চিন্তানায়কগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মতামত কিছু বিস্তারিত ভাবে জানবার সুযোগ

১। অক্ষয়কুমার দত্ত, “বাছ বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” দ্বিতীয় ভাগ (১ম মুদ্রণ) কলিকাতা পৃ: ২-৪

আমাদের আছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে বাঙালার ছোট লাট জন পিটার এ্যাটর্ন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কিতাবে করা সম্ভব এ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর মতামত চান। শেখোক্তাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন। এই আহ্বানের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে সরকারকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।^১ উক্তপত্রে দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে সমসাময়িক পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হতে হবে (to take measures for improving the condition of the indigenous schools already in existence)। কি উপায়ে এই উন্নতি করা যায় সে সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তিনটি প্রস্তাব করেছেন, যথা (১) শিক্ষকগণের আশুশিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ শিক্ষাকার্যে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং তা করবার পরে তাঁরা যাতে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি দ্বারা পুরস্কৃত হ'ন সে বিষয়ে সরকারের নজর রাখতে হবে; (২) ছাত্রগণের মধ্যে সন্দেহাত্মকতার দ্বারা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করতে হবে; এবং (৩) তৃতীয়তঃ উপযোগী পাঠ্য পুস্তক এবং অল্প আনন্দজনক পুস্তক বিতরণ করতে হবে। এই সকল বিভিন্ন বিষয়তঃ নিযুক্ত শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাও দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রে বলেছেন (One additional measure seems to be necessary in the present instance, the establishment of Normal schools for the instruction of teachers employed in the different seminaries)। এই পত্রে দেবেন্দ্রনাথ আরও বলেন জনশিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের যথেষ্ট অভাব আছে এবং বাঙালা ভাষাতে এই সকল পাঠ্য পুস্তক আরও প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণকে তিনি তিন শ্রেণীতে

১) Brajendranath Bannerjee "Debendranath Tagore on Schools for the Masses"—Modern Review December 1928 pp 633-34; প্রবন্ধকার Educational Department Proceedings, October 1860, থেকে দেবেন্দ্রনাথের পত্রখানি উদ্ধৃত করেছেন।

ভাগ করেছেন যথা (১) যারা লিখতে বা পড়তে একেবারেই জানেনা, (২) যারা দারিদ্র্যবশঃ লেখাপড়ায় (সম্ভবতঃ ইচ্ছা এবং অক্ষর পরিচয় থাকলেও) আগ্রহের হ'তে পারেনা ; এবং (৩) লেখা পড়া শেখার ফল অনিষ্টকর হ'বে বলে যাদের আশঙ্কা আছে। তাঁর মতে এই সব অন্তর্বিধা দূরীকরণার্থে তিনি রকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেমন (১) শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যার ফলে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীর জীবিকাকর্মে সহায়তা হবে (প্রথম শ্রেণীর লোক এমন শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে, নিরক্ষরতাকেও আর বড় বাধা বলে মনে হ'বেনা) ; যারা দারিদ্র্যাহেতু শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করতে অক্ষম তাঁদের জন্য বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে ; এবং (৩) পাঠশালা গুলিতে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান কোনও প্রকার ধর্ম শিক্ষাই দেওয়া চলবে না। এর দ্বারা তৃতীয় শ্রেণীর লোকের মন থেকে শিক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আশঙ্কা দূর হ'বে। অবশ্য ধর্মশিক্ষাকে অবাস্তবীয় মনে করলেও জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি শিক্ষাদানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, এই পত্র পড়লে তা বোঝা যায়। যে সকল বিষয়গুলি তিনি এই সকল পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হওয়া মনে করতেন তার একটি ফিরিস্তি তিনি এই পত্রে দিয়েছেন, যথা Reading ; Writing and Correct Spelling ; Elements of Arithmetic and of Mensuration as a branch of arithmetic ; Rudiments of Letter-writing ; Rudiments of Account Keeping agricultural or mercantile ; First principles of Science connected with agriculture ; outline of the law of weights, of persons and of real property in the country ; Elements of Geography and History ; এবং Lessons in Practical Morality. এই পত্রখানি শিক্ষাবিদরূপে বেবেলানাথের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। জনশিক্ষা বাড়ানোর মাধ্যমে হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিলনা। জনসাধারণের জন্য অর্থকরী এবং অবৈতনিক শিক্ষা যে প্রয়োজন একথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। শিক্ষকগণের জন্য বিশেষ শিক্ষার এবং এই উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবও তাঁর পত্রে আছে। শিক্ষকগণের আত্মোন্নতি প্রচেষ্টার পুরস্কার দিতে সরকার যেন কার্পণ্য না

করেন এই অতি দরকারী সতর্ক বাণীটিও তাঁর পত্রে বিজ্ঞমান। সর্বোপরি জনশিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে জড়িত করলে যে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হ'বে এবং একজ্ঞেয়ী লোক ভয়ে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিই বিরূপ মনোভাবাপন্ন হ'য়ে উঠবে, অয়ং ধার্মিক পুরুষ হয়েও একথা সুস্বভাব মত দূর দৃষ্টি তাঁর ছিল। ৬২

সমাপ্ত

৭
- ২ ২৪২

- ১। বর্তমান প্রবন্ধে শিক্ষাসম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে যাতে। পুঁটিনাটি তথ্য সমাবেশের স্থান এখানে নেই। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোক্‌হলী পাঠক প্রিয়োগেশ চন্দ্র বাগলের "শিক্ষাবিত্তারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫০ম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা পৃ: ৬৫-৮৪) বহু তথ্যের সন্ধান পাবেন।

মেদিনীপুরের লবণ-শিল্প

রণজিৎ গুহ

(১)

কোম্পানীর আমলের আদিপর্বে মেদিনীপুরের লবণ শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রায় দুইশত দলিলের সংকলন এই গ্রন্থের প্রকাশ একাধিক কারণেই উল্লেখযোগ্য ।

রমেশচন্দ্র দত্তের কীর্তি বাদ দিলে একথা হয়তো বলা যায় যে বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক প্রতিভা আজও প্রধানত রাজনৈতিক উত্থান পতনের কাহিনী বর্ণনায় সীমাবদ্ধ । এক অর্থে তা আমাদের আত্মবিশ্বস্তিরই আরেকটি লক্ষণমাত্র । তবে অতি সম্প্রতি এই দিক থেকে গবেষণার ক্ষেত্রে যে নতুন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, দেশীয় অর্থনীতি ও সমাজই যে জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সে সত্য যে ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই অগ্রতম নিদর্শন ।

বাংলাদেশের বহু জিলার ধূলিমলিন মহাক্ষেত্রখানায় এই উপাদানের অমূল্য আকর এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে । সম্পাদনা ও প্রকাশনের কাজ যত টুকু শুরু হয়েছিল, রেভারেণ্ড ফার্মিং-গারের মৃত্যুর পরেই তাতে ছেদ পড়ে । বাঙ্গালীদের মধ্যে সেকালে একমাত্র রায়বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ এই উৎস-সন্ধানে জড়ী হয়েছিলেন ; কিন্তু প্রধানত উত্তর-পূর্ব বাংলার মধ্যেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল । এই দিক থেকে একই বৎসরে ডাঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের সম্পাদনায় উল্লিখিত গ্রন্থ ও শ্রী অশোক মিত্রের সম্পাদনায় বীরভূমের দলিল পত্রের প্রকাশ বাংলার ইতিহাস-বিভাগ্য এক শুভ উত্তোগের সূচনা করেছে ।

১ । *Midnapore Salt Papers : Hijli and Tamluk. (1781-1807).*
Edited by Narendra Krishna Sinha. Assistant Editors : Tarit Kumar Mukherjee and Arun Kumar Dasgupta. Published by the West Bengal Regional Records Survey Committee. Price Rs. 7/8/- Sole Agents—Das Gupta & Co. Ltd., Cal—12

পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীরা অনেকেই তাঁদের লেখায় জিলা ও কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের দলিলপত্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে বাঙ্গালীর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনকি হার্টারও এই সমালোচনার উল্লেখ নন। একই বা একই প্রকার উপাদান দিয়ে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক যে ব্রিটিশ আমল্যর চেয়ে কত বেশী বাস্তব সমাজচিত্র অঙ্কন করতে পারেন, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ সিংহ লিখিত ভূমিকাটির সঙ্গে প্রাইসের "নোটস অন দি হিষ্ট্রি অব মিদনাপুরের" লবণ-অধ্যায়ের তুলনা করলে। সরকারী চিঠিপত্র ও দলিল রচনার পদ্ধতি ১৭৭৪ আর ১৭৮১র মধ্যে এমন কিছু বদলায়নি। কিন্তু প্রাইস যেখানে শুধু লবণ ব্যবসায়ের ব্রিটিশ-শাসনের কাহিনীর মধ্যেই রচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, ডাঃ সিংহ সেখানের লবণ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু এই শিল্পের উপর তমলুক ও হিজলীর বহু সহস্র গ্রাম্য শ্রমজীবীর অর্থনৈতিক নিভরতার মর্যাদিক ইতিহাসটুকুও তিনি উপেক্ষা করেননি।

(২)

মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার সমুদ্রসিক্রিত উপকূলভাগ প্রাচীন কাল থেকেই ছিল লবণশিল্পের কেন্দ্র। মেদিনীপুরের তমলুক হিজলী আবার এরই জ্যেষ্ঠ প্রধান। আঠারো শতকের শেষভাগে এই দুই জিলায় প্রায় ৩৫ হাজার, শ্রমজীবী এই শিল্পে লিপ্ত ছিল।

এই শ্রমজীবীদের নাম মলঙ্গী। আলোচ্য দলিলগুলি থেকে দুই প্রকার মলঙ্গীদের কথা জানা যায়—ঠিকা ও আজুরা। হিজলী চাকলায় এমন কোন মলঙ্গীই ছিল না যার জমীর খাজনা বছরে ১৫/১৫/ টাকা বেলি। একখানি দলিলের সাক্ষ্য অস্বায়ায়ী (পৃঃ ১৫৫) খাজনার যার বিধাপ্রতি ৩/ টাকা হিসাবে সবচেয়ে ধনী মলঙ্গীও বড়জোর ৫ বিঘা জমির মালিক। অনেকেরই জমির পরিমাণ মাত্র এক বিঘা বা আরও কম।

তাদের এমনই ছরবস্ত্র যে ঠিকা মেবার পর অগ্রিম টাকাটা কোম্পানী যখন সোনার সিকি আধুলিতে দেবার প্রস্তাব করে, তখন মলঙ্গীরা তা গ্রহণ করতে সবসরি আপত্তি জানালো। তাদের নিঃসবল অস্তিত্বের পক্ষে আর, ব্যয়, ও জীবিকার প্রয়োজনে তামা, বড়জোর রৌপ্যওই, যথেষ্ট। হিজলীর ঠিকা মলঙ্গীরা প্রতিবাদ জানিয়ে আজি পেশ করলো

যে তাদের সমাজে খারা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত তারাও যখন ১৭ টাকার বেশি শাক্সনা দেয় না বছরে, সবচেয়ে ধনী মলাঙ্গীরও খালাড়ি সরঞ্জামী খরচ যখন এক টাকার বেশি নয়, আর যেহেতু প্রতি মাসে “খাওয়া-পরা, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির জন্ত (ধান বা চাল, কাপড়, তৈল, হালুদ, পান, তামাক, শাকসব্জী ইত্যাদি) আমাদের খরচ একআনা, দু’আনা, পনেরো আনা বা বড়জোর একটাকা পর্যন্ত” (পৃ: ৮৯), তখন সোনিয় আর তাদের কাজ কি? এতই নিঃস্ব জীবন যাপন করে তারা যে পাঁচ সাত দশ দিনের হাঁটা পথের মধ্যে সারা চাকলায় এমন একখানা বাজার নাই বা মহাজনী গদী পর্যন্ত নাই যেখানে গেলে সোনিার সিকিটা ডালিয়ে নেওয়া যায়। হিজলীর এজেন্ট চ্যাপম্যানকে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সদরে জানাতে হলো যে, ঠিকা মলাঙ্গীরা স্বর্ণমুদ্রায় অগ্রিম কিছুতে নেবেনা, বরং জোর করে চালাতে গেলে এবছরের মতো কাজ তো বন্ধ হবেই, হয়তো আর কোনদিনই খালাড়িগুলি চালু করা যাবেনা (পৃ: ৮৮)।

এত আদিন দারিদ্র্য যে কেবল কৃষিকর্মে সংসার চলে না, তাই কোম্পানীকে নির্দিষ্ট ভাবে লবণ সরবরাহের ঠিকা নিয়ে গরীব চাষী পরিণত হয় ঠিকা মলাঙ্গীতে।

উৎপাদনের উপকরণ ও যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী ঠিকা মলাঙ্গীদের প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হতো—জনদার ও নাহাদার। মোটামুটি বলা যায় যে জনদারেরা অপেক্ষাকৃত ধনী, উৎপাদনের উপকরণ তাদের বেশি। মিজেদের বলদ লাগিয়ে তারা খালাড়িতে আলানি কাঠ নিয়ে আসে; প্রত্যেক জনদার নিজের সঙ্গে অন্তত একজন সহকারী কারিগর নিয়োগ করে উৎপাদনের কাজ চালায়। কলে, তাদের খালাড়িতে ঠিকা পরিমাণের চেয়ে একটু বাড়তি লবণ তৈরী হয়। জনদারদের মধ্যে যারা আবার আরও একটু বেশি অবস্থাপন্ন, বছরের খোরাকটা তাদের ঘরেই থাকে।

মধ্যম ও নিম্নতম বর্গের ঠিকা মলাঙ্গীরাই নাহাদার নামে পরিচিত। এদের কারোই নিজের বলদ নাই। মধ্যম নাহাদারেরা হয়তো খুব কম মজুরীতে অধিকম কোন বৃদ্ধ বা অতি কিশোর ভৃত্যকে সহকারী নিয়োগ করতে পারতো, গরীব নাহাদারদের পক্ষে তাও সম্ভব ছিল না। দিন আনি দিন খাই করে তাদের সংসার চলে।

মল্যঙ্গীদের নিজেদেরই একখানি আঞ্জির ভাণায়, ১৭৯৫ সালে হিজলী চাকলায় বসি ঠিকা মল্যঙ্গী ছিল তার মধ্যে পাঁচ আনা লোক শুধু জনদার, বাকি এগারো আনাই মাহাদার (পৃ: ৮৯)।

(৩)

এই দরিদ্র মল্যঙ্গীদের উৎপন্ন লবণ ক্রয় করার একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানীর। সাময়িক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাতায়ে ব্যবসাজাত লাভের পরিধিকে অবৈধভাবে বিস্তৃত করার অজ্ঞান নজির আছে কোম্পানীর ইতিহাসে—আলিবর্দীর যুগ থেকে বোম্বেসের আমল পর্যন্ত। কিন্তু দেওয়ানী লাভের বিশ বছর পরেও, ইংরাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সত্ত্বেও যে এই একচেটিয়া কারবারের আইন-সম্মত সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে বে-আইনী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তার বহু কদম্ব উদাহরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুরের লবণ ব্যবসায়। ১৭৮৬ সালের একটা নিলগ্জ স্বীকারোক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ বৎসরে মতেস্বর মাসে রাজস্ব-বিভাগের সর্বোচ্চ দপ্তর বোর্ড অফ রেভিনিউতে আলোচনা হয় বে হিজলী ও তমলুকের ঠিকা মল্যঙ্গীদের একই চারে লবণের দর দেওয়া যায় কিনা; সেই সূত্রে—

“বোর্ডে তখন আলোচনা হুক হলো যে কী মাপে লবণ ক্রয় করা হয়। “বোর্ড মি: ক্যালভার্টকে জানাতে আবেদন করলো যে তিনি যখন হিজলীর সন্ট এক্সপীর তারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন ঠিকা এংমাদারদের থেকে কী মাপে লবণ কেনা হতো।

“তিনি উত্তর দিলেন : শতকরা ১২½ ভাগ বড়তি-গড়তি ধরে ৮২ সিকা ওজনেন কেনা হতো, অর্থাৎ ১১২ মণ কিনে ১০০ মণের দাম দেওয়া হতো।” •

এই চৌর্যবৃত্তির অস্ত্র নিল্মিত হওয়া তো দুঃখের কথা, ১৭৮৬ সালে মি: ক্যালভার্ট ছিলেন কোম্পানীর সবচেয়ে পদস্থ কর্মচারীদের অন্ততম!

আঠারো শতকে কোম্পানীর বাণিজ্য-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অস্থায়ী মুনাফার স্থানিক ও মৌল উৎপাদকের মাঝখানে একটা মোটা লাভের অংশ হাতিয়ে নিত মধ্যস্থ দালাল ব্যবসায়ীরা। ঠিকা মল্যঙ্গীদের উপর কোম্পানীর

শোষণক্রিয়ার এরাই ছিল অস্থির সহযোগী ; কোম্পানী এদেরই মারফৎ লবণ ক্রয় করতো। হিজলীতে এদের বলা হতো ঠিকা এৎমামদার। খালাড়ির লবণ এরা ১০০ মণ ৫১১/৮ মরে কোম্পানীকে বিক্রী করতো, কিন্তু ঠিকা মলান্দীদের দিত মাত্র ৩০৭ টাকা থেকে ৩৭৭ টাকা (পৃঃ ৮৫-৮৬)। আবার জলেশ্বর জিলায় ঠিকাদার নামে পরিচিত এই দালালরা প্রত্যেকেই বেশ কিছু জমির মালিক। এরা এক এবজন বেনামীতে ৩০/৪০/৫০ টা করে খালাড়ি রাখতো, শতকরা মণ ৪৩৫০ থেকে ৫৬০০ পর্যন্ত মরে কোম্পানীকে লবণ জোগান দিত, কিন্তু মলান্দীদের দিত ২৫৭ টাকা থেকে খুব বেশি হলে ৩২৭ টাকা পর্যন্ত (পৃঃ ১৬৪)।

বিদেশী কোম্পানী ও দেশীয় এৎমামদারী প্রথার শোষণের ফলে ঠিকাদারী প্রণায় যে একটা ব্যাপক সংকট দেখা দিচ্ছেছিল তার সাম্য আছে একাধিক দলিলে। ব্যাপক অনশন নৃত্যর সংবাদ এবং সুখার জ্বালায় খালাড়ি থেকে ঠিকা মলান্দীদের পালিয়ে যাবার অনেক খবর পাওয়া যায় এই পুস্তকে। তাছাড়া, সাধারণ একজন দিনমজুরের রোজ যেখানে ১৩ গড়া, সেখানে মাত্র ২৫০ অর্থাৎ কেবলমাত্র ন'গড়া তিন কড়ি বেশি রোজের জম্ম মেদিনীপুরের প্রচণ্ড খরায়, খালাড়ির তীব্র উত্তাপে এত আয়াসসাধ্য, অস্বাস্থ্যকর কাজের জম্ম যথেষ্ট ঠিকা মলান্দী পাওয়াও মুশ্কিল। ঠিকাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এই অভিযোগ জানিয়ে হিজলী ডিভিশনের এজেন্ট হিউএট লিখেছিলেন (৩০ শে জুন, ১৭৯২) : “মলান্দীরা এত চটপট মরে যায় যে তাদের যারগায় খেচ্ছার কাজ করার নতুন লোক বর্তমান মজুরীর হারে জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়।” (পৃঃ ৫৩-৫৪)

(৪)

কিন্তু লবণ-শিল্পীদের দুর্দশা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে বলে একথা মনে রাখা দরকার যে দাহিত্য ও দুর্ভিক্ষের শিকার এই ঠিকা মলান্দীদেরও স্বীকা করতে লবণ-শিল্পীদের বৃহত্তর অংশ আজুরা মলান্দীরা।

আরবী “আজুর” শব্দ থেকে “আজুরা” কথাটির প্রচলন ; অর্থ—মজুরীকাৰী। এই প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে তমজুরের এজেন্ট উইলিয়াম ডেন্ট লিখেছিলেন (২৬ শে ডিসেম্বর, ১৭৯৩) :

“আমি যতদূর জানি, উকু প্রকার হুক হয় এইভাবে—কোন মলাঙ্গী জমিদারের কাছে জমি বন্ধ্যাবৃত্ত নিতে গেলে জমিদার রাজি হতো কেবল এই শর্তে যে মলাঙ্গীকে তখনকার হার শতকরা ১৪ টাকা মণ ধরে মিকিষ্ট পরিমাণ লবণ তৈরী করে দিতে হবে।……জমির খাজনা যদি তৈরী লবণের দামের চেয়ে কম হতো, জমিদার তাকে বাড়তি দামটা টাকার দিয়ে দিত—আর বেশি হলে, উকী ব্যবস্থা। এই পদ্ধতি খাঁপারটা একরকম বেজামূলক চুক্তির মতো ছিল মলাঙ্গী ও জমিদারের মধ্যে। কিন্তু এই চুক্তির সুযোগ নিয়ে জমিদার অনেক সময় মলাঙ্গী পরিবারের পুত্র ব্যক্তিসমূহের জোর করে জমি গতিবে লবণ তৈরী করার কাজে লাগাতো। অতএব, যারা বেজামূলক এই রকম চুক্তিতে রাজি হতো না, তাদের উপর এই ব্যবস্থা এক উৎপীড়নে পরিণত হয়। বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে এখন দেখা যায় যে কোন মলাঙ্গী দাড়া গেলে বা শাসিয়ে গেলে পরিবারের বাকি পুত্র ব্যক্তির) নমন করে যে তাদের চরিত্র্য কতটা চক্রে সেই শ্রুত স্থান পূরণ করা, বিশেষত যদি টাকা অগ্রিম দেওয়া থাকে।” (পৃ: ১৮০)

এই সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় চিল্লী থেকে ডিউএট সাহেবের চিঠিতে তিনি লেখেন যে, জমি জমিদারদের সম্পত্তি, তবে এখন তা খাশ করে নেওয়া হয়েছে বলে আজুরা মলাঙ্গীরা খাজনা দেয় ইজারাদারের হারফৎ। এমন কিছু লিখিত আইন নাই যে আজুরা মলাঙ্গীকে বাধ্য থাকতেই হবে জমিদার বা ইজারাদারের হয়ে খালিডিতে বেগার (“personal service”) খাটতে। তবে—

“বহু শতাব্দী ধাবৎ আজুরা প্রথা প্রচলিত আছে, আর এখনও সেইভাবেই চলছে।……পূর্তান প্রথা অল্পখারী যে আজুরা মলাঙ্গীরা এই জিলাব কাছ করে সংখ্যার তার প্রায় ৭,৫৫৬ জন।……অনিবার্যভাবে এই ইজারাদারদের (জমির ইজারা নেয় যারা) মাধ্যমেই চিরকাল আজুরা মলাঙ্গীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই বাধ্যমে তাদের কাছে নিয়োগ করা হয় তারা নানা শাখাপ্রশাখার সেই সাবেকী আমলের আজুরা মলাঙ্গীদেরই বংশধর, যদি না অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হাকিমেরা……দয়ার বশে কোন মলাঙ্গীকে এই উত্তরাধিকারগত জীবিকার দায় থেকে মুক্তি দিবে থাকেন; তবে মুক্তি প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অল্প লোক কোর্গান দিতে না পারলে এরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটতো।……স্বাধীন প্রথা অল্পখারী প্রতি বৎসর আজুরা মলাঙ্গীদের খানক্কায হাকির করানোর দায়িত্ব ছিল ইজারাদারের; সংখ্যার বাচতি পড়লে তা পূরণ করার দায়িত্বও তাদের; যথাসম্ভব সাবেকী আজুরা মলাঙ্গীদের বংশধরদের মধ্যে থেকেই ইজারাদারেরা এই বাচতি পূরণ করতো। তা সত্ত্বেও যা বাকি থাকতো, সেই

সংখ্যা পূরণ করার জন্য ইয়ারাদারেরা লোক ভোগাড় করতো কখনও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে, কখনও বা নিজেদের ইজারা থেকেই জমি দিয়ে লোককে এই মালদার পেশার প্রণোদিত করে; একবার এই পেশার যোগ দিলে, প্রণা অহুয়ারী তাকে চিরদিনই এই কাজ করতে হতো, জেড়ে যাবার আর পথ ছিল না। বিভিন্ন জিলার শিকদারেরা অহুপস্থিত মালদারীদের থেকে পাঠাতো ইজারাদারের মারফৎ; যে মালদারী পালিয়ে গেছে, ইজারাদারেরা হয় তাদের খুঁজে খেঁজ করতো, কিংবা তা না পারলে নিজেদের পরমা খরচ করে নতুন লোক দিও সেই আরম্ভ; ইজারাদার কখনও এই হুকুম মানতে গাফিলাতি করলে, তাকে বাধ্য করার জন্য যতদিন না হুকুম তামিল হয় ততদিন পর্যন্ত শিকদার তার উপর মহাবিন (?) বস্তিরে রাখতো। কেউ যদি এই প্রচলিত প্রথা অমানিযোগের বিরোধিতা করতো... ইজারাদার প্রথমে চেষ্টা করতো যে তাহেই হোক তাকে পুনঃপ্রণোদ্যবস্থার রাজি করাতে; কিন্তু তাও যদি কার্যকরী না হয়, লোকগুলি যদি এতখানেকই বিগড়ে গিয়ে কাজ থেকে পালিয়ে থাকে, তা হলে অন্য যে পদা সম্ভব তাই গ্রহণ করতে হতো। ইজারাদারকে, সেই অবস্থার উপযুক্ত বল প্রয়োগের দ্বারা তাদের কাজে ফিঙ্গির নিয়ে আসা হতো; কাজে লাগার হুকুম না মেনে বৈকে নসলে পাইক লাগিয়ে, সম্ভবত নারদার করেই তাদের জোর করে খালাসিত নামানো হতো।" (পৃ: ৪৭—৫০)

নবাবী আমলে সামন্ত প্রধাসিক্ত শ্রমের একটি বিশিষ্ট রূপের তথ্য-বহুল বর্ণনা এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা থেকে আজুরা ব্যবস্থার দুটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য বোধ হয় : (ক) ক্ষেতের ফসলের পরিবর্তে খাজনা (rent in kind) দেওয়া হচ্চে খালাসির ফসলে; (খ) মাল্ল বলেছিলেন যে মধ্যযুগে দানিউব অঞ্চলে বেগারী থেকেই ভূদাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ("ক্যাপিটাল", ১ম খণ্ড, পৃ: ২২০), মনে হয় আজুরা মালদারীদের ক্ষেত্রেও তা সত্য।

(৫)

দেওয়ানী লাভের পরও ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সুসভ্য ইংরাজ কোম্পানী নবাবী আমলের এই বর্বর ব্যবস্থায় কোন সংস্কারের প্রবর্তন করেন নি, বরং তাঁরা এই সামন্ত শোষণের পদ্ধতিকেই আরও যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন অপরাহত মুনাফা শিকারের স্বার্থে। ১৭৮০ সালে রেজিংস যখন লবণ-নিষে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর আমলাতান্ত্রিক কন্ট্রোলকে আরও পাকা করে তুললেন, তখন কোম্পানীর কেন্দ্রীকৃত

শাসন যন্ত্রের চাপে আজুরা মল্যঙ্গীদের ছত্রবস্থা চরমে ওঠে। নবাবী আমলের টিলাঢালা ব্যবস্থায় তবু ইাক ভাড়ার যে ব্যবহার ছিল, ইংরাজের উন্নততর শাসনের যুগে সেই অবকাশও আর রইলো না। নবাবী আমলের পাইকের জায়গায় এলো কোম্পানীর লবণ-কৃতির লাঠিয়াল, ইজারাদারের স্থানে সন্ট এজেন্ট, শিকদারের পরিবর্তে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট।

হিজলীর তিনটি পরগণার আজুরা মল্যঙ্গীরা মিলে হিজলী ডিভিশনের এজেন্ট চ্যাপম্যান সাহেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পত্র পেশ করে (১১ই এপ্রিল, ১৭৯৯) তাতে ব্রিটিশ রাজত্বে বহুযুগী শোষণের একটি চিত্র পাওয়া যায় :

“১। আমরা বরাবরই কোম্পানীর চাকার অল্প লবণ তৈরী করে থাকি। সূর্য উঠতে পারছি না যে মফঃব্বলের শাহবন্দর, দারোগা ও কয়ালরা ঠিক কোন মাপে লবণ খরিন করে, আর আমরা নালিশ জানাতে গেলে সবার ও মফঃব্বদের মৃৎস্থদিরা (নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করেই) আমাদের নালিশে কাণ দেয় না। গতে পাঁচ বছর ধরে আমরা অভিযোগ জানিয়ে আসছি, কিন্তু কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি।

“২। কিছু জানা কয়াল আর সাধু মাইতি শাহবন্দর হয়ে অসং ফন্দি-ফিকির করে আমাদের পূর্ণাঙ্গ মাপের ওজন সরিয়ে ফেলে নতুন মাপ চালু করেছে। এই মাপে তারা আগের হুঁড়প লবণ-আদার করে আমাদের কাছে থেকে, এবং বাড়তি পরিমাণটা বিক্রী করে নিজদের লাভের অল্প ১০০০এদের দ্বন্দ্বের আনন্দ বরাবর নালিশ জানিয়েছি, কিন্তু যি: চ্যাপম্যান বা কোনও মৃৎস্থদি আমাদের কথা শুনেতে চান নি।

“৩। মফঃব্বলের দারোগা ও শাহবন্দর আরও দশজন বড়দার (প্রধান রাজত) সঙ্গে মিলে আসল ওজনের ডবল লবণ আদার করে আমাদের সর্বনাশ করছে।.....

“৪। যি: চ্যাপম্যানের কাছে নালিশ জানাতে গেলে, তাঁর নাজির রায়হরি ঘোষ পেয়ালা দিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে যার তাঁর বাড়ীতে এবং একেবারে খালি-গেটে চার পাঁচ দিন সেখানে আটকে রাখে। কোনবতে যদি যি: চ্যাপম্যানের সাহসে হাজির হওয়া যায়, তাহলে তিনি আমাদের নালিশ না শুনেই এমন কড়া কথা বলবেন যে তারপরে শাহেবের কর্মচারীরা যে ওজন চুরি করবে তা আর আন্দর কি।

“৫। আমরা শুনেছিলাম যে বোর্ডের হুকুম হয়েছে যে কেউ আর ‘তোহরী দস্তহী’ বা ‘বায়ে মাদন’ আদার করতে পারবে না। কিন্তু খবরটা সত্য না মিথ্যা তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ, প্রতি খালাফি থেকেই দারোগা

ও শাহবন্দর ৫ টাকা করে আদায় করে, কয়লা মিলের ছত্র ৬মণ লবণ রাখে, তার কেরাণ্ডি নেয় ২০ সের, আর তার রাঁধুনি ২০ সের। শাহবন্দরের চাকরকে দিতে হয় ২০ সের। এই ভাবেই প্রত্যেক খালাড়ি ভাঙ্গার সময় ৪ টাকা তেহরী বাদেও তারা ৭৫০ মণ করে লবণ আদায় করে, এতে আমাদের আর কষ্টের সীমা থাকে না।

“৭। আগেকার ছকন সন্ট একেকের আমলে আমরা প্রত্যেক খালাড়িতে দিনে কখনও দুইলা, কখনও বা একহেলা শুধু কাজ করতুম, কিন্তু এখন মিঃ চ্যাপম্যানের আমলে আমাদের দিনে তিনবার খালাড়িতে নামতে হয়।...” (পৃ: ৩৪—৩৫)

আমলাতাত্ত্বিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই চলতো প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক শোষণ। দ্বিজলীতে এক একজন পুরা আজুরা ৫০ মণ করে লবণ জোগান দিত; সর্বোচ্চ দর শতকরা ৩০ টাকা মণ খরলেও লবণ তৈরী করে ১৫ টাকার বেশি তার আয় হয় না। ১০০ মণে সরঞ্জামী খরচ ৭৫/৫ খরলে ৫০ মণে ৩৫/১২১০; তার থেকে ৫০ মণের ছত্র ২ জন কুলি—একখানি দলিলের (পৃ: ৮৬) হিসাবে এতমামদারেরা কুলির মজুরী দিত জনপ্রতি মাসে ২ টাকা—এবং জ্বালানি কাঠ টানার জন্য একটি বলদের খরচা জুগিয়ে ১৫ টাকার কত বাকি থাকে? (পৃ: ৬৩—৬৬) আর, এই যদি হয় সবচেয়ে সম্পন্ন পুরা আজুরাদের অবস্থা, তাহলে আরও দরিদ্র নিম্নবর্ণের আজুরাদের অবস্থা সত্যেই অনুমেয়। ফলে, মলঙ্গীদেরই একখানি মর্মস্পর্শী আঁখির ভাষায় বলতে গেলে:

“অন্যভাবে বহু মলঙ্গী যাত্রা গেছে। অনেকে জাতিহৃত্য হইয়াছে। অনেকে পালিয়ে গেছে, অনেকে চুরি করিতে গিরে ধরা পড়েছে।...আমরা অন্ত রায়তদেরই মতো খাজনা দিই, কিন্তু সন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে লবণ বিক্রী করে আমাদের কোন লাভ হয় না।” (পৃ: ৬৪)

(৬)

এই অসহ্য অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মলঙ্গীরা প্রায়ই খালাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত। এ সংবাদ আলোচ্য ঐন্ডের বহু দলিলেই আছে। যথা, ১১৯৮ সালের ছত্রিকের পরে বহু মলঙ্গী ময়নাচোরা অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাবার ফলে ঐ অঞ্চলে সরকারী লবণের আদায় ২০,৬০০ মণ থেকে কমে গিয়ে ১০,১৯১ মণে। (পৃ: ১২৪)

আজুরা মল্যঙ্গীরা অনেকই পালিয়ে চলে যেত পাশের মাঠা এলাকায় কিংবা চব্বিশ পরগণা জিলায়। ১২০১ সালের চৈত্র মাসে হিজলীর জনৈক দারোগা রামহরি দাশ কোম্পানীর কাছে নালিশ জানায় :

“গত বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে এই পরগণার আজুরা মল্যঙ্গীরা খালাড়ি বন্ধ করে, ২৪ পরগণার মুচাগাছার পালিয়ে চলে যায়। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরাই তাদের আশ্রয় দেয়। এই ভরসায় আরও ১৪ বর আজুরা মল্যঙ্গী এই বৎসর এখান থেকে পালিয়ে তেঁতুলবাড়িয়া চলে গেছে।” (পৃ: ৩২)

চব্বিশ পরগণার চায়ীর ঘরে মেদিনীপুরের পলাতক মল্যঙ্গীদের আশ্রয় পাওয়ার দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য। লোনা যায়, সুন্দরবনের বাঘ কুমীর সাপের সঙ্গে লড়াই করে যারা প্রথম আবাদ শুরু করেছিল, তারা নাকি অনেকই মেদিনীপুরের গ্রামছাড়া গরীব চায়ী। তাদের অনেকই কি কাঁথি অঞ্চলের আজুরা মল্যঙ্গীদের পূর্ব-পুরুষ?

আঠারো শতকের শেষ পর্বে সাধা সাংলাব্যাপী কৃষক অভ্যুত্থানের উষ্ণ আবহাওয়ায় মল্যঙ্গীরাও প্রতিবাদের সচেতন পন্থা গ্রহণ করতে শিখছিল। আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি দলিলই হচ্ছে আজুরাদের প্রতিবাদ পত্র। প্রতিবাদের বিষয় সাধারণত দুটি—প্রথমত, কোম্পানীর আমলাদের অত্যাচার, ঘুম আদায়, ওজন চুরি ইত্যাদি নানাবিধ ছুনিতির প্রতিকার দাবী, এবং দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলক প্রথায় লবণ-তৈরীর দায় থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে স্বাধীন ঠিকা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবেদন। প্রতিবাদের ভঙ্গিও সাধারণত দুই প্রকার : কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক মল্যঙ্গী কতৃপক্ষের কাছে মাথুলী আর্জি পেশ করেই ক্ষান্ত ; কিন্তু কখনও আবার সেই প্রতিবাদ প্রকাশে বিক্লেভের আকার ধারণ করে, কয়েক শ’ বা এমনকি কয়েক হাজার মল্যঙ্গীও তাতে যোগ দেয়, এজেন্ট সাহেবরা শঙ্কিত হয়ে “এজিটেশন”, “রিভোল্ট” ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেন।

সংকলিত তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে বিশেষ করে দু’টি বিক্লেভের যথেষ্ট স্তরুণ আছে।

প্রথমটির নেতা ছিলেন বলাই কুহু। ১৭৯৯-১৮০০ সালে বীরকুল, বালসাই ও মীরগোদা অঞ্চলের আজুরা মল্যঙ্গীদের প্রতিবাদকে ভাষা দিয়ে এই নিঃশেষ কৃষকসন্তান চ্যাপমান সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আর্জি পেশ করেছিলেন তার অংশবিশেষ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। মিঃ চ্যাপমান

এই আর্মির জবাবে বোর্ড-অব-ট্রেডের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বলাই কুতূহ কিতুটা পরিচয় পাওয়া যায় :

“(বোর্ডের কাছে এ-রকম একটা বিষয় নিয়ে লিখতেও সম্ভব হয় যে,) আমার ও আমার পূর্ববর্তী ছ’জন এজেন্টের ক্ষতিতে মাসিক ৫-১৬ টাকা মাহিনার মালীর কাজ করতো যে ব্যক্তি, এই লোকটা তারই ভাই। সাহেবের মালীর ভাই বলেই নিজেয় সালপালদের কাছে বলাই কুতূহর এতখানি প্রতিপত্তি, তাই কোন বিষয়ে আর্মি বা দরখাস্ত পেশ করা হলেই কুতূহকে দেখা দেত সকলের সামনের সান্নিধ্যে।” (পৃ: ৩৭, ১১১)

প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে হিজলীর আফুরা মল্লাদীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তা আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৮০৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী এজেন্ট মি: ফাকু হারসন্ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখেন :

“মল্লাদীদের যে দলটি কলকাতার নালিশ জানাতে গিয়েছিল, চীফ সেক্রেটারীর অর্ডারে জবন মাইতি বাদে তারা সকলেই ফিরে এসেছে। প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে তারা প্রথমে মঃখলে গিয়ে নিম্নশ্রেণীর মল্লাদীদের বুদ্ধিহে-হুতির দলে টানে, তারপর প্রায় ৭’ তিনেক লোক নিয়ে আমার কাছাকাঁতে এসে এমন হৈ-চৈ করতে লুফ করলো যে তেমন কণ্ঠ আর আগে কখনও দেখিনি। তারা জোর আওরাজ তুললো যে তাদের দাবী এখনই মানা হোক, নইলে তারা সবাই কাজ ছেড়ে চলে যাবে। তা ছাড়া, জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের দারোগা ও প্রধান মল্লাদীদের কাছ থেকে যে-রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে মনে হয় যে প্রেমানন্দ সরকার ও তার ভাই পালকুওয়ার উত্থানিতে আরও অনেকই তাদের পুঁহা অহুসরণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে; দুই ভাই মিলে আগ্রাণ চেষ্টা করছে মল্লাদীদের বিক্ষোহে উত্তেজিত করে তুলতে।” (পৃ: ১৩৬)

প্রেমানন্দ সরকারের আন্দোলনের ফলে লবণের দর বীধা, ওজনের মাপ ঠিক করা ইত্যাদি কতকগুলি দাবী সরকার থেকে মছুর করা হয়েছিল, এবং হয়তো এই আন্দোলনেরই চাপে শেষ পর্যন্ত ফাকু হারসনকে হিজলী থেকে বদলী করা হয়। কিন্তু পরবর্তী এজেন্ট মি: মেসনের আমলে উক্ত সংস্কারগুলি কার্যকরী করার দিক থেকে সরকারী টালবাহানা দেখে মল্লাদীরা আবার আন্দোলন শুরু করে। সেই বিষয়ে ১৮০৬ সালের মে মাসের এক চিঠিতে মি: মেসন লিখেছেন :

“এই প্রেমানন্দ সরকার কাল প্রায় ৭’খানেক লোক নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে জানায় যে বোর্ডের যে-সমস্ত অর্ডার কলকাতায় সে আমার কাছে গিয়েছিল,

সেগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক ; লোকটার এত স্পর্ধা যে আমার আমলা ও তার নিজের অগ্রচর বিপণে চালিত মলাঙ্গীগুলোর সামনেই সে বসে বসলো যে, ফার্মহারসনকে সে-ই এই ছিলা থেকে ভাড়িয়েছে, এবং আমাকে নাকি এখানে আনানো হয়েছে মলাঙ্গীদের অভিযোগ মেটাবার জল্পাই ; সঙ্গে সঙ্গে আরও সব উত্তেজক, অপমানকর কথা এমন ভাবে-ভঙ্গীতে বললো যে আমি তা কারও মুখে কখনও শুনি নি ইত্যাদি.....।" (পৃ: ১৪৪)

তীব্রতা ও ব্যাপকতায় সন্ন্যাসী ও চুয়ার বিদ্রোহের সমান না হলেও তমলুক ও হিজলীর ৩৫ হাজার লবণশিল্পীর এই সুদীর্ঘ প্রতিবাদ আন্দোলনও যে কোম্পানীর আমলে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বকীয় মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে, আশা করা যায় এই অনাবিল্লিত-পূর্ব সভ্যটি আলোচ্য পুস্তক প্রকাশের ফলে সন্মত ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

(৭)

মলাঙ্গীদের এই প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়নি। আজুরাদের প্রধান দাবী ভূদাস-প্রথা থেকে অব্যাহতি এবং ঠিকা ব্যবস্থায় উৎপাদনের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর করতেই হলো কোম্পানীকে। ১৭৯৩ সালে ইংরাজ সরকারকে নিজ স্বার্থেই পুরাতন জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের কাজ সম্পূর্ণ করতে হলো। আজুরাদের মধ্যে অসন্তোষ তখন এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, প্রাচীন সামন্তগোষ্ঠীর মর্যাদা-বিহীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নূতন ভূইকোড়ি জমিদার জেগীর উপর তাদের শোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে দেওয়া তখন আর তেমন নিরাপদ নয় কোম্পানীর পক্ষে। তা-ছাড়া, লবণশিল্পে অব্যাহত মুনাফা-লিকারের উদ্দেশ্যেও তখন আজুরাদের জমিদারী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন মজুরী-জীবী ঠিকা জমিকের পদে নিয়ে আসা তখন কোম্পানীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন। তা-ছাড়া, হিজলী ও তমলুকের এক্সেন্ট উভয়েই জানালেন যে আজুরা প্রথার উচ্ছেদের ফলে এই দুই ডিভিশনের রাজস্ব যথাক্রমে ১১০০০ টাকা ও ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে (পৃ: ৭৪, ১৮৭)। এই ত্রিবিধ কারণে ১৭৯৪ সালে লবণ-অঞ্চলের ভূমিদাস আজুরা মলাঙ্গীদের ঠিকায় পরিণত করা হলো। অবশ্য, আইন করা ও তাকে কার্যকরী করার মধ্যে যে কত তফাৎ তার অনেক

সাক্ষ্যই এই গ্রন্থের বহু দলিলে আছে। বলাই কুণ্ড ও প্রেমানন্দ সরকারের আন্দোলনেও তার প্রমাণ।

লবণশিল্পীদের অবস্থা ছাড়াও মেদিনীপুরের শাসন-ব্যবস্থা, জমিদারী, চুরার বিদ্রোহ ও দারাদারদের সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য এই পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। কোম্পানীর আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের এই আকর সর্বসাধারণের নিকট উদঘাটনের জন্য পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থের সম্পাদক ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, সহ-সম্পাদকদ্বয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রিস্কিয়নাল রেকর্ডস্ সার্ভে কমিটির নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই আশাই প্রকাশ করবে যে তাঁদের সৃষ্টিশীল গবেষণা বাঙ্গালীর ইতিহাস-বিভার দিগন্তকে আরও অনেক আবিষ্কারের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

গৌড়-কবি ত্রিহর্ষ

ত্রীনলিনী নাথ দাশগুপ্ত

মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান লইয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকজন কবি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিহর্ষ অস্তুতম। তাঁহার কাব্যের তিনি নাম দিয়াছেন নৈমথ-চরিত বা নৈমথীয়, কারণ কাব্যের যিনি নায়ক তিনি ছিলেন নিমথ বা নিম্বাপ দেশের রাজা। নৈমথ-চরিতের পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম ত্রিহর, এবং মাতা মামলদেবী। ত্রিহর্ষ শুধু কাব্যপুস্তকেই প্জারী ছিলেন না, দর্শন-শাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। খণ্ডনখণ্ডাচ্ছ নামে বৈদ্য-দর্শনের উপর দ্রুত গ্রন্থখানি তাঁহারই লেখা। মাধবীয় বাত্ রত্নিতে এক হীরদামীর উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনিই ত্রিহর্ষের পিতা কিনা বলা কঠিন। পঞ্চদশী-কার বিচারণ্য তাঁহার গ্রন্থে (৬, ১০২) এক স্থানে বলিয়াছেন, “হর্ষ মিশ্রাদিত্তেতু খণ্ডনাদৌ স্মৃতি-কিতাঃ।” কিন্তু বিচারণ্য এখানে কবির নামে ভুল করিয়াছেন, কারণ ‘ত্রি’ তাঁহার নামের উচ্চারণ নয়, অঙ্গ। খণ্ডনখণ্ডাচ্ছের টীকাकार বরদ-পণ্ডিতও তাঁহার টীকায় ত্রিহর্ষকে ‘মিশ্র’ উপাধি দিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মন্দট-ভট্টের কাব্য প্রকাশের টীকাकार গোবিন্দ-কবি তাঁহার কাব্য-প্রাণীপ নামে টীকার প্রাপ্তে ত্রিহর্ষ নামে তাঁহার এক বৈমাতেয় ভ্রাতার স্বর্ণারোহণে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক পিটারসন এই ত্রিহর্ষের সঙ্গে নৈমথীয়ের কবি ত্রিহর্ষকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সোনোদেবী ও কেশবের পুত্র গোবিন্দ-কবির বৈমাতেয় ভ্রাতা ত্রিহর্ষ মামলদেবী ও ত্রিহরের পুত্র ত্রিহর্ষ হইতে পারে না।

কবি ত্রিহর্ষ ‘নৈমথীয়ের’ ষাট্টিং সর্গের শেষ শ্লোকে বলেন, তিনি কচ্চিৎ কান্ধকুজ-রাজের নিকট হইতে ‘আসন’ ও ‘তানুলম্বয়’ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (“তানুলম্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্ধকুজেশ্বরান্”)। ইহা অবশ্য তাঁহার কাব্য-প্রতিভার ও প্রজ্ঞার প্রতি সন্মানের নিদর্শন। অথচ সেই কান্ধকুজেশ্বর কে, সে-কথা ত্রিহর্ষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজ-লেখক স্মৃতির ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বিরচিত প্রবন্ধকোষ হইতে জানা যায় সেই

রাজার নাম জয়চন্দ্র । ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে চাণ্ড পণ্ডিতও তাঁহার নৈমধীয়ের
টীকায় এই একই কথা বলিয়াছেন ।

শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রী হীর একথাও রাজশেখর স্মরি জানিতেন । কিন্তু
তাঁহার ধারণা ছিল শ্রীহর্ষ বারাণসীর অধিবাসী, এবং সেখান হইতে তিনি
যান কাশ্মীরে, কাশ্মীরী সূর্যবর্গের দ্বারা তাঁহার নৈমধী-খানি অশ্রমোদন
করাইবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু মৈথিল কবি বিভাপতি জানিতেন অশ্রমপ ।
তাঁহার পুরুষ-পরাণের মেধাবী-কথা নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভাপতি বলেন,
কবি শ্রীহর্ষের বাড়ী গোড়-বিষয়ে, এবং গোড় হইতে তিনি গিয়াছিলেন
বারাণসীতে, সেখানকার পণ্ডিতদের নিকট হইতে তাঁহার কাব্যখানির অশ্রম
অশ্রমোদন লাভের ইচ্ছায় । বিভাপতি বাঙ্গালী নন, কাজেই কোনও
স্বার্থ বা অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি শ্রীহর্ষকে বাঙ্গালী বলেন নাই ।
জৈন রাজশেখরও অ-বাঙ্গালী, বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই তিনি
শ্রীহর্ষকে বারাণসীর অধিবাসী বলিয়াছেন, এমন কথাও কিছুতেই নয় ।
কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে বেশী সত্যাদেশী ছিলেন কে ?

শ্রীহর্ষের অপরাপর রচনার মধ্যে একখানির নাম গৌড়োবীল-কুল-প্রশস্তি,
অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের একখানি প্রশস্তি । বলা বাহুল্য, কোনও কবি
যত মূর্থই হোন, সমসাময়িক না হইলে কোনও রাজবংশের নিফল প্রশস্তি
রচনায় হাত দেন না । এই শ্রীহর্ষই আবার বিজয়-প্রশস্তি নামে আর
একটি প্রশস্তিও রচনা করিয়াছিলেন, এবং টীকাকার গোপীনাথ আচার্য
তাঁহার হর্ষ-ক্লদয়া নামে নৈমধীয়ের টীকায় বিজয়-প্রশস্তি'র ব্যাখ্যায় বলেন,
“বিজয়সেননায়ে গোড়েশ্বরশ্রু প্রশস্তি.....” । গোপীনাথ আচার্যের
উক্তির প্রমাণভার পাওয়ায় গৌড়োবীল-কুল-প্রশস্তি যে বাঙ্গালার সেন-
বংশেরই একখানি প্রশস্তি তাহা বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছে । গোড়েশ্বর
বিজয় সেনের রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বা ঐ কাছাকাছি
সময়ে । গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল ইহার বছর
বার পরে, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে । অতএব দাঁড়াইতেছে এই যে, কবি শ্রীহর্ষ
বিজয় সেনের রাজত্বের অবসানের পর কান্ডকুল বারাণসী রাজ জয়চন্দ্রের
রাজ-সত্যায় গিয়াছিলেন, এবং সেখানে সম্মানসূচক ‘আসন’ ও ‘তাম্বুলদায়’
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অর্থাৎ বিভাপতির পূর্ববর্তী হইলেও রাজশেখর স্মরি
শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ।

কিন্তু রাজশেখর সূরির উক্তির সবটুকুই ভুল, তাহা নয়। 'চতুর্দশ বিভা'র পারদর্শী কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ কর্তৃক ঐহর্ষের কাব্য যে 'মহিত' বা সম্মানিত হইয়াছিল, এ-কথা নৈষধীরের ষোড়শ সর্গের ১৩১ (কোনও কোনও সংস্করণের ১৩০) শ্লোকে কবি নিজেই বলিয়াছেন। খুব সম্ভব হুই বিভিন্ন সর্গান্তের দুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া ঐহর্ষের ব্যক্তিগত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়া রাজশেখর পুরি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে চাহিয়া ছিলেন। বিচারে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালাদেশের এক কিয়দন্তী অনুসারে আবার, এই কবি ঐহর্ষই অষ্টম শতাব্দীতে কান্তকূজ হইতে রাজা আদিশূরের সভায় আগত পক-ব্রাহ্মণের অন্ততম!!

নৈষধ চরিত পড়িলে দেখা যায়, ইহাতে ঐহর্ষ পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সমসাময়িক সেন-রাজকে উল্লেখ করিয়াছেন। সেনদের তাত্ত্বশাসনে আছে, পুরাণ প্রসিদ্ধ বীরসেনের বংশে (পৌরাণীভিঃ কথ্যভিঃ প্রথিত-গুণগুণৈঃ বীরসেনস্ত বংশে) বিজয় সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐহর্ষের কাব্যের নায়ক নলও বীরসেনেরই সন্তান। তাত্ত্বশাসনের বর্ণনায় সেনরা 'ওষধিনাথ' বা চন্দ্র-বংশীয় ছিলেন; ঐহর্ষও নৈষধীরের এক স্থানে লিখিলেন,

অত্রবীদথ যমন্তমহুগ্ধম্
বীরসেনকুলদীপ তমস্বাম্ ।
যৎ কিমপ্যভিবৃকুষতি তৎ কিম্
চন্দ্রবংশে বসন্তো সদৃশস্তে ॥ ৫, ১৩৪

নলকে বীরসেন-কুলদীপ এবং চন্দ্রবংশীয় বলিয়া এই যে বর্ণনা, ইহা বিজয়সেন সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। নৈষধীরের একাদশ সর্গের ৯৪ হইতে ৯৮ পর্বন্ত পাঁচটি শ্লোকে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় ভারতীর মুখে প্রতিরথ রাজাদের মধ্যে গোড়রাজের যে স্তম্ভিমূলক বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার একটি বলে,

আলিঙ্গত কমলবৎ করকঙ্কারাম্
শ্যামঃ সূমেরু লিখয়েব নবঃ পয়োদঃ ।
কন্দর্প মূর্ছরহমণ্ডল চম্পক অ্রগ্
দানন্দদলক্ৰটি ককুভিত্তিকাস্ত ॥ ১১, ৯৬

এখানে দময়ন্তীকে সুরমের স্বর্ণাঙ্ক শিখরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি মেঘ-রূপ গোড়েশ্বরের কৃষ্ণবর্ণকে ফুটাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদি অরণ্য করি বিজয়সেনের বংশ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট প্রদেশ হইতে বাক্সালাদেশে আসিয়াছিল, তাহা হইলে গোড়াধিপের গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে কবির এই ইঙ্গিতের মর্ম বুঝা কঠিন হইবে না। বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষণ সেনকেও কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করিয়া কোনও কোনও সমসাময়িক কবি তাঁহার শ্রামবর্ণ ও চরিত্র উভয়ের প্রতিই কৌশলে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আর এক কথাও মনে হয়, সম্ভবতঃ রাজাশ্রুতির জ্ঞাত অথবা রাজরোষের ভয়ে শ্রীহর্ষ নল-দময়ন্তীর কাহিনী হইতে বিবাহের পর নবদম্পতির যে অপ্রীতিকর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সে সকল কথা সম্বন্ধে অথবা সম্বন্ধে পরিহার করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গ আসিবার আগেই তিনি তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন।

এতগুলি কারণের সমাবেশ ঘটায় গোড় যে শ্রীহর্ষের পিতৃভূমি বা স্বদেশ এই অসুমান ভাগ করিতে পারি নাই (Indian Culture, Vol II. pp. 576-79)। নৈষধ চরিত্রের অন্তঃসম যশস্বী টীকাকার নারায়ণ ত কবিকে স্পষ্টই 'গোড়ীয়' বলিয়া বলিয়াছেন। এই কাব্যের এক স্থানে 'উল্লু' শব্দের ব্যাখ্যায় নারায়ণ বলেন, উল্লুখনি করা গোড় বর্মীদের মধ্যে প্রচলিত, এবং কবি এখানে স্বদেশের রীতির উল্লেখ করিয়াছেন ("স্বদেশরীতিঃ কবিনোক্তা")। অংগ মাসলিক কাজে মেয়েদের উল্লুখনি করার উল্লেখ অল্প কৌনও কোনও কবির রচনায়ও রহিয়াছে। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন, নারায়ণের এই উক্তি তেমন নির্ভর যোগ্য নয়। কিন্তু 'উল্লু' সম্পর্কে শ্রীহর্ষও যে তাঁহার স্বদেশ-রীতির কথা উল্লেখ করিতে পারেন, একথা বলিলে নারায়ণের উক্তির মূল্য কেন কমিয়া যাইবে?

কাব্যের অঙ্কত (২২, ৫৩) শ্রীহর্ষ ধনীর সম্মানদের লাল সূতার 'লন্তি' দিয়া রূপার লাটিম (লসড্ডিহ বা ললড্ডিহ) খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ললড্ডিহ শব্দের ব্যাখ্যায়ও টীকাকার নারায়ণ বলেন, গোড়দেশের ভাষায় 'ভ্রমরক' শব্দের সংজ্ঞা হইতেছে ডিম্ব বা ললড্ডিহ ("ডিম্বং ললড্ডিহ-মিতি বা গোড়দেশভাষায়াং ভ্রমরকস্য সংজ্ঞা"); মহারাষ্ট্র এবং কাঙ্কবুজের ভাষায় উহাকে 'ভবরা' বলে ("মহারাষ্ট্রভাষায়াং কাঙ্কবুজভাষায়াং চ ভবরা ইতি সংজ্ঞা")। নৈষধীয়ের অপর এক টীকাকার ঈশানদেবও বলেন,

"গোড়দেশে ভ্রমঃকল্প লাড়িহু ইতি নাম"। এই 'লাড়িহু' হইতেই আধুনিক বাংলায় 'লাটিন' আসিয়াছে।

আর এক বিশেষ কথাও নিবেদন করার আছে। নৈমধীয়ে নলের সঙ্গে দময়ন্তীর বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণের বর্ণনায় দেখা যায়, অত্যাগতদের ভাত খাওয়ান হইতেছে, এবং মাছ আচার-সুস্থ ছিল। কবি তাহা হইলে সেই দেশের লোক যেখানে সামাজিক অসুষ্ঠানে ভাত খাওয়ান হইত এবং মাছ অপবিত্র জ্ঞান করা হইত না। শ্রীহর্ষের কাব্যে আরও এমন কতকগুলি সামাজিক তথ্য আছে যেগুলি বেশী করিয়া বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। তরসা করি, শ্রীহর্ষকে গোড়-কবি অস্বীকার করিয়া ফুল কিছু করি নাই।

পুস্তক পরিচয়

গুপ্তরাজবংশের স্বর্ণমুদ্রা—সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখের অভাব নাই। এমনকি বৈদিক সাহিত্যেও স্বর্ণমুদ্রার নামোল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গুপ্তপূর্ব যুগের খাঁটি ভারতীয় রাজগণকর্তৃক প্রচারিত কোন স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের যবন (Greek) জাতীয় বৈদেশিক রাজগণের কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহার তৌলরীতি Stater সংজ্ঞক গ্রীক স্বর্ণমুদ্রার অনুরূপ (১২০২ গ্রেন)। বৈদেশিক কুষাণবংশীয় সম্রাটেরাই সর্বপ্রথম ভারতে বহুল সংখ্যায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। উহার তৌল রোমান Aurius সংজ্ঞক স্বর্ণমুদ্রা হইতে অনুরূপ হইয়াছিল (১২১ গ্রেন)। কুষাণদিগের পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ভারতে গুপ্তবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। খাঁটি ভারতীয় রাজগণের মধ্যে গুপ্তরাজ কুষাণদিগের অনুরূপে সর্বপ্রথম অগণিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন। এই মুদ্রায় প্রথমে কুষাণদের তৌলরীতি অবলম্বিত হইয়াছিল; পরে গুপ্তগণের স্বর্ণমুদ্রায় প্রাচীন ভারতীয় নিক বা সুবর্ণ সংজ্ঞক মুদ্রার চরিত ১৪৬২ গ্রেন) তৌল গৃহীত হয়। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী। গুপ্তপূর্ব এবং গুপ্তোত্তর যুগের ভারতীয় রাজগণের কোন মুদ্রাই শিল্পচাতুর্যে উহার সমতুল্য নহে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার নূতন হইতে বিগত দেড়শতাব্দিক বংশের মধ্যে গুপ্তসম্রাটগণের যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত এবং সংরক্ষিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশ কলিকাতা, লক্ষ্মৌ এবং লণ্ডনের যাদুঘরে স্থান পাষ্টয়াছে। ঐ সকল যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্ডিত-বিরচিত মুদ্রাবিদ্রঙ্গীতে তৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

Catalogue of the Gupta Gold coins in the Bayana Hoard
by Dr. Anant Sadashiv Altekar ; published by the Numismatic Society of India, Bombay, 1954 ; pp-clvii + 363; with 48 Plates ; price Rs. 60/-

গুপ্তবংশের প্রচারিত মুদ্রামধ্যে স্বর্ণমুদ্রাই অধিকসংখ্যক; রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রার সংখ্যা কম। পূর্বেোক্ত মুদ্রাবিবরণীগুলির মধ্যে লণ্ডনের ব্রিটিশম্যাজিয়নে সংরক্ষিত গুপ্তযুগীয় মুদ্রাসমূহের তালিকা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববেত্তা জন অ্যালান সাহেব ঐ গ্রন্থের রচয়িতা। এ পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকখানি গুপ্তবংশের মুদ্রাসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অ্যালান সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশের পর এই ৪০ বৎসরে বহুসংখ্যক গুপ্তযুগীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৎসমূহে অনেক কুজুতপুত্র প্রবন্ধ নানা স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নয় বৎসর পূর্বে ভরতপুর রাজ্যের (বর্তমান রাজস্থান প্রদেশের অন্তর্গত ভরতপুর জেলার) একটি গ্রামে গুপ্তসম্রাটগণের প্রায় দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় নূতন করিয়া গুপ্তযুগীয় মুদ্রাসম্পর্কে সর্বাঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক এবং ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদের সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর জনস্তু সগলিবি অলভেকর মহাশয় এইরূপ আলোচনার অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গত ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভরতপুরের অন্তর্গত বাঘাণা-নগরীর নিকটবর্তী হল্লনপুরা গ্রামে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে দ্বিসহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি পাত্র আবিষ্কৃত হয়। পাত্রটি প্রথমে নিকটবর্তী নাগলাহেলাগ্রামের অধিবাসীদের হস্তগত হইয়াছিল। তাহার উহা হইতে ২২৫টি মুদ্রা গলাইয়া নষ্ট করে। কিন্তু বাকী ১৮২১টি স্বর্ণমুদ্রা ভরতপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত সবাই ব্রজেন্দ্র সিংহ মহোদয়ের চেষ্টায় ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায়। ইতি পূর্বে কখনও কোথাও এত অধিক সংখ্যক প্রাচীনভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হয় নাই। বিশেষতঃ পাত্রটিতে কেবলমাত্র গুপ্তবংশের আদি সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে তদীয় বৃদ্ধ-প্রপৌত্র স্বন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত পাঁচজন সম্রাটের স্বর্ণমুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল গুপ্তমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতকগুলি পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এইরূপ চূম্বাপা মুদ্রার মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) “চক্রবিক্রম” উপাধিযুক্ত এবং ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তিসংবলিত একটি মুদ্রা অত্যন্ত মূল্যবান। অধ্যাপক অলভেকর এই মুদ্রা সংগ্রহের এক উপায়ে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।

উহার গ্রন্থে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যেরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই সুরচিত গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া ভরতপুরের মহারাজাসাহেব প্রাচীনভারত ইতিহাসের অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

অধ্যাপক অলতেকরের গ্রন্থে ১৫৮ পৃষ্ঠার একটি স্থানিতি ভূমিকা এবং ৩৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রাবিবরণী ও অসংখ্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা আছে। গ্রন্থের ৪৮ খানি চিত্রমধ্যে ৩২ খানিতে প্রায় সাড়ে চারিশত স্বর্ণমুদ্রার স্থলর প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী চিত্রমধ্যে মুদ্রাবর্ণিত নরনারীর বেশভূষার উদাহরণ মূলক চিত্রসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। ভূমিকার আরম্ভে সুযোগ্য গ্রন্থকার বিভিন্ন স্থানে গুপ্তযুগীয় স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে গুপ্তবংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর গুপ্তযুগের বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমুদ্রার বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গুপ্তসম্রাটগণের দ্রোণ্য ও তাম্র মুদ্রা এবং উহাদের যে কয়েক প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা আলোচ্য মুদ্রাসংগ্রহে পাওয়া যায় নাই তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকার শেষাংশে গ্রন্থকার গুপ্তমুদ্রার ভৌলরীতি এবং উহাতে যে সকল চিহ্নাঙ্কের ব্যবহার দেখা যায় ও উহা হইতে গুপ্তকালীন বেশভূষা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গুপ্তযুগীয় নরনারীর বেশভূষার উদাহরণ স্বরূপ যে সকল চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, স্থলান্তরে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে গুপ্তরাজ্যগণের স্বর্ণমুদ্রা এবং তৎসম্পর্কিত বহু বিষয়ের বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গুপ্তবংশের ঐতিহাসিকের নিকট গ্রন্থখানি যোগ্য সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা গুপ্তবংশীয় মুদ্রালোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতবর্ষে উচ্চকোটির মুদ্রাতত্ত্ববেত্তার সংখ্যা অধিক নহে। অধ্যাপক অলতেকর এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তন্মধ্যে মুদ্রাকর-প্রমাদ এবং ভাষাগত ত্রুটি সহজেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইতে

পারিবে। কোনকোন বিষয়ে গ্রন্থকারের মতামতের সহিত আমাদের মতানৈক্যের অবসর রহিয়াছে। এস্থলে এইরূপ ছই চারটি মতভেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্তবংশের আদিপুরুষের নাম গুপ্ত, ঐগুপ্ত মতে। পশ্চিম ভারতের শকরাজ্য এবং পূর্বোক্ত ভারতের প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্য অবশ্যই আর্য্যাবর্তের অন্তর্গত ছিল। সাগর জেলার অন্তর্ভুক্ত এরণের প্রাচীন নাম ঐরিকিণ, এরকিণ নহে। বেসনগরে প্রাপ্ত কতিপয় মুদ্রায় রামগুপ্ত নামক যে নরপতির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে মগধের গুপ্তবংশীয় মনে করার পক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ডিলসাতে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যার কুশাগদিগকে সিন্ধুনদের তীরভূমিতে বিভাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তির সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে। কামদেবকে ভারতীয় সাহিত্যে কেবল মীনধ্বজ বলা হয় নাট, মকরধ্বজও বলা চইয়াছে। উত্থ্যাদি। অবশ্য এই বিষয়গুলি গুরুতর নহে এবং ইহার জন্য সমালোচা গ্রন্থের মূল্য কেহ কম মনে করিবে না।

এসম্পর্কে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যেসব ব্যাপারের প্রকৃত কারণ আপাততঃ বোধগম্য নহে, কল্পনাবলে উহার কারণনির্ণয়ের চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে সকল এবং সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রকারের কতিপয় ক্ষেত্রে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। অধ্যাপক অলভেকরের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে যখন লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইত কেবল তখনই প্রাচীন ভারতীয়গণ সজ্জিত অর্থ যুক্তিকার নিয়ে প্রোথিত করিয়া রাখিত। তাই তিনি স্থির করিয়াছেন যে, কন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রথম ভাগে বায়ানার নিকটে বিসহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিকাগর্ভে প্রোথিত করিবার কারণ ঐ অকালে তৎকালসংঘটিত হুণআক্রমণজনিত রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যতীত অন্যর কিছু নহে। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকারের ধারণাটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। খৃষ্টিাব্দিকার কালে শূশাসনের কালে দস্যুর উপদ্রব প্রশমিত হইবার এবং নানাজাতীয় ব্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সকল যুগেই ভারতের লোকে সজ্জিত অর্থ যুক্তিকাগর্ভে গুপ্ত রাখা সমীচীন বোধ করিত।

এই প্রথা ভারতের গ্রামাঞ্চল হইতে আফ্রিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। সৰ্ব্ব ক্ষেত্রে ইহার সহিত রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্পর্ক করণা নিম্নয়োজন।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা—১৭৫১-১৮৫৫ খ্রীঃ খ্রীঃপ্রসঙ্গ

বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৪৫০

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৫৫ খ্রীঃ) বইটি লিখিয়া খ্রীঃপ্রসঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার সাহিত্য তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নির্ভার পরিচয় দিয়াছেন। লেখক তাঁহার এতদ্ব্যতিরিক্ত ধারাবাহিক বিষয়বস্তুর সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন মহারাষ্ট্রপুরাণ (১৭৫১) হইতে সাঁওতাল-হাঙ্গামা সম্পর্কীয় ছড়া (১৮৫৫) অবধি। কিন্তু কার্যতঃ ইতিহাসনিষ্ঠ লেখক প্রাচীনতর বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণ করিতে ভোলেন নাই। ফলে ক্রমান্বয়ক্রমিক ভাবে বাঙলা কবিতার ঐতিহাসিক উপকরণ বিশেষতঃ প্রাগাধুনিক বাঙলার বিস্তৃত কাব্যসাহিত্যের একটি জীবন্ত রেখাচিত্র আমরা পাইতেছি। লেখক কেবলমাত্র যথেষ্ট শ্রম ও ধৈর্যসহকারে কাব্য এবং ছড়ার ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট করেন নাই, নিজস্ব পরিচ্ছন্ন মন্তব্য, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কাগজপত্র ও বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা এবং সংকলনের সাহায্য লইয়া তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

বিঃ দ্রঃ—পৃঃ ১৭২ ছন্দক্রমে 'সমাপ্ত' ছাপা হইরাছে—ইঃ মঃ



ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড]

জ্যৈষ্ঠ/শ্রাবণ, ১৩৬২

[চতুর্থ সংখ্যা]

‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’

(একখানি লুপ্ত সংস্কৃত নাটক)

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় উনিবিংশ-শতকের শেষার্ধ্বে যুগ্মসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ ভানু দাজি (Dr. Bhanu Daji) মহাকবি বাণভট্ট-রচিত ‘হর্ষচরিত’ আখ্যায়িকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের একটি সন্দর্ভের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। উক্ত সন্দর্ভের অন্তর্গত নিরোদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি বিশেষভাবে প্রাধিকানযোগ্য—

“অরিপুরে চ পর-কলত্র-কামুকং কামিনীবেশ-গুপ্তচ চন্দ্রগুপ্তঃ শক-পতিমশাতয়ৎ।” (১)

দ্বিষাষঘাতক গোড়াধিপ-কর্তৃক অগ্রজ মহারাজ রাজ্যবর্ধনের নিধন-বার্তা শ্রবণে যখন কুমার হর্ষবর্দ্ধন অত্যন্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তখন ‘অশেষ-গজ-সান্নাধ্যাকৃত’ (গজাধক্ষ্য) স্বন্দগুপ্ত (২) ভ্রাতৃ-শোক-বিমূঢ়-চিত্ত

(১) দ্রষ্টব্য : *The Literary Remains of Dr. Bhanu Daji* pp-193-94.

(২) “Skandagupta is probably the same Skandagupta that is mentioned as a great officer of Harsa in the Madhuban inscription (Epigraphia Indica, VIII. p-155)” — *Notes on Harsa Charita* P. V. Kane.

কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি-বিশ্বাসিতার পরিণাম সম্পর্কে যে সকল উদাহরণ উল্লেখ করেন, উদ্ধৃত পংক্তিতে ‘কামিনী-বেশ-গুপ্ত’ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক ‘পরকলত্র-কামুক’ শকপতির বধ তাহাদের অন্ততম। (৩) কোন্ চন্দ্রগুপ্তের কথা বাণভট্ট এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন? ‘পর-কলত্র কামুক, শকপতিই বা কোন্ শক-পতি?

চন্দ্রগুপ্ত ‘কামিনী-বেশ-গুপ্ত’ হইয়া কেনই বা তাহাকে হত্যা করিলেন? দৃষ্টান্তটি যেন কোনও ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ ভাউ দাঞ্জিও সেই ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত টীকাকার-গণের ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও বিমুখতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ‘হর্ষচরিতে’র সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শঙ্কর ওঁহার ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন—

“শকানামাচার্য্য : শকাধিপতিঃ চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রাতৃজায়াঃ

ঋবদেবীঃ প্রার্থয়মান-শচন্দ্রগুপ্তেন ঋবদেবী-বেশধারিণা

দ্রৌবেষ-জন-পরিবৃত্তেন রহসি ব্যাপাদিত :—ইতি।”

শঙ্করের উদ্ধৃত টীকাংশ হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, শক-পতি চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃজায়াকে প্রার্থনা করিলে, চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং দ্রৌলোকের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া দ্রৌ-বেশধারী নানা-পরিজন-পরিবৃত্ত অবস্থায় নির্জনে সেই পরকলত্র-কামুক শকাধিপকে হত্যা করেন। টীকাকার চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃজায়ার নামও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—ওঁহার নাম ‘ঋবদেবী’। মহাভারতের ‘বিরাট-পর্বে’ ভীমসেন-কর্তৃক দ্রৌপদী-কামুক রাষ্ট্রিয়-শ্রালক কীচকের বধোপাখ্যান এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়িবার কথা।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত-পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয় চন্দ্রগুপ্তের মহিষীর নাম ছিল ‘ঋবদেবী’ বা ‘ঋব-কামিনী’। টীকাকার

(৩) “The following passage contains numerous interesting stories of love and intrigue. They appear to have a historical basis ; many of them occur in the *Arthasastra* of Kautilya ; a few in the *Kamandakeya nilisara* and in the *Brihatsamhita*”—
Kane, Notes.

যে তথ্য উদ্ঘাটন করিলেন, তাহাতে মনে হয় ঋষদেবী প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠাভায়া ছিলেন। তবে কি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠাভায়াকেই বিবাহ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠাভায়া নাম তাহা হইলে কি? ইতিহাস তা' সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্তক! তৎকালে ভিন্সেন্ট স্মিথ, প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু টীকাকার শব্দের উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অলৌক কিংবদন্তী বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। (৪)

(২)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে *Indian Antiquary* পত্রিকায় রঙ্গস্বামী সরস্বতী একটি প্রবন্ধে 'হর্ষচরিতের' উদ্ধৃত সম্বন্ধ-সম্বন্ধে নূতনভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করেন। (৫) তিনি ধারাবিধি ভোজ-দেব-রচিত 'শূদ্র-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত একখানি লুপ্ত সংস্কৃত নাটক হইতে তিনটি উদ্ধৃতি সংকলন করেন। নাটকটির নাম 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত'। উদ্ধৃতিত্রয়ের মধ্যে নাট্যকারের কোনও নামোল্লেখ নাই। নিয়ে 'শূদ্র-প্রকাশে' উদ্ধৃত 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তের' অংশগুলি একত্র সম্বলিত হইল—

[১] স্রীবেশ-নিহুতচন্দ্রগুপ্ত : শত্রোঃ কলাবারম্ অলিপুং (Alipura) শকপতি-বধায়াগমৎ।

[২] দেবী চন্দ্রগুপ্তে বিন্দুযকঃ প্রতি চন্দ্রগুপ্ত :—

'সদ-বংশান্ পুথুর্ষ্য বিক্রমবলান্ দৃষ্টুঃসুতান্ দণ্ডিনঃ
হাস্তশ্চৈব গুহ্যমুখাদভিমুখং নিজ্জামতঃ পর্বতাৎ।
একস্থাপি বিধৃত-কেসর-জটোভারস্ত ভীতা যুগা
গন্ধাদেব হরে-ঐবস্তি বহুবো বীরস্ত কিং সংখ্যা ॥'

[৩] দেবীচন্দ্রগুপ্ত বসন্ত-সেনাযুদ্ধস্ত মাধবশোভিতঃ :—

'মানন্দাশ্রু সিতৈতরোৎপলরূঢ়ো-রাবতঃ।
প্রত্যঙ্গেষু বরাননে ! পুলকিসু শ্বেদং সমাতয়ত।

(৪) ব্রহ্মা : ভিন্সেন্ট স্মিথ, প্রমুখ *Early History of India*, p. 292 (Third Edition).

(৫) '*Devi Chandraguptam or Chandragupta Vikramaditya's Destruction of the Saka Satrap*'—by A. Rangaswami Sarasvati, B. A.,

কুর্বাণে নিতব্রয়ো-রূপচয়ং সম্পূর্ণয়ো-রূপ্যসৌ

কেনাপ্যম্পৃশতোহপ্যাথো নিবসনগ্রাস্তি-স্তবোচ্চাসিত : ৪'

'শূদ্রার-প্রকাশে'র প্রথম উদ্ধৃতিটি যে 'হর্ষচরিতে'র আলোচ্য পংক্তিটিরই আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র, তাহা অংশবশত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানেও 'দ্রাবী-নিরুত' চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক শকপতি-বধের ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ থাকিলেও 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কোনও উল্লেখ নাই বটে; কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সেই একই চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ থাকায়, প্রথম উদ্ধৃতিতেও যে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেরই আখ্যানভাগ সৃষ্টিত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু 'শূদ্রার-প্রকাশে' উদ্ধৃত অংশত্রয় হইতে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট হয় না।

'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' রূপকখানি সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তৃততর আলোচনা করেন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাচ্যবিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ মঁ: সিল্ভার্স লেভি। তিনি ১৯২৩খ্র : *Journal Asiatique* পত্রিকায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক দুইখানি অঙ্কিত নিবন্ধের সন্ধান দেন। একটীর নাম 'নাট্য-দর্পণ'-গ্রন্থকার রানচন্দ্র ও গুণচন্দ্র দুইজনই জৈনমতাবলম্বী; অপরটির নাম 'নাটক-লক্ষণ-রত্নাকোষ', গ্রন্থকার সাগরনন্দী। (৬) 'নাট্যদর্পণের' নবাবিস্কৃত পুঁথির মধ্যে ছয়টি বিভিন্ন স্থলে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অংশবিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহা হইতে উক্ত নাটকের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইবার সুযোগ পায়। 'নাট্যদর্পণের' উদ্ধৃতি হইতে আমরা আর একটি নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করি—তাহা হইতেছে, 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অঙ্কিত রচয়িতার পরিচয়। 'বিশাখদেব' বা 'বিশাখদত্ত' যে এই নাটকের রচয়িতা তাহা নাট্যদর্পণকার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশাখদত্তই 'সুপ্রসিদ্ধ 'মুদ্রারাক্ষস' নামক ঐতিহাসিক রূপকেরও

(৬) Deux Nouveaux Traités de Dramaturgie Indienne : *Journal Asiatique* (Octobre—Decembre, 1923). মঁ লেভি এই প্রবন্ধে *Indian Antiquary* (জুলাই, ১৯২০) পত্র প্রকাশিত রত্নাবলী সন্ন্যাসীর পুরোঁরিখিত আলোচনার কোনও উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয়, তৎকালে উহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

প্রণেতা। ঐতিহাসিক রূপক প্রণয়নে যে তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল, তাহা 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সাক্ষ্য দইতে অস্বাভাবিক করা ভুল হইবে না। 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের যে ছয়টি অংশ 'নাট্যদর্পণে' (৭) উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

[১] 'প্রতিমুখ' সংজ্ঞক নাট্যলঙ্কার 'রোধ' নামক অঙ্গের উদাহরণ-স্বরূপ গ্রন্থকার 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' রূপকের একটি দৃশ্য উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশটি 'শকপতি' বধের অব্যবহিত প্রাক্কালে মহারাজ রামগুপ্তের নিকট হইতে কুমার চন্দ্রগুপ্তের বিদায় গ্রহণ-কালীন একটি দৃশ্যের অন্তর্গত। চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রাতৃজায়া' ঐন্দ্রদেবী ও সূত্রধারী কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রতি মহারাজ রামগুপ্তের উক্তি (নেপথ্য হইতে) ব্যাভাষ্যে শ্রবণ করিতেছেন। রামগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকে সোধাধন করিয়া বলিতেছেন—“আমি ঐন্দ্রদেবীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পারি না। তোমার বিরহহৃৎকের লতাংশও ঐন্দ্রদেবীর দ্বারা দূর হইবে না। তোমার প্রতিই আমার প্রগাঢ় প্রীতি, সেইজন্যই আমার যশঃ, এমনকি ঐন্দ্রদেবীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে আমি প্রস্তুত আছি।” (৮) ঐন্দ্রদেবী স্ত্রীবেশধারী কুমার চন্দ্রগুপ্তকে চিনিতে পারেন নাই; তাই অস্বস্তির প্রতি ভর্তুকি এই প্রিয়বচন শ্রবণে অত্যন্ত কাতর হইয়া সঙ্গের সূত্রধারীর সম্মুখে স্বাগত বলিতেছেন—

“হংজে ! ইয়ং সা হৈদিসী অজ্জজ্জউত্তমসু করুণা-পরাহীণদা।...

অহংপি জীবিতং পরিচ্চয়ংতী পটময়রং যোব তুষং পরিচ্চয়িযং।”

—“জায্যপুত্রের আমার প্রতি এইরূপই করুণা!...তুমি আমাকে ত্যাগ

(৭) 'নাট্যদর্পণ,' গ্রন্থানি ১৯২২ খৃঃ Gaskwood Oriental Series গ্রন্থালয় প্রথম মুদ্রিত হয়। বর্তমান আলোচনার উক্ত সংস্করণটিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৮) “রাধা—(চন্দ্রগুপ্তবাহ)

“কৃ-হঃশত্রুপদেভুংসা লতাংশেনাপি ন কমা।

কুপ্যারোপিভ্যশ্রেয়া স্বপর্ষে যশস্য সহ।

পরিভ্যক্তা বয়া দেবী অনৌহিং অন এব বে হ”

করিবার পূর্বেই আমিই নিজ জীবন বিসর্জন দিয়া তোমাকে (রামগুপ্তকে)
ত্যাগ করিয়া যাইব ।” (৯)

[২] দ্বিতীয় উক্তিটি ‘দেবী চন্দ্রগুপ্তের চতুর্থ’ অঙ্কের অন্তর্গত । চন্দ্রগুপ্ত
মাধবসেনা-নারী কোনও পাত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন— (১০)

“প্রিয়ে মাধবসেনে ! আমিদানীং মে বক্সাম্ভাপয় ।

“কঠে কিম্বরকণ্ঠি ! বাহুলভিকাপাশঃ সমাসজ্যতাং

হারন্তে স্তনবাক্ষো মম বলাদ বধ্যাতু পাণিভয়ম্ ।

(৯) “অত্র স্বীবেশনিহুতে চন্দ্রগুপ্তে প্রিয়বচনৈঃ স্ত্রী-প্রত্যয়াৎ ঐবদেব্যা গুপ্তমহ্যা-
সম্ভাররূপত বসনত সম্প্রাপ্তিঃ ।” —নাট্যদর্পণ পৃঃ ৭১ । উক্তত দৃষ্টি যে ‘দেবী-
চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত তাহা ‘নাট্য-দর্পণের’ ১৪১ পৃঃ গ্রন্থকারের
উক্তি হইতে বুঝা যায় । সেই স্থলেও ‘ত্রিগত’-নামক নাট্যালেক্ত উদাহরণরূপে উপরি
নির্দিষ্ট সংলাপই উক্ত হইয়াছে, এবং উহার ভূমিকাধরূপ গ্রন্থকার বলিয়াছেন—
‘ত্রিগতঃ পঞ্চসান্যেন ত্রিসংখ্যত যোজনম্ ।’—ত্রিগতঃ প্রস্তুতাদম্ভত । ত্রিগতমনেকার্থ-
গতম্, (ত্রি ?) পঞ্চস্তানেকার্থত্বাৎ । তেন দ্ব্যর্থমপি । ১২০ দেবী-চন্দ্রগুপ্তে দ্বিতীরেহ-
কে প্রেক্ষতীমামাশাসনায় শকত ঐবদেবী-সম্প্রদানে অত্মাপগতে রাজা রামগুপ্তে-
নারিবধার্থং যিযাতুঃ প্রতিপন্ন -ঐবদেবী-নেপথ্যঃ কুমার-চন্দ্রগুপ্তো বিজয়াম্ভ্যতে ।”

(১০) “প্রার্থনা ভাবচ্যুতম্ ।—ভাবানাং সাধাকলোচিতানাং স্মৃতি-হর্ষণেৎস-
বায়ীনাং যাচনং প্রার্থনা । যথা দেবী-চন্দ্রগুপ্তে চতুর্থেইহ চন্দ্রগুপ্তঃ—“নাট্যদর্পণ
পৃঃ ৮৪ । ‘মাধবসেনা’ সম্ভবতঃ কোনও বেত্তা পাত্রী ; চতুর্থ অঙ্কে বেত্তা পাত্রীর
অবতারগাৎ কি অবসর থাকিতে পারে, তাহা বর্তমানে অনুমান করা কঠিন ।
বেত্তা পাত্রীর উক্তি সাধারণতঃ সংক্ৰান্ত-ভাবা-নিবন্ধই হইয়া থাকে । সুতরাং
চন্দ্রগুপ্ত যে সংক্ৰান্তে মাধব সেনাকে সম্বোধন করিতেছেন, ইহা সন্দেহহীন হইয়াছে ।
এই প্রসঙ্গে প্রসঙ্গিক কান্দীরক আচার্য্য অভিনবগুপ্ত ‘নাট্যশাস্ত্রের’ (১৮.৫৩ মোকের)
ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য—

যদি বা কারণবৃত্ত্যা বেশ-কুলস্বী-কৃত্যোপচার স্যাৎ ।

অবিকৃত-ভাবাচারঃ তত্র তু পাঠ্যং প্রবোক্তব্যম্ ।’ নাট্যশাস্ত্র ১৮.৫০—“অবিকৃত
ভাবা কুলস্বিয়াঃ নৌরসেনী, বেত্তায়াঃ ; সংক্ৰান্তা । আচারঃ কুলস্বিয়াঃ বিনয়প্রদানঃ,
অভ্যাস্যঃ তদ্বিশ্রীতঃ । তথা চ দেবী-চন্দ্রগুপ্তে বসন্তসেনাসুদিত (মাধবসেনাসুদিত ?)
চন্দ্রগুপ্তস্যোক্তিঃ—

আনন্দাক সিত্তভরোৎ পদকটো-স্রাবয়তা-নেক্রয়োঃ—

—অভিনবতারতী (বরোদা সংকরণ) ।

পাদৌ স্বচ্ছবনস্থলপ্রণয়িনী সন্ধানয়েয়েথলা

পূৰ্ণং স্বদগুণবন্ধমেব হৃদয়ং বন্ধং পুন-নাৰ্হতি ॥”

মাধবসেনার প্রতি চন্দ্রগুপ্তের এই প্রেম নিবেদনের প্রসঙ্গ কি, তাহা অসম্ভব
করা কঠিন।

[৩] ‘নাট্যদর্পণের’ তৃতীয় উচ্ছৃতিটি ‘দেবী চন্দ্রগুপ্তের’ কোন অঙ্ক
হইতে গৃহীত, তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত ভাড়ায়া
ঋষদেবীর মলিন মুখমণ্ডল দেখিয়া স্বগত আক্ষেপ করিতেছেন—

“চন্দ্রগুপ্ত :—(ঋষদেবীং দৃষ্ট্বে। স্বগতমাহ) ইয়মপি দেবী তিষ্ঠতি । যৈষা—

“রম্যাং চারতি কারিনীঃ চ কক্ৰণাং শোকেন নীতা দশাঃ

তৎকালোপগতেন রাহু শিরসা গুপ্তের চান্দ্রী কলা ।

পত্ন্যাঃ ক্রীষজ্জনোচিতেন চরিতেনানেন পুংসঃ সতো

লজ্জা-কোপ-বিষাদ-ভীত্যরতিভিঃ ক্ষেত্রীকৃত্য তামতি ॥”

“রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকলার ন্যায় শোক পীড়িতা দেবী এই কক্ৰণ অবস্থাতেও
স্বমণীয়তা ত্যাগ করেন নাই। তর্ক্যার (রামগুপ্তের) ক্রীষোচিত ব্যবহার-
দর্শনে যুগপৎ লজ্জা, কোপ, বিষাদ, ভীতি ও বৈমনস্কের দ্বারা তিনি সহগ্র ॥”

‘নাট্য-দর্পণ’-কার উদ্ধৃত অংশের প্রকরণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“অত্র ঋষদেব্যভিপ্রায়স্থ চন্দ্রগুপ্তেন নিশ্চয়ঃ ।”(১১)।—“চন্দ্রগুপ্ত এই ম্লোকে
ঋষদেবীর হৃদগত অভিপ্রায় নিশ্চিতভাবে অসম্ভব করিয়াছেন।” আমরা
দেখিয়াছি দ্বিতীয় অঙ্কে চন্দ্রগুপ্ত শকপতিবধার্থ যাত্রার প্রাক্কালে অত্র
রামগুপ্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং তাহার পূর্বেই তিনি
ঋষদেবীর অন্তরের বেদনা নির্ধারণ করিয়াছেন। অতএব উদ্ধৃত শ্লোকটি যে
দেবী চন্দ্রগুপ্তের প্রথম অঙ্ক হইতে সংকলিত তাহা অসম্ভব করা ভুল হইবে না।

[৪] ‘দেবী চন্দ্রগুপ্তের’ চতুর্থ উচ্ছৃতিও সম্ভবতঃ চতুর্থ অঙ্ক হইতেই
সংগৃহীত, যদিও ‘নাট্যদর্পণ’-কার ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন নাই।
এখানেও কুমার চন্দ্রগুপ্ত মাধবসেনানারী বেষ্ঠা নাট্যিকাকে সম্বোধন করিয়া
বলিতেছেন—(১২)

(১১) নাট্যদর্পণ, পৃঃ ৮৮।

(১২) “ভদ্রা চ বেষ্ঠায়াং নাট্যিকারাম্বিনয়রহিতমপি চেষ্টিতং নিবধ্যতে। বধা
বিশাখ-দেবকৃত্তে দেবী-চন্দ্রগুপ্তে মাধবসেনাঃ সমুদ্বিত কুমার-চন্দ্রগুপ্তস্যোক্তিঃ—”
নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১১৮।

“আনন্দাশ্রমঃ সিতোৎপলরূচো-রাবয়তা নেত্রয়োঃ”—ইতি । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ‘নাট্যদর্পণ’কার ‘দেবীচন্দ্রগুপ্ত’ রূপকথানিকে প্রকরণ জাতীয় রূপক-ভেদের উদাহরণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে কল্লুকী সম্রাট, বিদুষক প্রভৃতি নাটকীয় পাত্রের অবতারণা অন্তর্ভুক্ত; উহাদের পরিবর্তে যথাক্রমে দাস, শ্রেষ্ঠী, বিট প্রভৃতির নিবন্ধনই বিহিত হইয়াছে ॥(১৩)

[৫] ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’র পঞ্চম উদ্ধৃতিটি প্রথম উদ্ধৃতাংশ হইতে অভিন্ন । জীবৎধারী কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রতি মহারাজ রামগুপ্তের প্রিয় সম্ভাষণ দেবী কুব্জামিনী কর্তৃক লক্ষসাম্যবশতঃ ভিন্নার্থে গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে । অতএব উহা ‘ত্রিগত’-সংজ্ঞক ‘বীজদে’র উদাহরণ-স্থল—

“এতৎ স্ত্রীবেশধারি-চন্দ্রগুপ্ত বোধনার্থমভিহিতমপি বিশেষতঃ-সাম্যেন দেব্য। জীবয়ঃ প্রতিপদম্ ইতি ভিন্নার্থযোজনম্ ॥” (১৪)

[৬] ‘নাট্যদর্পণ’র চতুর্থ বিবেকে ‘প্রাবেশিকী’ (১৫) ও নৈজামিকী (১৬) ‘কবিক্রবার’ উদাহরণরূপে ‘দেবী চন্দ্রগুপ্ত’র পঞ্চম অংক হইতে দুইটি প্রাকৃত আখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে । প্রথমটি পঞ্চমাত্তর প্রারম্ভ হইতে এবং দ্বিতীয়টি পঞ্চমাত্তর অবসান হইতে ।

(১৩) “দাস-শ্রেষ্ঠী-বিটৈ-গুজ্জন”—ইতি । দাসো জীবিতোংদি বেৎনজীভো বাগ্যাৎ প্রভৃতি পোবিতো বা । শ্রেষ্ঠী বনিক্-প্রধানম্ । বিটো ধূর্তঃ । তত্র কল্লুকিয়ানে দাসঃ । সম্রাট্যানে শ্রেষ্ঠী । বিদুষকিয়ানে বিটঃ । উপলক্ষণং চৈতৎ, তেনাপরবসি চাটুকর-মহায়া দিকং বনিগাদোচিত্যেন নিবন্ধনীয়ম্ ।”—নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১১৮ । কিন্তু ‘মূলারপ্রকাশে’ সংগৃহীত ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’র দ্বিতীয় উদ্ধৃতির অবতরণিকাগ্রণে বিদুষকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।—‘দেবী-চন্দ্রগুপ্তে বিদুষকঃ প্রতি চন্দ্রগুপ্তঃ’ ।

(১৪) “ত্রিগতং লক্ষসাম্যেন ভিন্নল্যার্থত যোজনম্”—নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১৪১-১৪৩ ।

(১৫) “প্রবিনতঃ পাতঙ্গ্য রস-ভাব-প্রকৃত্যবস্থাদিকং প্রবেশ-শব্দেন উচ্যতে । তদনুসারেণ রস-সমানোক্ত্যাদ্যলঙ্ঘনং যৎ রূপকং গীয়তে সা প্রবেশঃ প্রয়োজনবস্যা ইতি ইকপি-প্রাবেশিকী ।”—নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১২৩ ।

(১৬) “অঙ্কক্ষেত্ৰকমণ্যে বা সন্নিবিষ্টং বুদ্ধাৎ পাতঙ্গ্য বহি নিঃসরণং নিষ্করণঃ । তৎ প্রয়োজন। অল্পপতিবাদে-রাক্তিগণবাদ ইকপি উভয়পদবৃত্তৌ নৈজামিকী ।”—ঐ.

[ক] “যথা বা দেবী-চন্দ্রগুপ্তে পক্বেহং—

‘এসো সিয়-কর-বিখর-পণাসিয়াসেস-বেরি-তিমিরোহো ।

নিয়-বিহিবসেণ চংদো গয়ণ-গহং লংঘিউং বিসই ৷”

—অর্থাৎ “উক্ত কিরণজালের সাহায্যে তিমিররূপ শত্রুগণকে নিঃশেষে প্রণালিত করিয়া নিজ অদৃষ্টবশে চন্দ্র পুনরায় গগনরূপ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন ।”

অন্তের প্রারম্ভেই কবি এই ‘ঐক্য’র সাহায্যে কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ সূচনা করিয়াছেন । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ‘বেরি-তিমিরোহো’ (যং বেরি তিমিরোহঃ), ‘চংদো’ (সং চন্দ্রঃ) প্রভৃতি শব্দ দ্বার্থ প্রতিপাদক । ‘নাট্যদর্পণ’-কার উক্ত ঐক্যটির প্রকরণ নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“ইয়ং স্বাপায়-শক্তিঃ কৃতকোদন্তস্য কুমার-চন্দ্রগুপ্তস্য চন্দ্রোদয় বর্ণনেন প্রবেশ-প্রতিপাদিকা” —নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১৯৪ ।

সুতরাং কুমার চন্দ্রগুপ্ত শকপতির নিধনের পর নিজের কোনও বিপদ আশঙ্কা করিয়া নিখোঁয়াছাদের ভান করিয়াছিলেন, পক্ষম অন্তে কৃতকোদন্ত কুমারের প্রবেশ সূচিত হইয়াছে, ইহা নাট্য-দর্পণকারের উক্তি হইতে স্থিতে পারা যায় ।

(খ) “যথা দেবী চন্দ্রগুপ্তে পক্বেহং—

“বহুব্রিহ-কক্ষ-বিসেসং অইগুচং নিনহবেই ময়ণাদো ।

নিক্খলই থুঙ্ক-চিস্তউ রতাহত্তং মণো দিউণো ৷” ইতি ।

—ইহার ব্যাখ্যায় ‘নাট্যদর্পণ’-কার বলিয়াছেন—

“ইয়ম্ উদ্বাস্তস্য চন্দ্রগুপ্তস্য মদনবিকার-গোপন-পরস্য মনাক্-শত্রুভীতস্য রাজকুল-গমনার্থে নিরুন্নমূচিকেন্দি ।”

অর্থাৎ, উক্ত গাথায়, চন্দ্রগুপ্ত প্রণয়জনিত নিজের চিন্তাবস্থা গোপন করিবার জন্য উদ্বাস্ততার অভিনয় করতঃ শত্রুভীত অবস্থায় রাজকুলে অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন ইহা সূচিত হইয়াছে । প্রকরণটি তত স্পষ্ট নহে । চন্দ্রগুপ্তের এই মদনবিকার বা প্রণয় চাকল্যের অবলম্বন কে ? দেবী ঐক্যমামিনী কি ? অথবা পূর্বাভিযুক্ত মাধবসেনা নাম্নী গণিকা ? উক্ত ঐক্য চন্দ্রগুপ্তের শত্রুভীত অবস্থায় শত্রুপুত্রী হইতে (নিহত শকপতির কন্যাবার ?) নিরুন্নমণ ও রাজকুলে অভিমুখে যাত্রাই সূচিত হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, শকপতিকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্ত

ভ্রাতৃজায়া ঋষ্যামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ঐর্ষ্যাপরায়ণ অগ্রজের হস্ত হইতে রক্ষা-লাভের জন্য উদ্বৃত্ততার অভিনয় করতঃ রাজপুরী হইতে পলায়ন করেন, ইহাই উক্ত গাথা হইতে অনুমান করা যায়।

—“There was an estrangement between the two brothers, and Chandragupta presumably afraid of his elder brother's design on his life, pretended madness (১৭)

এই ব্যাখ্যা কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহা বিচার্য্য।

যতদূর মনে হয়, ‘দেবী চন্দ্রগুপ্ত’ রূপকটিতে পঞ্চমাস্কের পরও আরও দুই একটি অঙ্ক ছিল। কিন্তু পরবর্তী কোনও অঙ্ক হইতেই আর কোনও অংশই সংকৃত নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক কোনও নিবন্ধেই উক্তও হইতে দেখা যায় না। সুতরাং রূপকটির পরবর্তী আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে কোনও স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। তবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত অগ্রজ রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া ভ্রাতৃজায়া ঋষ্যদেবীকে মতিধীরূপে গ্রহণ করেন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করতঃ ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধিতে ভূষিত হন।

(৩)

‘দেবী-চন্দ্রগুপ্তের’ আখ্যানভাগ-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এই প্রসঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন পাঠকের মনে উদ্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। বিশাখদত্তের লুপ্ত রূপকটিতে কুমার চন্দ্রগুপ্তের অগ্রজ ‘রামগুপ্ত’, এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে কি সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকাল অতীত হইবার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্তই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন? কিন্তু গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে রামগুপ্তের কোনও উল্লেখই নাই। তাঁহার নামান্বিত কোনও মুদ্রাও এ’পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। (১৮) নাটকে দেবী ‘ঋষ্যামিনী’

(১৭) The Classical Age (Bharatiya Vidya Bhavan), p 17.

(১৮) ভুলনীঃ: “It may be mentioned that a few coins (fourth century A. D.) of Rama-Gupta have recently been found near Bhilai (JNSI, XII, 193ff) and other places. This Rama-Gupta may have been a local ruler of Malwa.—The Classical Age. পৃ: ১৭, পাদটীকা ১।

হুমার চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃত্বাধিকারে অধিকৃত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনসমূহে 'ঋবস্বামিনী' বা 'ঋবদেবী' স্পষ্টতঃ 'চন্দ্রগুপ্ত-পত্নী' রূপে কথিত হইয়াছেন। (১৯) সুতরাং নাটকের সাক্ষ্য বার্থ হইলে, মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে ভ্রাতৃত্বাধিকারে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়। হয়ত, রামগুপ্তের জীবননোচিত চরিত্র গুপ্তবংশের পক্ষে কলঙ্ক-দায়ক বিবেচনা করিয়া পরবর্তী শাসনাদিতে তাঁহার নামপর্যায় উল্লিখিত হয় নাই। (২০) ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রামগুপ্তের অস্তিত্ব ও গুপ্তলেখমালায় তাঁহার অনুলেখ সত্ত্বে এইরূপ ব্যাখ্যা অসমীচীন না হইলেও, চন্দ্র-গুপ্তের সিংহাসনারোহণ বিষয়ে একটি সমস্যা ইতিহাসের দিক দিয়া সমাধান করা কঠিন হইয়া পড়ে। গুপ্ত-লেখমালায় মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে 'মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরিগৃহীত' বলিয়া প্রায়শঃই নির্দেশ করা হইয়াছে। (২১) সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয়

(১৯) অষ্টকঃ: "মহারাজাধিরাজ-ঐচন্দ্রগুপ্ত-পত্নী-মহারাজ-ঐগোবিন্দগুপ্তমাতা মহাদেবী ঐঋবস্বামিনী" —ভাঃ রথ্ কর্তৃক 'বসন্ত' (প্রাচীন 'বৈশালী') বননকার্যের সময়ে আবিষ্কৃত মুদ্রা।

(২০) তুলনীয়: "নানাপি গৃহভোক্তা পাপকারিণঃ পাপনামেন লিপ্যত ইব যে জিহ্বা"—"হর্ষচরিত্তে"র গোড়াপি শব্দক সম্বন্ধে মহারাজ ঐহর্ষদেবের উক্তি।

(২১) অষ্টকঃ: "মহারাজাধিরাজ-ঐসমুদ্রগুপ্তস্যপুত্র-গুপ্তপরিগৃহীতো মহাদেব্যোঃ বক্তব্যেব্যুপনঃ বরমপ্রতিষ্ঠপঃ পরবতাগবতো মহারাজাধিরাজ-ঐচন্দ্রগুপ্ত..."—"the glorious Chandragupta II, who was accepted by him (i. e. by Samudragupta)" এলাহাবাদ হরিষেন-প্রশস্তিতেও সমুদ্রগুপ্ত বরং পিতা মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উত্তরাধিকারি-রূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত আছে। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদ প্রশস্তির 'আর্যো হীতু্যপভব'—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ভাঃ ক্লীট্ যে মতব্য করিয়াছেন, তাহা প্রমিধানযোগ্য—

"This verse seems to indicate that Chandragupta I specially selected Samudragupta, from among several brothers, to conquer the land and to succeed him on the throne.—A clear indication of some such custom of selection is afforded by the epithet *tat-parigrihita*, 'accepted (as his favourite son and chosen successor) by him (Samudragupta),' which is always applied to Chandragupta II in the genealogical passages; eg. in line 9-10 of his Mathura inscription, No. 4 below, Part III A..."—*Gupta Inscriptions*, পাদটিকা ১, পৃঃ ১২।

চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারিরূপে 'নির্ধাচিত' হইয়াছিলেন, এইরূপই প্রতীতি হয়। কিন্তু তাহা হইলে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' রূপকের সাক্ষ্যের সহিত গুপ্ত-লেখমালায় সাক্ষ্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। কেননা, রাম-গুপ্তই সেখানে 'রাজা' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের লোকান্তরগমনের পর জ্যেষ্ঠ রামগুপ্তই গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, নাটকের সাক্ষ্য হইতে এইরূপ অনুমানই বৃদ্ধিযুক্ত। তবে, এই বিরোধের সমন্বয় অদ্য একপ্রকারে করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। রূপকটিতে 'রামগুপ্ত'র 'মহারাজ' অথবা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধির পরিবর্তে 'রাজা' উপাধি-প্রয়োগের দ্বারা ইহাও সূচিত হইতে পারে, যে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের জীবিতকালেই রামগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোনও প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গুপ্তলেখমালায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যে 'সমুদ্রগুপ্ত-কর্তৃক পরিগৃহীত' ('তৎ-পরিগৃহীত') বলে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও একটি সম্ভাব্যজনক মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত অগ্রজ রামগুপ্তের ক্রৌঞ্চনোচিত আচরণে বিরক্ত হইয়া কুমার চন্দ্রগুপ্তকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; (২২) এবং ইহা স্বীকার করিলে গুপ্তলেখমালায় রামগুপ্তের নামের অন্বলম্ব ও 'রামগুপ্ত' নামাঙ্কিত গুপ্তযুগের মুদ্রাদির একাধু অভাব— এই দুইটিরই সমীচীন কারণ-নির্দেশ সহজ হইয়া পড়ে।

'দেবা-চন্দ্রগুপ্ত' সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন : চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নিহত শকপতি কে ? ঐতিহাসিকগণ 'মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ'কেই 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' বর্ণিত শকপতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। ৩১০ শকাব্দের (খৃঃ ৫৮৮ অব্দ) 'রুদ্রসিংহ' নামাঙ্কিত একটা মুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং উহাই

(২২) এই প্রশ্নকে প্রতীপকর্তৃক তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র 'দেবাপি'র (মহাভারত, উত্তর-পর্ব, অঃ ১৪৮, শ্লোক ২১-২৭) এবং পিতা সপ্তর্ষি কর্তৃক, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অসমজের (মহাভারত, শান্তিপর্ব, অঃ ৫৭৯) উত্তরাধিকার হইতে বহিষ্কার তুলনীয়।

পশ্চিমভারতে শক-শাসনের সর্বশেষ নিদর্শনরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। (২৩) সুতরাং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কুম্ভসিংহের চতুর্থার পর ভারতে শক-শাসনের অবসান ঘটে, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত। চন্দ্রগুপ্ত শত্রুর স্বপ্নাবারে জীবনেষে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করেন এবং শকাধিপকে চতুর্থার করেন, 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শকপতির সেই স্বপ্নাবার ভারতের কোন্ বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, এইরূপ বিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। সমগ্র 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নাটকখানি যতক্ষণ পর্যন্ত না আবিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনও মোহাসায় উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। তবে ঐতিহাসিকগণ এসম্বন্ধেও বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন। এইপ্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের উপক্রমেই 'হর্ষ-চরিতে'র যে পংক্তিটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 'হর্ষচরিতে'র উক্ত পংক্তিটি নিম্নলিখিতরূপ—

“অরিপুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেশগুপ্তচন্দ্রগুপ্তঃ শকপতি-মশাতয়ং।”

এইস্থলে 'অরিপুর'-শব্দের আপাতদৃষ্টিতে 'শত্রু-রাজধানী' এইরূপ অর্থই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'অরি-পুর' শব্দটিকে শকাধিপতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজধানীরই নামরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষচরিতের প্রাচীন বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে 'অরিপুর' শব্দের পরিবর্তে 'অলিপুর' (Alipura) এবং 'নলিন-পুর' এই দুইটি পাঠভেদও লক্ষিত হইয়া থাকে। ভোজদেবের 'শূদার-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে

(২৩) কুলদীর : 'রাগত্রেতা মহাক্ষয়পদ স্বামি-সত্যসিংহস পুত্রস রাগত্রেতা মহাক্ষয়পদ স্বামী কুম্ভসিংহস'।—“The last notice of the Satraps refers to the year A. D. 388, and the incorporation of their dominions in the Gupta empire must have been effected soon after that date.”—V. A. Smith : Early History. P. 292 (Third Edition).

উক্ত পূর্বোল্লিখিত পংক্তিতে 'অলি-পুর' এইরূপ পাঠই দেখা যায়। (২৪)

অধ্যাপক আল্‌তেকর তাঁহার একটি প্রবন্ধে রাজশেখরের 'কাব্য-, মীমাংসা' গ্রন্থে উক্ত অজ্ঞাত-নামা কোনও কবির একটি শ্লোকের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত'র আলোচনায় শ্লোকটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপ—

“দত্তা রক্তগতিঃ শশাধিপত্যে দেবীং ধ্রুবামিনীং

যস্মাৎ খণ্ডিত সাহসো জিববৃত্তে স্ত্রী-শম'গুপ্তো নৃপঃ।

তন্মিমেব হিমাশয়ে গুরু-গুহাকোণ-কণৎ-কিন্নরে

গীয়তে তব কাশ্তিকৈয় ! নগর-স্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্তয়ঃ ॥” (২৫)

অধ্যাপক আল্‌তেকর অনুমান করেন যে, এই প্রশস্তি-শ্লোকটিতে 'কাশ্তিকৈয়' শব্দের দ্বারা মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার-গুপ্তকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং তাঁহারই পূর্বজ শম'গুপ্তের (পাঠান্তর : রামগুপ্ত) রাজত্ব-দশায় গুপ্তসাম্রাজ্যের কলঙ্কিত শাসন-ব্যবস্থার সহিত কুমারগুপ্তের রাজত্বকালীন গুপ্তসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও গৌরবের তুলনা করিয়াছেন :—

“The verso is addressed to Karttikeya, who is obviously

(২৬) “Here the place where the Sakapati's Camp, বন্দাবার, was laid is called Alipura. The identity of this place deserves to be established. Its name has not been read correctly in the manuscripts of the *Harsacharita*. Dr. Bhau Daji, who first discovered the *Harsacharita* for archaeologists found the reading *Nalinapura* for the name of the place. But soon he found in another manuscript the reading *Alipura*, the enemy's town, which has since been accepted among scholars. This extract from the *Sringaraprakasa* gives the name as *Alipura*, which appears to be the correct form, and which could very easily have been misread both as *Nalina-Pura* and *Aripura*”. Rangaswami Saraswati : *Indian Antiquary* 1923.

(২৭) কাব্যমীমাংসা, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৪৭ (Third Edition, 1931. Gaskw-
ad Oriental Series.)

Kumaragupta I of the Gupta dyansty. Kumara and Karttikeya are synonyms, peacock is the Vahana of the deity and we know that Kumaragupta has struck some coins of the peacock variety. The unknown poet of this stanza is contrasting the prosperous condition of the house under Kumaragupta with the dire distress to which it was reduced under Sarmagupta...Unfortunately we do not know who the author of this verse was, when he flourished and whether he had any reliable historic tradition to rely upon,...it is not therefore unlikely that with a desire of having romantic background and developing a poetic contrast, he may have permitted himself a little liberty with history by changing the name Saka into Khasa." (২৬)

অপরপক্ষে, অধ্যাপক মিরালি *Indian Antiquary* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার এক প্রবন্ধে অধ্যাপক আলতেকরের এই অস্বাভাবিক ভাষ্য বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যমীমাংসায় উক্ত শ্লোকে 'কার্ত্তিকেয়' কুমার গুপ্তের নাম নহে, পরন্তু কাশ্যকৃত্তের গুর্জর প্রতিহার বংশের প্রথম মহীপালদেবের নাম, এবং অজ্ঞাতনামা কবি উক্ত শ্লোকে শকপতির নিকট গুপ্তাধিপত্য লাভ করিয়া (রাম গুপ্তের) অর্ধাঙ্গিকর পরাভবের সহিত তুলনায় মহীপালদেবের পরাক্রম ও ধর্ম-বিজয়ের প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। এই মতের অসঙ্গতত্ব অধ্যাপক মিরালি তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে যে সকল দৃষ্টি দিয়াছেন, সে সকল সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। রাজশেখর স্বয়ং মহীপালদেবেরই সভাকবি ছিলেন, ইহা তাঁহার নাট্যাদির আলোচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তাঁহারই সমসাময়িক কবি কেম্বীষর ও মহীপালদেবেরই সভাসদ ছিলেন, এবং তৎপ্রণীত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের ভরতবাক্যে মহীপালদেবের প্রশংসা-শ্লোকে তাঁহাকে 'কার্ত্তিকেয়' এই সংস্কার দ্বারাই নির্দেশ করিয়াছেন। 'চণ্ডকৌশিক' ভরত-বাক্যটি এ'স্থলে উদ্ধার বোধ্য—

(২৬) Journal of the Bihar Oriental Research Society, Vol, xiv, pt, ii, p,223.

“যেনাদিশ্য প্রয়োগং ঘনপুলকভূতা নাটকস্যাস্য হর্ষাদ্
বহ্নালঙ্কারহেয়াং প্রতিদিনমকুশা রাশয়ঃ সম্প্রদত্তাঃ ।

তস্য কত্রপ্রসূতে-প্রমত্ত জগদ্বিনঃ কাণ্ডিকেশ্বর্য কীৰ্ত্তিঃ
পারে কীরান্যসিদ্ধোয়পি কবিত্বশস্য সার্কমগ্রেসরেণ ॥”

সুতরাং ‘কাব্যমীমাংসা’য় উক্ত প্রশস্তিতে মহীপালদেবেরই ‘খসবিজয়ে’র
মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না ; এবং রাজশেখর
যে তাঁহারই পূৰ্ব্বপোষক কান্যকুব্জেশ্বর মহীপালদেবের প্রশস্তিসূচক কোনও
সমসাময়িক কবিরচিত শ্লোক উদ্ধার করিবেন ইহাও স্বাভাবিক বলিয়াই
মনে হয় । উক্ত শ্লোক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন হইতে পারে : শ্লোকটিতে বলা
হইয়াছে যে, “হিমালয়ের যে দুর্গম প্রদেশ হইতে মহারাজ শর্মগুপ্ত (বা
রামগুপ্ত) শত্রুকর্তৃক নিরুদ্ধগতি হইয়া মহিষী ঋবন্ধামিনীকে শত্রুহন্তে সমর্পণ
করতঃ পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ সেই হিমালয়ের গুহা
গহ্বরেই মহারাজ মহীপাল দেবের কীর্ত্তিরাজি পুরনারীগণ কর্তৃক নির্ভয়ে গীত
হইয়া থাকে ।”—ইহা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত
কোনও দুর্গম অঞ্চলে মহীপালদেব খসাম্বিপত্রকে পরাজিত করেন এবং উক্ত
প্রদেশেই পূর্বে গুপ্তবংশোদ্ভূত শর্মগুপ্ত (বা রামগুপ্ত) খসাম্বিপ কর্তৃক পরাজিত
হইয়া ঋবন্ধামিনীকে শত্রুহন্তে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হন ।
রাজশেখর তাঁহার ‘প্রচণ্ড-পাণ্ডব’ নাটকের ‘প্রস্তাবনা’য় মহীপালদেবের
প্রশস্তি প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকে তাঁহার বিভিন্ন জনপদ বিজয়ের উল্লেখ
করিয়াছেন —

“নমিত-মুরল-মৌলিঃ পাকলো মেকলানং

রূপকলিত-কলিঙ্গঃ কেলিতটু কেরলেন্দোঃ ।

অজনি জিতকুলুতঃ কুণ্ডলানং কুঠারো

হঠ-কৃত-রমঠ-শ্রী : শ্রীমহীপাল দেবঃ ॥”

এই শ্লোকে মহীপালদেবকে ‘জিতকুলুতঃ’ অর্থাৎ ‘কুলুত-জনপদ-বিজয়ী’
বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে । কানিংহাম তাঁহার Ancient Geogra-
phy of India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কুলুত-জনপদটিকে ভারতের উত্তর
পশ্চিম প্রান্তস্থিত পাঞ্জাব ও কাবুল প্রদেশের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন । মহীপালদেব যে উক্ত প্রদেশের শাহি নৃপতিকে পরাজিত
করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটি বিজুহৃষ্টি উদ্ধার করেন, ইহারও

ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। (২৭) স্মৃত্যং উক্ত অঞ্চলেই রামগুপ্তের সহিত লকাধিপেরও বিরোধ হয়, এবং রামগুপ্ত মহিষী ক্রবদেবীকে শত্রুহন্তে সমর্পণে প্রবৃত্ত হন। 'কাব্যমীমাংসা'র উক্ত শ্লোকের দ্বারা ইহাই স্মৃতিত হইয়াছে। (২৮) হর্ষচরিতের আলোচ্য পংক্তিতে 'অরিপুর' অথবা 'নলিনপুর' পাঠের পরিবর্তে 'নলিনপুর' এইরূপ পাঠও দেখা যায়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই নলিনপুরই চৈনিক পরিভ্রাজক ইয়ুয়ান্ চুয়াং বর্ণিত কুপ্ত জনপদবর্তী 'Teng-Kuang' নগরী, ওয়াটাঙ্গের মতে যাহা 'পদ্মপুর'। স্মৃত্যং 'কাব্যমীমাংসা'র উক্ত শ্লোকের সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা 'নলিনপুর' পাঠই সমর্থিত হয়। অতএব অধ্যাপক মিরাসির নিম্নোক্ত উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়—

"This *Alipura* must have been situated somewhere in or near the ancient country of *Kuluta*. It is also possible that the real name of the capital was *Nalinapura*, as stated in a Ms. of the *Harsba-charita*. The identification of *Nalinapura* with *Hsuan-tsang's Teng-kuang* is, therefore, supported by the passage in the *Kavya-mimansa* as well...As Watters has pointed out one name

(২৭) "Mahipala had conquered Sahi, the King of Kabul and the Punjab, and forced him to surrender a beautiful image of Vishnu."—V. V. Mirashi, *Indian Antiquary*, vol. XLII.

(২৮) "The words বসাদিপতি, বসাদ and ভবদেব হিমালয়ে in the verse undoubtedly show that বস King as spelt in the MSS. of the *Kavya-mimansa* may be better identified with one of the Kushana Kings of the western Punjab and not with the Saka Kahatrpa either of Mathura or Malwa, and that the war between the বস King and Ramagupta or Sarmagupta took place exactly in the portion of the Himalayas lying between the two kingdoms...বস is often loosely used to denote even the non-Saka foreign tribes."—*Kavya-mimansa—Notes*. (GOS. Edn.). 1934. (Third Edition).

for the city was Padmapura ('lotus city') which is only a synonym of Nalinapura."

কিন্তু শকপতির স্বম্ভাবার সম্পর্কে কোনও অস্থানই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না।

(৪)

'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' রূপকটির আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার বিশাখদেবের কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুরোপীয় গবেষকগণের মধ্যে অনেকেই বিশাখদেব বা বিশাখদত্তকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকের লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাдиভ্যের সমকালীন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। শেযোক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ৬কাশীপ্রসাদ জয়শঙ্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের 'ভরত-বাক্য' আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—

"The bhārata-vākya to the play names the reigning monarch 'at present' ...may long reign King Chandragupta." (২৯)

তিনি যে সকল যুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও, 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের খণ্ডিত অংশগুলির আলোচনা করিলে, এইরূপ ধারণা জন্মানই স্বাভাবিক যে নাট্যকার যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তখনও পর্য্যাপ্ত জনসাধারণের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমূল হইয়া যায় নাই; তখনও দর্শকগণ নাটকবর্ণিত ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর পটভূমিকার সহিত পরিচিত ছিলেন। এই স্থলে আর একটি অভিনব তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যশোধর্মদেবের মন্দশোর প্রাশস্তি'র কয়েকটি শ্লোকাংশের সহিত বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের কয়েকটি শ্লোকাংশের ভাব ও ভাবার দিক্ দিয়া ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের 'ভরতবাক্য'—'মৈত্রৈক্যেভ্যামান্য ভূজয়ুগমধুনা—'

এই শ্লোকটির সহিত উক্ত প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্লোকের উত্তরার্ধের তুলনা করিতে পারি :—

“আবিহুঁতাবলৈপৈ-রবিনয়পটুভি-লজ্জিতাচারমার্গৈ
মোহামৈদংযুগ্মনৈ রপত্ততরতিভি : শীড়্যমানা নরৈশ্চৈ : ।
যন্ত য়া শাস পাণেরিব কঠিনধর্মুর্জ্যাকিণাষপ্রেক্ষাঃ
বাহং লোকোপকারব্রতসকলপরিম্পদধীরং প্রপন্ন।”

আবার, ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের তৃতীয়াক্ষের ‘আঠৈশলৈশ্চাচ্ছিতাভ্য কুভিতঃ শূরনদী- শীকরাসারশীতাৎ—’ এই শ্লোকের সহিত ‘মন্দোরে প্রশস্তি’র ৫ম শ্লোক ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের উত্তরার্ধ’ বিশেষভাবে তুলনীয় :—

“আ লৌচিত্যোপকর্ষাৎ তলবন গহনোপত্যকাদামহেশ্বাদ
আ গন্দারিষ্টমানো-স্তহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাঙ্গপদ্যোভৈ : ।
সামন্তৈ-র্ধন্ত বাহু-জবিণ-জ্ঞতমদৈঃ পাদয়ো-রানমদভি—
শৃড়ারহাঃশুরাজিহ্যতিকরলবলা কৃমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে ॥ ৫ ॥
“নীচৈ-স্তেনাপি যন্ত প্রগতি-ভূজবলাবর্জন ক্রিষ্টম্ভূ।
চূড়াপুষ্পোপহারৈ-নিহিরকুলনুপেণাজিভং পাদযুগ্ম ॥ ৬ ॥

এই তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয় যে, ৫৮৯ মালবান্দে (খৃঃ অঃ ৫৫২) রচিত ‘মন্দোরে প্রশস্তি’র উপর বিশাখদেবের মুদ্রারাক্ষসেরই রচনার প্রভাব পড়িয়াছে। সুতরাং উহার পূর্বেই ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকটি সাদরে আলোচিত হইত, ইহাই অসম্ভবমান করা যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য বিপরীত অসম্ভবমানও করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশাখদেবের দ্বায় একজন নিপুণ নাট্যকার একটি প্রশস্তি হইতে তাঁহার নাটকীয় বস্তুর ভাব ও ভাষা আহরণ করিবেন, ইহা অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। অতএব খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই ‘মুদ্রারাক্ষস’ ও ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’ এই দুইখানি রূপকই প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই বিচারসহ।

যশোধর্মদেবের ‘মন্দোরে-প্রশস্তি’র সাক্ষ্যের গুরুত্ব অবীকার করিলেও, অল্প আর একদিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বিশাখদেবের কাল যে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠশতকের পূর্ববর্তী ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বাণভট্ট হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্চাঙ্গে যে প্রকরণে ঋষদেবী ও চন্দ্রগুপ্তের আখ্যানের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নাটকবর্ণিত উক্ত

ঐতিহাসিক আখ্যানভাগই বাণভট্টের উপজীব্য ছিল। এই অসুস্থমান যদি অসম্ভব না হয়, তবে হর্ষচরিত রচনার বহু পূর্বেই যে বিশাখদেবের (৩০) 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' রূপকখানি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিশাখদেবের আবির্ভাব-কাল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অথবা কুমার গুপ্তের রাজত্ব-কালের অন্তর্গত হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রগুপ্ত-প্রবদেবী বিষয়ক এই আখ্যানভাগ বহুল প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেন না, খ্রীষ্টীয় নবম শতকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষের 'সত্রচন' তাম্রশাসনের একটি প্রশস্তি-শ্লোকে চন্দ্রগুপ্ত কড়ক ভ্রাতৃত্বত্যা

(৩০) ন. সিল্ড'গ লেডি তাঁহার পুর্বেলিখিত প্রবন্ধে এইরূপ অসুস্থমানই করিয়াছেন। 'হর্ষচরিত'র টীকাকার শঙ্করের সময়েও 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' রূপকখানি প্রচলিত ছিল বলিয়া তিনি অসুস্থমান করেন :—

"C'est clairement l'affabulation de notre drame, et il est probable que Sankara connaissait encore le Devi Candragupta de Visakhadatta. Une autre question vient alors se poser : Bana lui-meme, en citant l'aventure, fait-il allusion au drame ? Beaucoup des histoires qu'il fait rappeler par Skandagupta semblent resumer des themes de nataka et de natika..."

অপিচ—"Il semble impossible desormais de pretendre, comme l'ont fait Speyer, Hillebrandt et Konow, que Visakhadatta ait e'te contemporain de Chandragupta II, ou meme qu'il ait ete contemporain de Skandagupta, comme M. Charpentier le suggerait recemment. Peut-etre convient il de chercher sa date, par hypothese, entre la fin des Gupta et le regne de Harsa, vers le debut du VIIe siecle."

ঐযুক্ত রায়বাহী সরস্বতীও অসুস্থপ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"May it not be that Bana was merely referring to several other historical dramas and poems, when he was recounting the fates of the sovereigns, who lost their lives by treachery or by their own folly ?"

ও ভ্রাতৃত্বাচার বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকটী
নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“ইহা জাতরমেব রাজ্যমহরদ্ দেবীং চ দীনন্তথা।
লক্ষং কোটীমলেক্ষয়ৎ কিল কলৌ দাতা স গুপ্তাশ্রয়ঃ ।
যেনাত্যাজি তনুঃ স্বরাজ্যমসকৃদ্ বাহ্যার্থকৈঃ কা কথা
ব্রীন্তহোমতরাষ্ট্রকুটিলকো দাতেতি কীর্ত্যামপি ।” ১৩১।

কিন্তু রাজশেখরের ‘কাব্যবীমাংসা’র যে শ্লোকটীতে চন্দ্রগুপ্ত ঐন্দ্রদেবী
সম্বন্ধীয় আখ্যানের উল্লেখ আছে, উহার পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার
বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্লোকটী ‘কথোথঃ বৃন্তেতিবৃন্তঃ’। ‘কথোথঃ’ শব্দের
প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অমরকোষের
লক্ষণানুসারে যদি ‘কথা’ শব্দের অর্থ ‘কাল্পনিক অখ্যান হয় তবে
চন্দ্রগুপ্ত-ঐন্দ্রদেবীবিষয়ক আখ্যানটী কাল্পনিক লোকপ্রবাদমূলক, ইহাই
রাজশেখর নুচেনা করিয়াছেন বলিতে হয়। এমনকি, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের

(৩১) Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 248. এই গ্রন্থে মহামহো-
পাধ্যায় ডি. ডি. বিরাণির মতব্য তুলনীয় : “In this verse Amoghavarasa
I, who had cut off and offered a finger of his left hand to Maha-
lakshmi to avert a public calamity and abdicated the throne
more than once in order to devote himself to religious practices
is said to excel the Gupta King Chandragupta II in righteousness
and liberality; for Chandragupta II had caused the murder of his
own brother Ramagupta and remarried his wife Dhruvadevi.
Further, he did not actually confer gifts of a lakh or a crore,
but only caused them to be recorded to make a show of his
liberality. We are not concerned here with the correctness of
the statements of Amoghavarasa's panegyrist about Candra-
gupta's liberality, but the description clearly shows that stories
about the fabulous munificence of Chandragupta II Vikramaditya
were current among the people as late as the 9th Century A.D.”
—The Date of Gatha-Saptasati (Siddha-Bharati, Part II, p. 182).

‘নাট্যমর্পণে’ও ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’ রূপকটীকে ‘কল্পিতবস্তু প্রকরণ’ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকেই ঐকদেবী-চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় আখ্যানভাগের ঐতিহাসিকতা বিশ্বতপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ বিশ্বরণের হেতু কি ? সিল্ভা^১। লেভি তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’ রূপকটির বিলুপ্তি সম্পর্কে যে কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

“Malavikagnimitra, Mudrarakshasa, Devi-Candragupta montrent que le theatre indien ne repugnait pas a porter sur la scene des personnages historiques. L’ent-etre ce genre a ete cultive plus que nous ne l’avons vu ; la perte de Devi-Candragupta est instructive. Ces personnages, dans une Inde qui avait oublie son passo reel devaient s’eclipser devant les grandes creations de l’imagination epique ou religieuse. Le nom de Kalidasa a du sauver Malavika ; le nom de Canakya a du sauver Mudra-raksasa. Mais, d’autre part, le Devi-Candragupta, semble deja s’eloigner beaucoup de la realite historique, avec le roi Ramagupta donne pour le frere aine de Candragupta, avec Dhruvadevi presente comme l’epouse royale de ce Ramagupta, avec la ruine de la dynastie Saka expliquee comme l’issue tragique d’une aventure galante...”

ইহার সারমর্ম : ভারতীয় নাট্যকারগণও যে ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া দৃষ্টকাব্য রচনা করিতেন, তাহার প্রমাণ ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ ‘মুদ্রারাক্ষস’ ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্ত’ প্রভৃতি নাটক। কিন্তু কালক্রমে যখন ভারত তাহার অতীত ইতিহাস বিশ্বত হইতে বসিল, তখন কাল্পনিক বা ধর্মমূলক রচনাই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। কালিদাসের কবি খ্যাতির ফলে মালবিকাগ্নিমিত্র লুপ্ত হয় নাই ; ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকখানি যে আজও পর্য্যন্ত আশ্চর্যকর করিয়া আছে, তাহার মূলে আছে চাণক্যের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ‘দেবীচন্দ্রগুপ্তের’ পাত্র পাত্রীগণের (রামগুপ্ত ঐকদেবী প্রভৃতির) সেইরূপ ঐতিহাসিক

প্রখ্যাতির একান্ত অভাব। এবং তাহাই বোধ হয়, ইহার বিস্মৃতির প্রধান কারণ।

যে দেশে প্রধানতম ইতিহাস প্রণেতা মহাকবি কঙ্কণ ইতিবৃত্তের অস্থূলনকে 'শাস্ত্রসো'দ্বোধের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সেদেশে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তের স্যায় ঐতিহাসিক নাটকের বিলোপ বিস্ময়কর নহে।

(৩২) ভুলনীচ : “কণতদিনি অতুনাং স্মৃতিতে পরিচিতিতে।

দুর্ভাভিবেকঃ শাস্ত্র রসজ্ঞাভি বিচার্যতাম্ ॥”

—রাজতরঙ্গিণি, ১, ২৩।

উপরে যে বৌদ্ধধর্মের বিবরণ দেওয়া গেল, সে ধর্ম ভ্রাতৃত্বাধ্যায়ের সংগে পাশাপাশি বিরাজমান ছিল। সে গভীর দার্শনিক ধর্ম সর্বপ্রাণবাদ (animism) ও উদবংশীয়দের উপাসনার (ancestor worship) পরিবেশে খুঁটে অষ্ট্রোএশিয়াটিক জনচিন্তকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কাজেই সে ধর্ম জনগণের ধর্ম হয় নি, রাষ্ট্রধর্মেরও মর্যাদা পায় নি। উভয় স্থান অধিকার করেছিল শৈবধর্ম, যার সংগে আদিম স্থানীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অভিনব সংযোগ সাধিত হয়েছিল, উভয়ের মূলগত ঐক্যের সূত্র অবলম্বন করে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সু-নাম সাম্রাজ্যমৌধ্য ধ্বংস পড়ল ও তার ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে উঠল খুমের বা কখুজ রাজ্য, নিম্ন মেকং নদীর অববাহিকায়। কখুজ রাজ্যের আক্ষণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। এ কথা লিখে গেছেন সপ্তম শতকের শেষভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হি-এনিং। বস্তুতঃ সপ্তম ও অষ্টম শতকে কখুজে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হ'লেও তার প্রভাবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই একই সময়ে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন প্রবাহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করল। সপ্তম শতকে উৎকীর্ণ কখুজের একটি শিলালেখ ইন্দোচীনে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর নামে বোধিসত্ত্বদ্বয়ের উল্লেখ। মহাযান বৌদ্ধধর্মের এ প্রবাহ দ্বীপপুঞ্জেও প্রবেশ করল। তার সাক্ষ্য বহন করে ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সুমাত্রা দ্বীপের পালেস্বজ্জ নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপি। মনে হয়, পূর্ব-ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেরণায় ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের এ প্রসার শুরু হয়, যার পরিণতি দেখতে পাব পাল রাজাদের আমলে।

অষ্টম শতকের শেষার্ধ্বে পূর্ব-ভারতে পাল রাজবংশের আবির্ভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারে এক নতুন যুগের সূচনা করল। প্রায় একই সময়ে আবির্ভাব হ'ল ইন্দোনেশিয়ায় শৈলেন্দ্র রাজবংশের। বৌদ্ধধর্মের প্রসারে পাল রাজাদের সক্রিয় চেষ্টা, পাল ও শৈলেন্দ্র রাজবংশ দ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন, শৈলেন্দ্রগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সে ধর্মের বিস্তারে এক নতুন

অধ্যায় সৃষ্টি করল। মধ্যযবদ্বীপের কলসন নামক স্থানে ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে শৈলেন্দ্র মহারাজ পনংকরন কর্তৃক মহাযান বৌদ্ধ দেবী তারার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। মাত্র চার বৎসর পরে কলসন থেকে অনতিদূরে কেলুরক নামক স্থানে গৌড়দেশ থেকে আগত কুমারঘোষ নামে জনৈক গুরু বোধিসত্ত্ব মল্লভীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কলসন ও কেলুরকের এ লিপি দু'টি যে অক্ষরে লেখা তার উৎপত্তি উত্তরভারতে এবং 'প্রটো-বাংলা' লিপির সংগে তার সাদৃশ্য রয়েছে। এই লিপির প্রয়োগ সাময়িক ভাবে কাম্বুজেও দেখা যায়, নবম শতকের শেষভাগে প্রথম যশোবর্মার সময়ে, যখন সে দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা শুরু হয়। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কি ইন্দোনেশিয়ায় কি ইন্দোচীনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাল রাজবংশের প্রেরণার ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। এ কথাও মনে করা অসম্ভব হ'বে না যে, শৈলেন্দ্র রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই সে ধর্ম ইন্দোনেশিয়া থেকে ইন্দোচীনে প্রবেশ করে।

প্রথম যশোবর্মা (৮৮৯-৯০০ খ্রীঃ অব্দঃ) কর্তৃক একটি বৌদ্ধ আশ্রম (সৌগতাস্রম) নির্মাণ সূচনা করল কাম্বুজ মহাযান বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা। রাজেন্দ্রবর্মার (৯৪৪-৯৬৮ খ্রীঃ অব্দঃ) বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মন্ত্রী কবীন্দ্রারিমথন বৃদ্ধ, বোধিসত্ত্ব বজ্রপাদি ও প্রজ্ঞাপারমিতার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করলেন বাত্-চুম নামক স্থানে তিনটি মন্দির। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বাত্-সিতোর লিপিতে দেখি রাজা পঞ্চম জয়বর্মা (৯৬৮-১০০১ খ্রীঃ অব্দঃ) প্রকাশ্যভাবেই বৌদ্ধধর্ম স্বাক্ষর ভার গ্রহণ করেছেন। কাম্বুজ বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে একটি তুল্যবান ইংগিত প্রদান করে এই বাত্-সিতোর লিপি। এখানে উল্লিখিত আছে যে, জয়বর্মার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মন্ত্রী কীর্তিপতিত, যিনি এই লিপিটি ঘোষণা করেন, তিনি বহু বিলুপ্ত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন, আবার বিদেশ থেকে অনেক নূতন শাস্ত্র আনয়ন করে তাদের অধ্যয়ন প্রবর্তিত করেন। এসকল শাস্ত্রের মধ্যে দু'টির বিশিষ্ট উল্লেখ রয়েছে : মধ্যবিভাগ ও তত্ত্ব-সংগ্ৰহটীকা। এই শাস্ত্রদ্বয়ের উল্লেখ নিঃসংসয়ে প্রমাণ করে কাম্বুজ বৌদ্ধধর্মে অসংগ ও বস্তুবদ্ধ প্রবর্তিত যোগাচার মতবাদের প্রভাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তদশ শতকের তিব্বতীয় লামা তারনাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের

ইতিহাসে ইন্দোচীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বহুবছর শিষ্যদের নিমিষ্ট স্থান প্রদান করেছেন।

এ পর্যন্ত কবুজ মহাবান বৌদ্ধধর্ম রাজশক্তির সমর্থন পেল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে শৈবধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রইল। উদারমতাবলম্বী কবুজ রাজারা রাষ্ট্রে বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হন নি। কবুজ 'রাষ্ট্রধর্ম' বলতে শুধু কোনও রাজার ব্যক্তিগত ধর্মই বুঝাতো না। সে ধর্ম ছিল এব্‌ব্‌ট্টাষ্ট্‌ রাজশক্তিইই প্রতীক। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্মী সিংহাসনারোহণকালে যে শৈব রাষ্ট্রধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রথম সূর্যবর্মার (১০০২-১০৫০ খ্রীঃ অব্দ) রাজত্বকালেও বিরাজমান রইল। প্রথম সূর্যবর্মী সম্ভবতঃ ছিলেন মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত লিগোরর অর্থাৎ প্রাচীন তাম্রকিংগের রাজার পুত্র। সে স্থান অতি প্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ প্রসিদ্ধ ছিল। স্বভাবতঃই তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম কবুজ রাজশক্তির প্রতীক 'দেবরাজের' মর্যাদা ফুল করতে সমর্থ হ'ল না, রাজার 'দুন্দ্যুতরাজা' এখনও সেই 'দেবরাজের' বিগ্রহ শিবলিংগের মধ্যেই নিহিত রইল।

সপ্তম জয়বর্মার (১১৮১-১২২০ খ্রীঃ অব্দ) রাজত্বকালে কবুজ মহাবান বৌদ্ধধর্ম অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি লাভ করে। এ রাজত্বকালেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা পেল, 'দেবরাজের' স্থান অধিকার করলেন 'বৃহদ্রাজ', যার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হ'ল কবুজ বৌদ্ধসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বায়ন মন্দিরে। বৌদ্ধধর্মের আদর্শে দীক্ষিত রাজা আত্মোৎসর্গ করছেন মানবতার কল্যাণে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হ'ল ১০২ টি আরোগ্যশালা, সর্বশ্রেণীর প্রজাদের উদ্দেশ্যে। এই হাসপাতালগুলির অধিষ্ঠাতারূপে স্থাপিত হ'লেন আরোগ্যদাতা বৃহদৈষ্যজ্যগুরু, যিনি আজও তিরুত, চীন ও জাপানে জনগণের চিন্তা অধিকার করে আছেন।

ভারনাথ ব'লে গেছেন, দ্বাদশ শতকের শেষভাগে পূর্বভারতে তুর্কী আক্রমণের ফলে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত চলে যান নেপাল, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায়। মনে হয়, সপ্তম জয়বর্মার রাজত্বকালে কবুজ বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রভাবের মূলে অন্ততঃ কতকালে ছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা।

শৈবধর্মের সহিত সংযোগ কবুজ মহাবান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। একথা সুবিদিত যে, সে সংযোগ মহাবান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির

সংগেই জড়িত। যবদীপের “শিব-বুদ্ধের” উপাসনা সে সংযোগের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কদুজে বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর (অবলোকিতেশ্বর) ও তাঁর শক্তির প্রজ্ঞাপারমিতার উপাসনাও অনুরূপ প্রমাণ প্রদান করে। বৌদ্ধধর্মের সংগে দ্বারা পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন, শিব-শক্তির অনুকরণেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবলোকিতেশ্বর-প্রজ্ঞাপারমিতার উৎপত্তি। আংকোরের চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ, ললাট-নেত্র, ত্রিশূল ও সর্পসম্বন্ধিত লোকেশ্বর শিবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মূলগত ঐক্য থাকার ফলেই প্রথম সূর্যবর্মার রাজত্বেও ‘দেবরাজের’ অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল। একই কারণে শপ্তম জয়বর্মার রাজত্বে দেবরাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে ‘বুদ্ধরাজের’ আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। কদুজের শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ মন্দির ও আশ্রমগুলির আচার-অনুষ্ঠান, পরিচালনব্যবস্থা লক্ষ্য করলে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুর রেখেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাঠামো অবলম্বন করে বিরাজমান ছিল। এ প্রসঙ্গে কীতিপণ্ডিতের বাত-সিতোর লিপি ও প্রথম যশোবর্মার তেপ প্রগং লিপির সাক্ষ্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ২

কতদূর এ বৌদ্ধধর্ম কদুজের জনচিহ্নকে আকর্ষণ করেছিল? এ প্রসঙ্গে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদ সাধারণ মানুষের নিকট অপেক্ষাকৃত অপরিচিত থাকলেও বিশ্বের মুক্তিবিধায়ক লোকেশ্বর ও তাঁর শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার উপাসনায় সাধারণ মানুষ পেয়েছিল তার ঐহিক ও পারত্রিক আশা-আকিঞ্চন চরিতার্থ করার উপায়ের সন্ধান। কদুজে আবিষ্কৃত অগণিত লোকেশ্বর-মূর্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদান করে।

কাদুজ মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর যে তাত্ত্বিক প্রভাবের ইংগিত পাওয়া যায় তা কেবল কতকগুলি ব্রোঞ্জনির্মিত হেবজ-মূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কদুজের অসংখ্য শিলালিপির কোথাও হেবজের উল্লেখ পাওয়া যায়না। তা ছাড়া তিব্বতীয় শক্তিসংযুক্ত হেবজের অন্নীল বৃক্ষমূর্তির কোনও নিদর্শন

২। কাদুজ মন্দির শাসন সন্দর্ভে Ca'cutta Review, February, 1955 এ প্রকাশিত আবার “Some Aspects of Temple Administration in the Ancient Khmer Kingdom” শির্ষক গ্রন্থ উল্লেখ্য।

কল্পে নেই। মনে হয়, কাণ্ডজ জনসাধারণ ও শিল্পিগণের গভীর নীতিবোধই তাদের তাত্ত্বিক প্রভাব থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখেছিল।

সপ্তম জয়বর্মার মৃত্যুর পর কপুঞ্জের শৈবধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে ধর্মলব্ধকীর গোড়ামি দেখা দিল। সপ্তম জয়বর্মার রাজত্বের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির যে সকল বুদ্ধমূর্তি খোদিত ছিল তাদের ধ্বংস করে তারা স্থাপন করলেন শিবলিংগ আর তপস্বীদের মূর্তি। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই কাণ্ডজ রাজশক্তি হীনবল হয়ে পড়ল ও নবজাগ্রত তাই (T'hi) শক্তির প্রবল অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হ'ল না। এই ঐতিহাসিক ঘটনা কাণ্ডজ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল। ষাটশ শতকের শেষার্ধ্বে সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু (খ্রিঃ ১১৫৩—১১৮৬ খ্রিঃ) থেরবাদ বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের এক নবজাগরণ আনয়ন করেন। সে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করল ব্রহ্মদেশে ও সেখান থেকে স্রামে। তাই সমরবাহিনীর সংগে সে ধর্ম এবার প্রবেশ করল কপুঞ্জে ও লাও-এ। ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে চীন-দূত হু তা-কুয়ান্ কপুঞ্জে হীনযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পান। ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পালিভাষায় রচিত জীশ্রবর্মার একটি লিপিও একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। এখানে উক্ত আছে যে, রাজা জীশ্রবর্মী জনৈক 'মহাধেরের' উদ্দেশ্যে একটি গ্রাম প্রদান করেন ও জনৈক উপাসিকা কর্তৃক একটি বিহার নির্মাণ করান ও একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করান। লিপিটির ভাষা ও বিষয়বস্তু হ'তে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভেই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম কাণ্ডজ রাজশক্তির সমর্থন লাভ করে।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম ইন্দোচীনের জনচিস্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তার প্রাধান্য কারণ এই যে, জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় হু তা-কুয়ানের বিবরণ থেকে। কলে, কপুঞ্জে, লাও-এ, স্রামে, ব্রহ্মদেশে, সমাজের সর্বনিম্নস্তরেও বৌদ্ধধর্মের মূল কথাগুলি সুবিদিত। ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ আদিম সর্বপ্রাণবাদ ও উদ্ভবশীলদের উপাসনা এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীর সংগে জড়িত থাকলেও থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে ইন্দোচীনের জনসাধারণের বিশ্বাস অবিচল; তারা সে বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে বর্তমান যুগে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতি রোধ ক'রে।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। George Cœdès—*Les Etats hindouises d'Indochine et d'Indonesie*, Paris, 1948.
Pour mieux comprendre Angkor, Paris, 1947.
Religions indiennes du Combodge et du Laos. (G. Maspero, *L'Indochine, Paris et Bruxelles*, 1929).
Bronzes Khmers, *Ars Asiatica*, V.
Deux inscriptions sanscrites du Fou-man, *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (BEFEO.)*, XXXI, p. 8ff.
A la recherche du Yacodharacrama, *BEFEO.*, XXXII, p. 97 ff.
La plus ancienne inscription en Pali du Combodge, *BEFEO.*, XXXVI, pp. 14-21.
- ২। Paul Mus —*Les religions de l'Indochine* (S. Levi, *Indochine*, Paris, 1931).
- ৩। Pierre Dupont —*La propagation du bouddhisme indien en Indochine occidentale*, *Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises (BSEI.)*, N. S., XVIII, 1948, pp. 93-105.
- ৪। O. Migot —*Le bouddhisme en Indochine*, *BSEI.*, N. S. XXI, 1946, pp. 23-38.
- ৫। Sylvain Levi —*Les marchands de mer et leur rôle dans le bouddhisme primitif*, *Memorial S. Levi*, Paris, 1937, pp. 133-144.
- ৬। Emile Senart —*Une inscription bouddhique du Combodge*, *Revue Archeologique*, 1888, p. 182 ff.
- ৭। H. Kern —*Over den aanhef eener Buddhistische inscriptie uit Battembang* (translated into French in & Aymonier, *Le Combodge*, II, pp. 307-318).
- ৮। L. P. Briggs —*The syncretism of religions in Southeast Asia, especially in the Khmer Empire*, *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 71, pp. 230-249.

ইবনবতুতার ভারতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত

ডাঃ মহম্মদ হুসেন

ভারতে ইবনবতুতার ভ্রমণ কাহিনী আলোচনার পূর্বে বৃথিবার জম্মু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তিনি তের (১৩৪৬/৭৪৭) ১৩৩৪-৪৬ খ্রঃ ৭৩২-৭৪৭) বৎসরের মধ্যে ভারতে অনেক জায়গাতেই গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সেই জম্মু তিনি যাত্রাকালে অনেক ঘুরাঘুরি করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি অম্বরাব ও বন্ধীর হইতে কাবুল গেলেন। সেখান থেকে গজনি গেলেন; গজনি থেকে আবার কাবুল প্রত্যগমন করিলেন সেখান থেকে শাশনগড় পৌঁছিলেন এবং করিমাশ নামে এক পাহাড়ের কেল্লাতে আসিলেন; পরে শাশনগড়ে গমন করিলেন; পরে এক বনে ঢুকিলেন যাহাকে ১৫ দিনে অতিক্রম করিলেন। সে বনে ভীষণ গরম বা সমুদ্র ছিল। বন পার হইয়া তিনি খাইবার হইতে সিদ্ধু প্রদেশে প্রবেশ করিলেন; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বোলান গিরিপথ দিয়া আসিলেন। ইহার কারণ এই যে তাঁহার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাঁহার উদ্যতরূপে পরবর্তী যাত্রাতে দেখা যায়। যদিও তাঁহার পক্ষে শাশনগড় হইতে দিল্লী যাত্রা করা সহজ ছিল তবুও তিনি সেখান থেকে দিল্লী না গিয়া এক প্রসিদ্ধ সাধু শেখ রুক্মদ্দীন মুলতানীকে দেখিবার জন্য মুলতানের দিকে চলিয়া গেলেন। মনে হয় যে তিনি শাশনগড়ে শুনিয়া ছিলেন যে শেখ রুক্মদ্দীন মুলতানী শুধন সিদ্ধু নদীর ধারে যানানী নগরে আসিয়াছেন; সেই জম্মু ইবনবতুতা যানানীর কাছে সিদ্ধু নদীর পার হইলেন এবং যানানিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শেখ রুক্মদ্দিনের সহিত আলাপ করিলেন। কিন্তু এইসব কথাই কোন উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে নাই।

ড : মহম্মদ হুসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের (ইসলামীক বিভাগ) অধ্যাপক। তিনি আব্বাদী হইয়াও অতি যত্নসহকারে বাংলা ভাষা লিখিয়াছেন। আশা করি পাঠকবর্গ তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে বিরক্তিবোধ করিবেন না।—ই: স:

যানানী থেকে ইবনবতুতা সিহ'বানে যাত্রা করিলেন কারণ উম্মাইয়া খলিফাগণের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা উমর ইবন আব্দুল আজীজের হস্তলিপি তথায় ছিল। সিহ'বানে দৈবক্রমে তিনি এক ধনী সওদাগর আলাউল মুলকের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। আলাউলমুলকের অনেক জাহাজ ছিল। সে সময় আলাউলমুলক জাহাজে লাহরী যাইতেছিলেন। এই সুযোগে পাইয়া ইবনবতুতা জাহাজে লাহরী গেলেন। লাহরী হইতে তিনি মুলতান যাইতে বাধ্য হইলেন কারণ মুলতান রাজ্যের উপরই পড়ে। পথে যাইতে যাইতে শুকর ও উচ্চ দুই সহর পরিদর্শন করিলেন।

এক জার্মান লেখক অসম্মান করেন যে যানানী থেকে ইবনবতুতা অসুস্থতাপত্রের অভাবে দিল্লীর দিকে যাইতে পারেন নাই। সেই জ্ঞাত সেবহান ও লাহরী অভিযুগে বিনা বাধায় চলিয়া গেলেন। সেবহান ও লাহরী হিন্দু রাজার অধিনে ছিল বলিয়া অসুস্থতাই পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু এই উক্তির কোন যুক্তি নাই। ইবনবতুতা নিজেই বলিয়াছেন যে মুলতান মহম্মদ এক হিন্দু রতনচন্দ্রকে সেবহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মুলতানে পৌঁছিয়া ইবনবতুতা দিল্লীর অভিযুগে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় প্রথম সহর আবুহর দেখিলেন। ইহা হাজার হাজার বিবরণে লেখা আছে; কিন্তু এটা মানিয়া লওয়া যায় যে তিনি আবুহর ও আবুখর থেকে দিল্লীর পথে পাকপট্টনে (আজোখন) ফিরিয়া গেলেন। মুলতান থেকে দিল্লীর পথে পাকপট্টনই (আজোখন) প্রথম পড়ে। সেখানে প্রথম যাওয়া ও দরকার মনে হয় কারণ সেখানে শেখ ফরিদউদ্দিন গাধুর বাড়ী ছিল যাহাকে দেখিতে ইবনবতুতা ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু আবুহরে প্রথম যাওয়ার উল্লেখ করেছেন কারণ আবুহরের এক বনের মধ্যে ইবনবতুতার দল এবং আর এক দল দলের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়। দল দলের বিরোধীজন ছিল—আশীজন পদাতিক এবং দুইজন অশ্বারোহী; সে দলটা ইবনবতুতার পর্যটকদের দলের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। পর্যটকগণ আক্রমণকারীদের নিহত করিয়া এবং তাহাদের খণ্ডিত মস্তক নিকটস্থ আবুখর কেল্লাতে আনিয়া তথায় কুলাইয়া রাখিলেন। এই সম্বন্ধে ইবন বতুতা এক বাণের আঘাত পাইয়া ছিলেন। এই জ্ঞাত তিনি রোমান্সের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

পাকপটন থেকে বায়ানা হইয়া ইবনবস্তুতা ৪ দিন যাত্রা করিয়া সরস্বতী (Sarsuti) পৌঁছিলেন; সে সময়কার সরস্বতী, যাহাকে এখন সেরসা বলা হয়। ইহা প্রচুর খান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেখান হইতে চলিয়া আমাদের পর্য্যটক হাঁসী (Hansi) সহরে আসিলেন। তখন হাঁসী একটি বিরাট ও সুন্দর সহর ছিল; এখান থেকে বাহির হইয়া তিনি ২ দিন যাত্রা করিবার পর মসূদাবাদে পৌঁছিলেন; উহা দিল্লী হইতে দশ মাইল দূরে ছিল। মসূদাবাদ হইতে যাহাকে এখন নাজফগড় বলা হয় তিনি তথায় গেলেন। তারপর পালম পৌঁছিলেন; পালম দিল্লীর পশ্চিমে খানিক দূরে অবস্থিত। এখনও দেখা যায় সেই নামই বলায় আছে।

দিল্লীতে কাজী নিযুক্ত হইয়া ইবনবস্তুতা আগষ্ট ১৩৫৬ মহরম ৭৩৭ পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন; তখন এই যাত্রার কারণ তিনি লিখিয়াছেন যে সুলতান মুহম্মদ তাঁচাকে কাজীর কার্য্য ছাড়া কতুবউদ্দিন মুবারকশাহ খলজীর সমাধীর তদ্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এই সম্পর্কে সুলতান ইবনবস্তুতাকে গরীব লোকদের পাওয়াইবার জন্য প্রচুর শস্ত প্রদান করিলেন কিন্তু আজ্ঞামত শস্যের পরিমাণ ইবনবস্তুতা পাইলেন না। শস্ত প্রদানের আজ্ঞা দিয়াই সুলতান মুহম্মদ রাজধানী ত্যাগ করিলেন। ইবনবস্তুতা বলেন যে সুলতানের দান হইতে মন্ত্রী খাজাকাহ আমাকে মাত্র দশ মন শস্ত দিলেন; অবশিষ্ট অংশের জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন যে আমি আমরোহা সরকার হইতে পাইব।

আমরোহা হইতে ইবনবস্তুতা সরস্ব নদীর উপর (অবস্থিত) আফগানপুরে গেলেন; সেখান হইতে দিল্লীতে ফিরিলেন। আবার ষ্: ১৩৫৯, হি: ৭৪০ এ দিল্লী থেকে স্বর্গাদোয়ারী অভিমুখে রওনা হইলেন; সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া সুলতানের সহিত কনৌজ গেলেন; ষ্: ৭৪২, হি: ৭৪২ দিল্লী হইতে সিবহানে সুলতান মুহম্মদের সচিত সাক্ষাৎ করিবার পর আবার দিল্লী আসিলেন। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর কিংবা রমজান মাসে সুলতানের আজ্ঞা অনুসারে চীন দেশে যাইতে রাজি হইলেন।

চীন যাত্রার সময় তিনি দিল্লী হইতে ষ্: ২২শে জুলাই ১৫৪২ বা ১৭ ফর ৭৪০ হিজরিতে রওনা হইলেন। দিল্লী হইতে ক্যাপে পর্য্যন্ত (যে স্থান হইতে ইবনবস্তুতার দলের জাহাজে চড়িয়া যাওয়ার দরকার ছিল) তাহারা

সোজা গেলেন না, বরং ভারতীয় সড়কগুলি দেখিতে গেলেন। ইংরাজ লেখক হেনরী ইয়ুল ইতার কারণ লিখিয়াছেন যে সে সময়কার দেশের রাজনৈতিক অরাজকতা হেতু তিনি একপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এটা ঠিক মনে হয় না। আমার মতে ইহার প্রথম কারণ ছিল ইবনবতুতার ভারতে নানা জায়গা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা দেখিয়াই সুলতান মহম্মদ অনুমতি দিয়াছিলেন ও ইবনবতুতা চীনে যাইতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, সুলতান আদেশ দিলেন যে যেকোন স্থানে রাজ্যে ইবনবতুতার দল যায় ও বাস করে কর্তৃচরিত্রা যেন তাহাদের অভ্যর্থনা করে। সুলতানের এই ঘোষণা হইতে প্রমাণ হয় যে সে সময় অরাজকতার কোন ভয় তাহার মনে ছিল না।

দিল্লী ত্যাগ করিয়া ইবনবতুতার দল ১রা জুলাইতে তিলপত পৌছিয়া তাড়াতাড়ি আউ ও ভিলু হইতে বায়ানা অভিমুখে রওনা হইলেন ও বায়ানাতে ৩০ জুলাই উপস্থিত হইলেন। বায়ানা হইতে অগষ্ট ৮ তারিখে কোয়ল পৌঁছিলেন। সেখান থেকে পরে জালালী গেলেন। জালালিতে তিনি দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হইলেন, কিন্তু আলোর দরজাতে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ২৬ অগষ্টে তাজপুর ও ১৯ অগষ্টে ব্রীজপুর পৌঁছিলেন। এই বিপদকে উপরোক্ত ইংরাজ লেখক হেনরী ইয়ুল সুলতান মহম্মদের সাম্রাজ্যের অরাজকতা বলিয়াছেন কিন্তু ব্রীজপুর হইতে বিপদের আশঙ্কা আর রহিল না। এই সপ্তাহ পরে সেপ্টেম্বর ৫ তারিখে কনৌজ পৌঁছিলেন, সেখান হইতে ২রা অক্টোবরের মধ্যে চনাউল, গুয়াজিরপুর, জলেশ্বর, মাওরী, মরহু, আলাপুর, গোয়ালিয়ার, পর্বন, আশ্বরী—এই সব জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং প্রত্যেক সহর ও গ্রামের বিবরণ লিখিলেন ; তিনদিন পর খজুরাহোতে এলেন ও হিন্দুদের মন্দিরগুলি দেখিয়া অক্টোবর ৮ তারিখে চন্দেরী ২০ অক্টোবরে ধার ২৮শে অক্টোবরে উজ্জয়িনী এবং ৩রা নবেম্বরে দৌলতাবাদ পৌঁছিলেন। এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করিয়া নন্দুরার ঘুরিয়া নবেম্বর ক্যাসে বন্দরে পৌঁছিলেন। ক্যাসে হইতে কাওয়া (Kawa) ও গন্ধার দুইটি হিন্দু রাজ্য পরিদর্শন করিয়া শেষে জাহাজে আরোহণ করিলেন।

আরব সাগরের উপর দিয়া ২দিন চলিবার পর পেরেম ধীপে পৌঁছিলেন। পেরেম হইতে জাহাজ গোয়ো পৌঁছিল কিন্তু জোয়ার ও ভাটীর প্রভাবের ভয়ে তীর হইতে চার মাইল দূরে জাহাজ লঙ্গর করা হইল, তথা হইতে নৌকায় চড়িয়া ইবনবতুতা তীরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু

নৌকা কাণায় বসিয়া গেল এবং তিনি প্রায় জলমগ্ন হইয়া গেলেন ; পরে ২ জনের সাহায্যে তীরে পৌঁছিলেন ।

গোগো থেকে ডিসেম্বর ৭ তারিখে সন্দাপুর ও ডিসেম্বর ৩০ তারিখে হিন্বে পৌঁছিলেন । সেখানকার রাজা সুলতান জামালউদ্দিনের সহিত বাস করিলেন । সুলতান জামালউদ্দিন দারগমুজের হিন্দু রাজা বিলালদেবের অধীনে ছিলেন । তিনের তিন দিন থাকিয়া ইবনবতুতা মালাবার তটে আসিলেন, সেই তটে বারসিলব, ফাকানর, মান্জারর, শীলী, জুরফন্তন, দহফন্তন, বৃদফন্তন ও পান্দারোমী ইটয়া ১৩৪৩ জামুয়ারি ২ তারিখে কালিকট পৌঁছিলেন । এখানে চীন যাইবার জাহাজের অপেক্ষায় প্রায় ৩ মাস অবস্থান করিলেন ।

কালিকট মালাবার তটের খুব বড় বন্দর ছিল ; তাহার রাজা একজন হিন্দু জামোরিন বা সমুন্দরী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । উদ্ভাকে ইউরোপীয় মত লাড়ী কামান বেশে ইবনবতুতা দেখিয়াছিলেন । সেই রাজা ইবনবতুতার দলকে চীনের জাহাজে আরোহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । সুলতান মহম্মদের দামী উপহারগুলি যে সব জিনিষ তিনি চীন সম্রাটের জন্য পাঠাইয়াছিলেন মালিক সুত্বল ও জাহিরউদ্দিন তত্তাবধায়কদের সহিত এক জাহাজে দিলেন, অল্প জাহাজে ইবনবতুতা তাহার প্রণয়িনীদের ও ভৃত্যগণদেরকে চড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন । উপরোক্ত প্রথম জাহাজ উপহারগুলি লইয়া রওনা হইল কিন্তু পরদিন খবর আসিল যে সমুদ্রের প্রবল স্রোতে জাহাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও উপহারগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে । জাহাজের লৌহ পেরেক মলিক সুত্বলের কাণপটীতে বিধিয়া গিয়াছে । ইহা দেখিয়া নিকটবর্তী কাকুম জাহাজের লোক ইবনবতুতার জিনিষ-পত্র এবং স্ত্রীলোকদের নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন । ইবনবতুতা তটে একলা রহিলেন । তখন তাহার কাছে দল টাকার বেশী আর কিছু টাকা পয়সা ছিল না । স্থানীয় কর্মচারিরা তাহাকে বলিলেন যে কাকুম জাহাজ তোমার জিনিষপত্র ও দাসীদের লইয়া গিয়াছে, সে জাহাজ পরবর্তী বন্দর কীলনে (Quilon) নিশ্চয়ই পাড়াইবে ও লজ্জর ফেলিবে । ইহা শুনিয়া তিনি কালিকট হঠতে কীলন যাত্রা করিলেন, দশদিন পর সেখানে পৌঁছিলেন ; যখন তিনি সেখানে ছিলেন চীন সম্রাটের দূতগণ (যাহারা ইবনবতুতার দলের সহিত দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন এবং কালিকট থেকে অল্প এক জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন)

ইবনবতুতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদের জাহাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল কিন্তু কীলনে চৌন সওদাগরগণ ছিলেন। তাহারা চৌনা ভুতগণকে কাপড়-চোপড় পরিধানের জন্য দিলেন; তাহার পর তাহারা চৌন দেশে সোজা চলিয়া গেলেন। ইবনবতুতা চৌনে যাইয়া তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া ছিলেন।

কীলন হইতে ইবনবতুতা দিল্লীর সম্রাট সুলতান মুহম্মদের নিকট রাজদূত ব্রহ্মের-ও উপচারগুলির কি ঘটিল সে খবর দিবার জন্য প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন, মনে মনে কহিলেন ‘আমি কি উত্তর দিব যদি সুলতান আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেন তুমি উপচারগুলি হইতে পৃথক হইয়া পড়িলে?’ ইহা ভাবিয়া ইবনবতুতা দিনার দেশে সুলতান জামালউদ্দিনের কাছে যাওয়া স্থির করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন ‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কাকুম জাহাজের খবর না পাষ্ট ততক্ষণ আমি সুলতান জামালউদ্দিনের নিকটেই থাকিব’। এই ভাবিয়া তিনি কালিকটে ফিরিয়া গেলেন। ইহা হইল কালিকটে তাহার দ্বিতীয় যাত্রা। সেখানে তিনি ১৩৪৩ খৃঃ অব্দে ৮ এপ্রিল তারিখে পৌঁছিলেন। তথায় আরব সাগরের উপর দিয়া জাহাজে চড়িয়া তিনি দিনারে এপ্রিল ২২ তারিখে পৌঁছিলেন। পথে তিনি ৪টি যুদ্ধজাহাজ দেখিলেন সেগুলি অন্য কোন দেশের ছিল। তিনি ভয় পাইলেন কিন্তু সে জাহাজগুলি কোন ক্ষতি করিল না। দিনারে তিনি ৩ মাস রহিলেন তাহার মধ্যে তিনি সুলতান জামালউদ্দিনের সহিত সাগরে যাত্রা করিয়া সন্দাপুরে এক সমুদ্র যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ফলে সন্দাপুরের অয় হইল। তাহারপর খৃঃ ১৩৪৪ জাম্যয়ারীতে ৩ তারিখে তিনি সুলতান জামালউদ্দিনের সহিত দিনারে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখান থেকে তখনই রওনা হইলেন এবং আরব সাগরের উপর দিয়া মনজুর, হীলী, জুফতুন, দহফতুন, বুনফতুন, কস্তীনা হইয়া ১৩৪৪ খৃঃ অব্দের জাম্যয়ারী ৭ তারিখে কালিকটে পৌঁছিলেন ইহা হইল কালিকটে তাহার তৃতীয় যাত্রা। তথায় সেইদিন শালেয়াত সহরে আসিলেন এবং তথায় বহুদিন বাস করিলেন; তাহার পর ১৮ই মার্চ ১৩৪৪ খৃঃ অব্দে চতুর্থ বার কালিকটে আসিলেন। সেখানে কাকুম জাহাজ হইতে তাহার ২ জন ভৃত্য আসিয়া খবর দিল এবং বলিল, ‘আপনার দাসী যিনি জাহাজের উপর গর্ভবতী ছিলেন মারা গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাতার রাজা আপনার অবশিষ্ট দাসীদের ধরিয়াছে। আপনার জিনিষপত্র ও

রাজার লোকদের লইয়া গিয়াছে, তাহার পর আপনার দল ভিন্নভিন্ন হইয়া হইয়া গিয়াছে ; কেহ কেহ চীন দেশে কেহ কেহ জাভাতে আর কেহ কেহ বাঙ্গলা দেশে চলিয়া গিয়াছে । ইহা শুনিয়া ইবনবতুতা হিনার অভিযুখে ফিরিলেন । সেখানে ১৩৪৩ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল তারিখে পৌঁছিলেন । সেখানে বেশী দিন না থাকিয়া ৯ই জুনে সন্দাপুরে আসিলেন এবং তিনমাস রহিলেন ।

সন্দাপুরের হিন্দু রাজা ইবনবতুতা ও মুলতান জামালউদ্দিনের হস্তে পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, উভয়দেহে আবার সন্দাপুরকে লইবার জন্য আসিল । সে রাজা সন্দাপুরকে ঘেরিয়া কেলিল । সহর ত্যাগ করিয়া, ইবনবতুতা সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং ১৩৪৪ খৃঃ অব্দে ২৪ অগাষ্টে কালিকটে আসিলেন ; ইহা হইল কালিকটে তাঁহার ৫ম বারের পর্যটন ।

কালিকট হইতে ইবনবতুতা মালদ্বীপপুঞ্জতে যাত্রা করিলেন ; সেখানে ৫ সেপ্টেম্বর ১৩৪৪ খৃঃ অব্দে পৌঁছিলেন এবং ১৩৪৫ সালে অগাষ্ট অবধি অবস্থান করিলেন । ১৩৪৬, ২১শে জাহুয়ারী তারিখে কীলন উপস্থিত হইলেন এবং ৩ মাস তথায় অবস্থান করিলেন । তখন তিনি হিনার দিকে যাইবার জন্য এক জাহাজে আরোহণ করিলেন । হিনারে ফাকানরের মধ্যস্থলে দস্যুগণ ইবনবতুতাকে আক্রমণ করিল এবং লুটপাট করিয়া সব কাড়িয়া লইল ।

এই ঘটনা পিঙ্গন দ্বীপের নিকট ঘটিল । ১৩৫৬ ২৭শে এপ্রিল তারিখে সেখান হইতে ইবনবতুতা কোন রকমে ১৩৪৬ অব্দের ২৩ মে তারিখে কালিকট আসিলেন । ইহা হইল তাঁহার ষষ্ঠবার কালিকট পরিদর্শন । কালিকটের মসজিদে গেলেন তিনি স্থানীয় মুসলমানদের কাছে পরিধানের জন্ত কিছু কাপড় চোপড় পাইলেন । সেখানে শুনিলেন যে তাঁহার মালদ্বীপের স্ত্রী (যাহাকে গর্ভাবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন) এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন ; ইহাতে তিনি মালদ্বীপ অভিযুখে যাত্রা করিলেন । দশ দিনের সমুদ্র যাত্রার পর তিনি মালদ্বীপে পৌঁছিলেন ; ছেলেটিকে দেখিলেন তাহার বয়স তখন ২ বৎসর হইয়াছিল ; কিন্তু উহাকে মায়ের কাছেই ছাড়িয়া বঙ্গ দেশ অভিযুখে যাত্রা করিলেন । ৩৩ দিন অবিচ্ছিন্ন সাগর যাত্রার পর তিনি খৃঃ ১৩৪৬ ৯ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন যাহাকে তিনি সুন্দবন লিখিয়াছেন ; সেখান হইতে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সেখ জালাল কিহা শাত জালালকে দেখিবার জন্য কামরূপ পাহাড়ের দিকে যাত্রা

করিলেন। সেখানে বর্তমান খ্রীষ্ট সহস্রের নিকটে তিনি সেখ জালাল নামক এক অতি বৃদ্ধ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেখ জালাল এক সর্বজনপ্রিয় সাধুলোক ছিলেন। ঐহাকে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান আদর করিত ও ভালবাসিত। সেখ জালাল দিনের বেলা ৪০ বৎসর ধরিয়া বরত বা দশ দশ দিনের রোজা রাখিতেন; দশ দিন টানা মোটেই কিছু খাইতেন না ও পান করিতেন না; ১০ দিনের রাত্রিতে নিজের এক গরু ছিল সেই গরুর দুধ খাইতেন। তাহারপর দশ দিন আবার রোজা রাখিতেন; তিনি এক গৃহের মধ্যে থাকিতেন, রাত্রি খুব কম ঘুমাইতেন, বেশীরভাগ সময় নামাজ ও কোরান পড়িতেন। কিছু দিন পর ইবনবতুতা তাহার আজ্ঞাতে আবার যাত্রা শুরু করিলেন; মেঘনা নদী দিয়া হবদ্ব বা খ্রীষ্টের অভিযুগে গেলেন; হবদ্বকে এখন হবংটালা বলা হয়, সেখানে তিনি নৌকা হইতে নামিলেন না, সোজা হুহুরকাবান কিছা সোনারগাঁওতে চলিয়া গেলেন। যেখানে খৃঃ ১৩৫৬, ১৩ই অগাষ্ট তারিখে পৌছিয়া যাত্রার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শেষে চীনদেশে পৌছিলেন। চীন হইতে প্রত্যগমন কালে তিনি ১৩৪৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে কালীকটে আসিলেন। তাহারপর ইরান ও ইরাক হইয়া মক্কাতে গেলেন এবং ১৩৪ অব্দের ১৫ নভেম্বর তারিখে ৭ম হজ্জ্ করিলেন; এটা হইল তাহার শেষ হজ্জ্ যাত্রা। তিনি হজ্জ্ করিবার অন্তই খৃঃ ১৩২৫, ১৪ই জুন তারিখে নিজের জন্মস্থান টানজয়ার ছাড়িয়া ও ২০ বৎসর বয়সে নিজের পিতামাতার কাছে মনের বেদনায় বিদায় লইয়া এবং বৃদ্ধ জনক ও জননীকে রোক্তমান অবস্থায় ছাড়িয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তত্ত্বাবোধিনী সভা ও দেবদ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্বাছত্ত্ব)

ত্রিদিলাপ কুমার বিশ্বাস

ব্রিটিশ আমলে এ'দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসকে সাধারণভাবে দুই পর্বে ভাগ করা চলে। কোম্পানী শাসনের প্রথম যুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ সরকারী আত্মকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার অপ্রাচীন সনূহের কোনও প্রকার বিরোধিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরঞ্চ সে যুগে দেশীয় পূজাপার্বণ উৎসবাদিতে ইংরাজগণের যোগদানের কাহিনীই শোনা যায়। শাসকগোষ্ঠীর অশঙ্কা ছিল, ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ ভারতীয় ধর্ম সমাজ প্রভৃতিকে হাক্রমণ করলে এবং তাঁরা ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিলে ভারতবর্ষীয় জনমত ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে। এই জন্যই কেন্দ্রী মার্মন্যাম ইত্যাদিকে ব্রিটিশ এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে দেওয়া হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ডেন সরকারের অধীনস্থ ত্রিয়ারমপুরে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করতে হয়েছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ছঃখ করে বলেছেন : > “In those days the East India Government was in the habit of opposing all missionary effort from the mistaken notion that the least attempt made to convert their subjects to Christianity would lead to a rebellion. When Carey began his labours by preaching the Gospel near the Ganges, he was forbidden and made to understand that disobedience to the order of Government by his part or on that of his fellow labourers would probably cause his being sent out of the country. This was not a mere empty threat ; for two missionaries who at that time landed on the banks of the Hooghly were sent back to Europe forthwith in the same ship in

> । J. J. Weitbrecht-Protestant Missions in Bengal (London 1844) pp. 200-201.

VAIDANTIC DOCTRINES

V A N D I C A T E D.

Reprinted from the Tuttuboadhiney Puttrica.



Calcutta:

PRINTED FOR THE TUTTUBOADHINEY SOBHA, AT THE
STANHOPE PRESS, 44, ROW-BAZAR.

1845.

which they had arrived and two American missionaries who made the same attempt a short time after had to hide themselves for some weeks and afterwards to embark for the Birmeso empire one of these was the celebrated Dr Judson". এই গেল প্রথম পর্ব। কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল থাকেনি। হিন্দু আইন অস্বাভাবী কোনও হিন্দু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হত। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ১৮৩২ এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করে সরকার খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ভারতবাসীর বিষয়টিতে অসুবিধা দূর করলেন। সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরাজী ভাষাকে সরকার কর্তৃক শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ ক্রমশঃ ভারতবাসীর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পথ প্রশস্ততর করতে আরম্ভ করেছিল। যদিও সরকার অবলম্বিত শিক্ষানীতি বাহ্যতঃ ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল এবং তৎকালীন বাঙলাদেশের ইংরাজী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের আবহাওয়া হিন্দু বা খ্রীষ্টীয় কোনও ধর্মমতেরই অঙ্গুল ছিলনা তবু নবপ্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যার নোহ যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনকে অলসে কতকটা খ্রীষ্টধর্মের অভিমুখী করতে সমর্থ হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরাজী শিক্ষানীতির অন্যতম উপদেষ্টা মেকলে আশা পোষণ করতেন যে ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারের ফলে বাঙালীরা অল্পকালের মধ্যে স্বতঃপ্রসূত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে: ২ "It is my firm belief that if our plans of education are followed up there will not be a single idolater among the respectable classes of Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytize;... merely by the natural operation of knowledge and reflection. এই নূতন অঙ্গুল পরিদ্বিতির পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করেছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ। তাই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকোত্তর কাল থেকে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ।

২। G. O. Trevelyan-Life and Letters of Lord Macaulay Vol I (London 1876) pp. 455-56.

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচাৰের পূর্বকথিত প্রথমযুগে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের অভিযানের প্রথম সফ্রম ও সার্থক প্রতিবাদ করেন রামমোহন রায়। খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক তাঁর রচনাগুলি মন দিয়া পড়লে দেখা যায় মিশনারীগণের সঙ্গে রামমোহনের অধিকাংশ বিতর্ক খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব নিয়ে। ভারতীয় হিন্দুমানস সাধারণতঃ সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল হলেও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশঙ্গে তা নয়। অন্যধর্মের অন্তর্গত উদার সার্বভৌমিক তত্ত্বগুলির প্রতি অন্ধাশোষণ করতে তার কোথাও বাধা নেই। রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তো প্রগতিশীল ছিলই উপরন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে খ্রীষ্টধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদ ও খ্রীষ্টের উচ্চ নৈতিক আদর্শ সমূহের প্রতি একান্ত অন্ধাবান হ'তে তাঁর আটকায়নি। কিন্তু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং তৎসংক্রান্ত অলৌকিক গাল গল্প-গুলিকে তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় বাইবেলের পুরাতন ও নতুন টেষ্টামেন্টের মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করে তিনি প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেলেন যে প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্টের মূলবাণীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনার মতই তা একটি কুসংস্কার; তাঁর মতে বাইবেলের মূল প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ (unitarianism)—ত্রিত্ববাদ (Trinitarianism) নয়। এই আলোচনা-কালে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে যে প্রগাঢ় পারিভাষিক এবং সেই সঙ্গে যে অসাধারণ বিচারপটুতা লিপিকৌশল সংযম ও তত্ত্বভার পরিচয় দিয়াছিলেন তা আজও আমাদের বিশ্বাসভিত্তক করে। বাইবেল ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের যুক্তিমূলক বিচার ও আলোচনার দ্বারা রামমোহন বাইবেলের তুলনামূলক ও যুক্তিপন্থী সমালোচনা পদ্ধতির (Higher Criticism) এর এবং স্বয়ং খ্রীষ্টান না হয়েও খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের (unitariansদের) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ও

৩। আমেরিকান লেখক Monoure Daniel Conway ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Chicagoর The Open Court পত্রিকাতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে লক্ষ্যর আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য Rammohan Roy Centenary Commemoration Volume Part ii pp. 166-67)। আজ পর্যন্ত রামমোহনের এই সম্মান অক্ষর আছে।

রামমোহন যখন মিশনারীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন তখন পর্যন্ত সংগঠনের দিক থেকে তাঁরা এদেশে যথেষ্ট শক্তিশালী হন নি। তাঁরা তাঁদের কর্ম-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তত বেশী তাঁকে বলতে হয়নি। তবে সে বিষয়েও যে তিনি সচেতন ছিলেন না তা নয়। তাঁর (Brahmanical Magazine) এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি মিশনারীগণের প্রচার পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মপ্রচারের জন্য ইংরাজ মিশনারীরা তিনটি অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে থাকেন : প্রথমতঃ এদেশের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসি-গণের মধ্যে তাঁরা নানা পুত্তিকাদি বিতরণ করেন যা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দা ও কুৎসায় পূর্ণ; দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য রাজপথে পাড়িয়ে তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের প্রশংসা এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দা করেন; তৃতীয়তঃ এদেশীয় মিস্ত্রশ্রেণীর কোনও লোক সাংসারিক লাভ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁরা চাকরী ইত্যাদির সাহায্যে তার পৃষ্ঠপোষণ করেন এবং এইভাবে অন্যকেও খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করতে প্ররোচনা দেন। গালিগালাজ করে এবং উৎকোচ প্রদানপূর্বক এইরূপে তাঁরা যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের ধর্ম তত্ত্বক্ষেপ করতে সাহস করেন, তার কারণ তাঁরা ইংরাজ, এবং এদেশের রাজশক্তিও ইংরাজ। ঢুকী, পারাশ বা অন্য কোনও স্বাধীন দেশে তাঁরা এজাতীয় চীন উপায় অবলম্বন করতে সাহস করবেন না। ৯ এই তর্কযুদ্ধে রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রধানতঃ শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কেরী, মার্মিয়ান, ওয়ার্ড, প্রমুখ ধর্মযাজকগণ। এঁরা শাস্ত্র বিচারে রামমোহনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি, অধিকন্তু তাঁর যুক্তির প্রভাবে এঁদের দলের গোড়া ত্রিহিবাদী পাদরী উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্যে ত্রিহিবাদ পরিত্যাগ করে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। এই চরম পরাজয়ের ফলে এদেশের মিশনারী সমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দেবেশ্বনাথ এবং তত্ত্ববোধিনী সভা। এই ব্যাপারে এঁরা

৪। The Brahmanical Magazine-Preface to the first edition : The English works of Raja Rammohan Roy (edited by Kalidas Nag and Debojyoti Burman) Part II p. 137; ব্রাহ্মনসেববি (রামমোহন গ্রন্থাবলী ৫ : সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) পৃ: ৩।

রামমোহনের পন্থাই অগ্রসরণ করেছিলেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হেতু তত্ত্বাবোধিনী সভার আমলে লড়াইটা হয়েছিল একটু নূতন ধরনের।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নানা কারণে এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে মিশনারী পক্ষেও নেতৃত্বের এবং নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। জীৱানপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদরীরা তাঁদের পূর্ব প্রভাব বহুল পরিমাণে হারাতে শুরু করেছেন। স্কটল্যান্ডের প্রেসবিটিয়ান চার্চের ধর্মযাজকগণ উপস্থিত হ'লেন যুগপৎ ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন ডাঃ আলেক-জান্ডার ডাক্। ডাক্ যখন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় নিঃসতায় অবস্থায় এদেশে আসেন তখন তিনি তাঁর কাজে রামমোহনের নিকট প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন। প্রেসবিটিয়ান ধর্মযাজকগণের শিক্ষা বিস্তার নীতি পাশ্চাত্য শিক্ষার অমুরাগী রামমোহনের সহায়কৃতি সৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিল।^৫ কিন্তু কালক্রমে এই ডাক্ সাহেবই খ্রীষ্টীয় মিশনারী সমাজের সর্বপ্রধান নেতা ও মুখপাত্ররূপে রামমোহনের উত্তর সাধক দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘ তত্ত্বাবোধিনী সভার যুগ্ম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। রামমোহনের সময়ে মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল প্রধানতঃ

৫। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার (সাহিত্যসংখ্যা, বৈশাখ ১৮৬২ পৃঃ ৪৫) খ্রীপ্তের ফলে। "বাংলার সংস্কৃতি ও মিশনারী" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "রামমোহন রায় তখন নিরাশ হ'য়ে পড়তেন যদি সেই সময়ে ডাক্ সাহেব না আসতেন" ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক উল্টো। রামমোহন সেই সময়ে ডাক্কে সাহায্য না করলে সম্ভবতঃ ডাক্কেই জগদ্রোহ হ'য়ে স্বদেশে ফিরতে হ'ত। এদেশের মিশনারীরা প্রথমাবস্থায় ডাক্কে প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তা' ছাড়া তাঁর নিজের কাজে রামমোহন ডাক্কে নিকট কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করেননি। ডাক্কে সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা হয় তখন তিনি তাঁর এদেশের কাজ সমাপ্ত করে ইংলণ্ড যাত্রার উদ্যোগ করছেন। ডাক্কে কাজের যতদূর সম্ভব সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি সেই বৎসরই (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) নভেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করেন। রামমোহনের নিকট ডাক্কে কণ সম্পর্কে জটব্য George Smith, Life of Alexander Duff Vol 1 pp 177-83

ধর্মতত্ত্ব নিয়ে। তত্ত্বাবোধিনী সভার আমলে সেই তাত্ত্বিক দিতর্কের জের অবশ্যই চলেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী-বিরোধী আন্দোলনে এই সময়ে একটি নূতন ধারাও যুক্ত হতে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষার ক্রমবিস্তার, উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন, সরকারের পরোক্ষ সমর্থন প্রভৃতি কারণে তখন মিশনারীগণের প্রচার-প্রচেষ্টা গুর্ভাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের এমনকি ঊনবিংশ শতকের আরম্ভেও ধর্মাসক্তিত ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ সংখ্যায় ছিলেন অতি নগণ্য। বাঙলাদেশে প্রথম কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন যে প্রেটেষ্টান্ট মিশনারী, সেই জন জ্যাকারিয়া কির্নেমডিয়ার ১০৫৯ থেকে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতাশ বৎসর পরিচরমের ফলে দিল্লীবাসী বনধ্যামদাস নামক একজনমাত্র খাঁটি ভারতীয়কে ধর্মাসক্তিত করিতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। বাদশাহী যারা তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতেন তারা কেউ অকৃত্রিম ভারতবর্ষীয় ন'ন, এ'দেশের ইউরোপীয় বিশেষতঃ পোতুগীজ অধিবাসিগণের বংশধর। কির্নেমডিয়ার বাঙলা বা হিন্দুস্থানী জানতেন না, তিনি প্রচার করতেন তৎকালীন ভারতনিবাসী ইউরোপীয়গণের মধ্যে বহুল প্রচলিত পোতুগীজ ভাষার মাধ্যমে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীঃামপুর মিশনের পত্তন হয় এবং তার তিন বৎসর পরে ১৮০৩ সালে তিনু সমাজের উচ্চতম বর্ণের এক ব্যক্তি (কৃষ্ণপ্রসাদ নামক একজন ব্রাহ্মণ) উক্ত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'ল। এই নবদীক্ষিতের পরিভাষ্য উপবীতটি সম্পর্কে পাদরি ওয়ার্ড লিখেছিলেন "This is a more precious relic than any, the Church of Rome could boast of." ৭ স্পষ্ট বোঝা যায় এই জাতীয় সৌভাগ্য তখন মিশনারীদের কদাচিত হ'ত। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হেতু ঊনবিংশ শতক অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত এ'দেশীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলতে থাকে। ১৮৪৪ সালের নভেম্বর মাসের কলকাতার 'The Christian Intelligencer' পত্রিকা

৬। J. C. Marshman—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward (London 1859) vol 1. pp. 24-25.

৭। Ibid p. 176.

বেশ পাকা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ঐ বৎসরের জুন মাসের চার্ট অফ ইংলণ্ড মিশন কর্তৃক তাঁদের কলিকাতা ডাইওসিসে ধর্মসূত্রিত দেশীয় খ্রীষ্টীয়গণের সংখ্যা ৬১৫৬। ৮ এর উপর ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক দীক্ষিত ৩২০০, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি মিশন কর্তৃক দীক্ষিত ১২০০ এবং প্রেটেষ্টান্ট মিশন কর্তৃক দীক্ষিত ১০০০ ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীকে হিসাবের মধ্যে ধরলে, বাংলাদেশ সমেত সমগ্র প্রেসবিটিরিয়ান ও অ্যান্ডা উওর ভারতের দেশীয় খ্রীষ্টপন্থিগণের মোটসংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৫৫৬। খ্রীষ্টামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' মতে এই হল ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের আরম্ভে উত্তর ভারতে দেশীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিদের প্রকৃত সংখ্যা। ৯ ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে এই সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় কেবলমাত্র বাঙলা প্রদেশেই প্রেটেষ্টান্ট মিশন গুলির দ্বারা ধর্মসূত্রিত দেশীয় খ্রীষ্টীয়গণের সংখ্যা হয়েছে ১৪,১৭৭। ১০ এক মাস্তাজ ছাড়া মিশনারীদের এতখানি সাফল্য এই সময়ে ভারতে অল্প কোনও অঞ্চলে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির তুলনায় খ্রীষ্টীয়গণের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতটা ভারতীয় সমাজের নিকট আতঙ্কজনক মনে হয়েছিল। তা'ছাড়া বাঙলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারে হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা আচার অহুর্তানে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হতে শুরু করেছিল। মিশনারীরা অনেকগুলি বিদ্যালয়তন স্থাপন করতে, সেগুলির মাধ্যমে দেশের উচ্চ বর্ণের যুবচিহ্নের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপন পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মের এই ব্যহার ফলে দেশীয় সমাজের বিশেষতঃ উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের ভিত্তিতে ভাঙন ধরতে পারে এমন আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিলনা। এই কারণে আত্মরক্ষার ভাগ্যপায় দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির

৮। The Christian Intelligencer for November 1844, quoted in the Friend of India, January 9, 1845 p-23

৯। The Friend of India, January 16, 1845 p. 37

১০। M. A. Sherring-History of Protestant Missions in India (London 1884), Appendix B. P. 443

পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তত্ত্ববোধিনী সভা এবং এর প্রধান সংগঠনকারী ছিলেন দেবেশ্বনাথ। কর্মক্ষেত্রে মিশনারীগণের সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই সংঘর্ষ তত্ত্ববোধিনী যুগের বৈশিষ্ট্য। রামনোহনের যুগে এর প্রয়োজন ততবেশী অস্বীকৃত হয়নি। আমরা যথাক্রমে এই তত্ত্ববিচার ও সাংগঠনিক সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করব।

ধর্মতত্ত্ববিষয়ে আলোচনা নতুন করে শুরু হয় প্রধানতঃ ডাঃ আলেক-জান্ডার ডাক্ প্রণীত India and India Missions গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ্য করে। এই গ্রন্থে ডাক্ সাহেব ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ধর্মকে বিশেষতঃ বেদান্তমতকে অত্যন্ত তীব্র এবং স্থানে স্থানে অসংযত ভাষাতে আক্রমণ করেন। ১১ ১৭৬৬ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডাকের গ্রন্থের এক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং বেদান্ত মত সম্পর্কে ডাকের অভিযোগ সমূহের উত্তর দেওয়া হয়। ১২ এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় পক্ষ বিভিন্ন পত্রিকায় বেদান্তমতকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেন এবং হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃতির বহু নিন্দাভাষ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে সেগুলির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়। ফলে উভয়পক্ষ রীতিমত তর্কহর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ১৭৬৬ শকান্দে তত্ত্ববোধিনী কতৃক ডাকের গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষ্য করেই যদিও প্রকৃত তর্কযুক্ত শুরু হয়, তবু এর পূর্বেও যে বাদ প্রতিবাদের একটি ক্ষীণ ধারা লক্ষ্য করা যায়না তা নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার দুঃখপাত্র মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার (প্রথম প্রকাশকাল ১লা ভাদ্র ১৭৬৫ শকান্দ) পূর্বে উক্ত সভা যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বাঙালী খ্রীষ্টীয় যাজক

১১। Alexander Duff-India and India Missions (Edinburgh 1840) Chapter II pp. 61—218

১২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৬ শক পৃঃ ১১২-১৫; এই উত্তর এবং প্রকাশিত এই বিষয়ক কয়েকটি রচনা ইংরাজীতে লেখা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে পরে মাঝে মাঝে দু'একটি ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাখানিকে এই জন্ত বিতানী বলা যায়। সমগ্র ইংরাজী রচনার পরিমাণ অবশ্য খুবই সামান্য ছিল।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গির্জায় প্রদত্ত তাঁর বারটি বাঙলা উপদেশ বা Sermon একত্র “সত্যাব্যবসায়ী বিবিধ প্রস্তাবে প্রচারিতা উপদেশ-কথা” নাম দিয়ে একটি ইংরাজী ভূমিকা সহ প্রকাশ করেন। উক্ত ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন স্পষ্টই বলেছেন : ১৫...“While the recent reprints by a distinguished Hindu gentleman of Vedantic tracts composed and edited by the late Raja Rammohun Roy and his friends and the exertions lately made by the Tattwabodhini Sabha to oppose a barrier to the progress of the Gospel, render this not altogether an improper season for the publication of a number of Christian sermons. ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব খর্ব করা, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ১৮৪০ তা’ড়া ব্যক্তিগতভাবেও অনেক মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এবং কালীনাথ বসু হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়ের তুলনায় মূলক আলোচনা করে দু’খানি পুস্তিকা লেখেন। তর্কপঞ্চাননের পুস্তিকাখানি ছিল ম্যুরনামক ইংরাজ লেখকের খ্রিষ্টধর্মের খ্রৈষ্টিক প্রতিপাদক “মতপরীক্ষা” নামক গ্রন্থের উত্তরস্বরূপ রচিত। ১৮৪২ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তর্কপঞ্চানন ও কালীনাথ বসুর পুস্তিকাখন্দের প্রত্যাশ্বরে আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ’র সম্পূর্ণ নাম “সত্য স্থাপন ও নিখ্যানাশন অর্থাৎ মিয়ুর সাহেবের রচিত মতপরীক্ষা নামক গ্রন্থের জীবন্ত হরচন্দ্রতর্কপঞ্চানন দ্বারা যে উত্তর প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এবং জীবৎবাবু কালীনাথ বসুর পুস্তকের প্রত্যাশ্বর।” বইখানি অংশতঃ ইংরেজী ও অংশতঃ বাঙলা ভাষাতে রচিত। এই সবেই থেকে বোঝা যায় যে ১৮৪০-৪১ খ্রিষ্টাব্দেও হিন্দু এবং মিশনারী পক্ষের মধ্যে বাদ প্রতিবাদের কিছু অপ্রতুল ছিলনা। সাময়িক পাত্রের এ’র নিদর্শন আছে। একটি মাত্র উদাহরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র The Bengal Spectator এর ১৮৪২ সালের আগষ্ট সংখ্যায় A Native স্বাক্ষরিত এক-

১৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-উপদেশ-কথা (কলিকাতা ১৮৪০) Preface p. iii

১৪। ইতিহাস, পঞ্চমখণ্ড তৃতীয় সংখ্যা পৃঃ ১৭৪-৭৫

খানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রে ভারতে ঐষ্টধর্ম পোষণার্থে রাজস্বের অর্থাৎ ব্যয়ের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে খুব স্পষ্ট ভাষাতে “...Why should any portion of the money of the people of this country...be devoted to the maintenance of a religion in which they have no belief?” এই বৎসরের ১লা নভেম্বর সংখ্যায় পত্রলেখক ঐ বিষয়ে আর একখানি পত্র লেখেন। ১৫ উক্ত পত্রটির বক্তব্যের উত্তরে মিশনারী পক্ষের কোনও সমর্থক কর্তৃক ঐ বৎসরের ১৫ই নভেম্বর ঐ কাগজে আরও একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬ সুতরাং পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বাদানুবাদ, বিজ্ঞানীয় স্থাপন প্রভৃতি উপায়ের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবিরতাবের পূর্বেই হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় পক্ষের বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং তত্ত্ববোধিনী সভাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর এবং তাতে ডাকের এসেই সমালোচনা ছাপা শুরুতে এই বাদপ্রতিবাদ অতি তীব্র আকার ধারণ করে এবং প্রায় জীবনমরণ সংগ্রামের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। সমষ্টিগত ভিত্তিতে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিনায়ককে মিশনারীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সংঘর্ষ শুরু হল।

এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান এই বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ইয়ং বেকল দলভুক্ত সুবিখ্যাত কিশোরীচাঁদ মিত্র (ইনি তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যও হয়েছিলেন) রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় ভবনে Hindu Theo-Philanthropic Society নামক একটি সভা স্থাপন করেন। ১৭ এর উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা তত্ত্ববোধিনী সভার অনুরূপ। মূলতঃ প্রথম প্রদর্শন, একেশ্বরবাদের আলোচনা ও প্রচার, ভারতবাসীর নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা প্রভৃতি এই সভার কর্মভাগিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য দেবেনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ

>e The Bengal Spectator, August 1842, pp 78-79 ; November 1, 1842 p 137

১৬। Ibid, November 15, 1842 pp, 145-47

১৭। দেবেনাথ ঘোষ-কর্ণবীর কিশোরী চাঁদ মিত্র পৃ: ৪৮-৪৭

প্রভৃতি এই সভায় যোগদান করেছিলেন। অপর পক্ষে ডাঃ ডাক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় সমাজের নেতৃস্থানীয়গণও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এবং মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদির একটি সংকলন ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। হিন্দু খ্রীষ্টীয় সংঘাত উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টীয় লেখকগণ তত্ত্ববোধিনী সভাও Hindu Theo-Philanthropic Society এই উভয় প্রতিষ্ঠানকেই আক্রমণ করেন। তবে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় নায়কগণের সংশ্রব ছিল বলেই হোক অথবা এটি একটি আলোচনা সভা বা পাঠ্যক্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানমাত্র ছিল বলেই হোক, একে তাঁরা অপেক্ষাকৃত গুরুতর দেখতেন এবং মনে করতেন এ'র অধিকাংশ তরুণ সভ্য হিন্দুপ্রতীকোপাসনা এবং তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক পোষিত এবং প্রচারিত বোদ্ধামত, উভয়েরই অসারতা বুঝতে পেরেছেন, অথচ ঐষ্টধর্ম গ্রহণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক; তবে কালক্রমে শেষোক্ত ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ সঞ্চারের সম্ভাবনা আছে। ১৮ এই সংঘটীর উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন হয়েছে এই জন্য যে খ্রীষ্টীয় পক্ষ কোনও কোনও স্থলে এ'র আলোচনা প্রসঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী সভার মতামত আলোচনা করেছেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানকেই আক্রমণ করেছেন। উক্তর দেবার সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভাও Hindu Theo-Philanthropic Society'র বিষয়ে লেখা খ্রীষ্টীয় সমালোচকগণের প্রবন্ধ গুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিলেন। এ'র কারণ বোঝা কঠিন নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই অপর সংঘটীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং সেটির বিরূপ সমালোচনা এবং বিশেষ করে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তার বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ তাঁরা শ্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নি।

১৮। "The young gentlemen who have formed this Theo-Philanthropic Society appear to be coming off from the Vedantist party. They seem yet to linger in a fond regard for the sacred language of their country and would fain find some portions of its Shastras they might cling to...still there are indications of better things among them", The Friend of India, January 16, 1845 p.35 বলা বাহুল্য মিশনারীদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য ছিল এবং তাঁদের আশা পূর্ণ হয়নি।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও Hindu Theo-Philanthropic Societyর সভা-মন্ডের যে সমালোচনা খ্রীষ্টীয় পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তার উত্তরে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় Vaidantic Doctrines Vindicated নামক এক ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পর বৎসর তত্ত্ববোধিনী আ২০ ছুই সংখ্যায় “ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত খ্রীষ্টীয় আক্রমণের উত্তর দেওয়া হয়। এই উত্তর প্রকাশিত হওয়ার পর খ্রীষ্টীয় পক্ষ “Vedantism what is it?” নামক আর একটি প্রবন্ধ “ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রে প্রকাশ করেন। তাতে বেদান্তমন্ডের বিরূপ সমালোচনা ছিল। ১৯ ফলে তত্ত্ব-বোধিনী সভা, বেদান্ত মন্ডের স্বপক্ষে এবং খ্রীষ্টীয় সমালোচনার বিপক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি একটি স্থলভ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। কার্যতঃ ডাকের India and India Missions গ্রন্থের তত্ত্ববোধিনী কৃত পূর্বোক্ত সমালোচনা এবং Vaidantic Doctrines Vindicated পর্য্যায়ের অপর তিনটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে সংকলন করে Vaidantic Doctrines Vindicated নামক

১৯। এই বার প্রতিবার সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী কৃত ডাকের গ্রন্থের পূর্ববর্তিত সমালোচনার পরবর্তী নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রধানতঃ উল্লেখ্য: (ক) নিম্নরূপ পক্ষে: (১) The Christian Herald, December 31, 1844 “Native Periodical Press”, quoted in the Friend of India, January 9, 1845 pp, 24-25 (২) The Calcutta Review vol, II (October to December 1844) “Discourses read at the meetings of the Hindu Theo-Philanthropic Society” pp 266-77; (৩) ibid, vol iii (January to June 1845) “The Transition-states of the Hindu Mind” pp, 102-47; (৪) ibid, vol iii (January to June 1845) “Recent Publications on the subject of Vedantism” (miscellaneous notices) pp xivi-ix; (৫) ibid vol iv (July to December 1845) “Vedantism-what is it?” 43-61; (৬) The friend of india, January 16, 1845 “Discourses of the Theo-Philanthropic Society” pp, 35-36; (খ)। তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে: (১)। “Vaidantic Doctrines Vindicated” তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কাল্কট, ১৭৬৬ শক, পৃ: ১৫০-৬৬; ঐ, আবেণ ১৭৬৭ শক পৃ: ২০২-২০৪; ঐ, আখিন ১৭৬৭ শক পৃ: ২২১-২৮।

এক খানি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাসহ তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়। ভূমিকাতে গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে : ২• “Since the appearance of the last English article in the *Tuttuboadhinee Putrica*, in which we took occasion to lay before our readers some of the leading doctrines of the Vaidantic system of religion, an article has appeared in the October number of the *Calcutta Review* entitled “Vedantism what is it ?” in which the writer has seemingly endeavoured to repudiate the tenets of our creed...The objections heretofore urged against our religion are a reiteration of the same arguments and as these we have already endeavoured to refute in our previous papers, our task at present is confined to a reprint of these in a permanent shape ;...”

আলেকজান্ডার ডাফ তাঁর *India and India Missions* গ্রন্থে এবং ব্রিটিশ সমালোচকগণ তাঁদের অস্বাভাবিক রচনায় বেদান্ত ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির

২•। *Vaidantic Doctrines Vindicated* (Reprinted from the *Tuttubododhina Putrica*) : Printed for the *Tuttuboadhinee Sabha* at the Stanhope Press, 44 Bowbazar, 1845 : Preface এই গ্রন্থখানির একখণ্ড ভারতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রকাশ বৎসর দেওয়া আছে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ। ভূমিকা পাঠে জানা যায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের *Calcutta Review* পত্রিকা *Vedantism, what is it ?* নামক মিশনারীপক্ষীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে। হুতরায় বইটির প্রকাশকাল ঐ বৎসরের নভেম্বর ডিসেম্বর মাস বলে আখ্যায় সিদ্ধান্ত করতে পারি। এর লেখক কে, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে এবং একসময়ে তাই নিয়ে অনেক বাতাল্যবাদও হয়েছিল। লেখকের নাম তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধভূমিতে বা আলোচ্য গ্রন্থে কোথাও নেই। অনেকে সেবেজনাথকেই এর লেখক বলে মনে করেছেন। সেবেজনাথের হৃদয়ের ইংরাজী রচনার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে তিনি সহজে ইংরাজী রচনার হাত দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *the Englishman* পত্রে *Justicia* হৃদয়নাথারী লেখকের সঙ্গে ইংরাজীতে তাঁর যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তাতে তাঁর হয়ে তাঁর পক্ষের বক্তব্য লিখেছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তখনই *Vaidantic Doctrines* গ্রন্থের চিত্রাবলী এবং বৃত্তিক্রম সেবেজনাথের হলেও তাখানি অল্প কায়ও হওয়া বিচিত্র নয়।

বিকল্পে যে সকল অভিযোগ এনেছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে সেসবের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রান্তিকর পুনরুজ্জীবিত দাদ দিলে জাতীয় পক্ষের অভিযোগগুলিকে সামগ্রা জ্ঞেয়বিভাগ করে এই ভাবে সাজাতে পারি (১) বেদান্তমতানুসারে ব্রহ্ম হ'লেন অনাদি, অনন্ত, অসীম, অপরিবর্তনীয়, অদৃশ্য সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং অনির্বচনীয়। কিন্তু এই বিশেষণগুলি অর্থহীন, কেননা যে প্রণালীতে বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে, তার দ্বারা উপাসকের মনে উক্তস্বরূপগুলির কোনও সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। বৈদান্তিক ব্রহ্ম মানবমনের ধারণার অতীত (২) বৈদান্তিক ধর্ম নীতিজ্ঞান বিবক্ষিত। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপে কোনও নৈতিক গুণ আরোপিত হয়নি। সুতরাং ব্রহ্মধ্যান বা ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হ'বার বা পার্থিব জীবন বিদগ্ধ হ'বার কোনও সম্ভাবনা নেই; (৩) বেদান্তমতের স্থাপনাব্যাপারে তত্ত্ববোধিনী সভা খ্রীষ্টধর্মের অঙ্গীকৃত নব্যপ্লাটনীয় মতবাদের (Neoplatonism) আশ্রয় নিয়েছেন এবং এইভাবে প্রাচীন যুক্তিধারার সাহায্যে বেদান্তের যে অভিনব ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে সভাকার প্রাচীন বেদান্তমতের কোনও সম্পর্ক নেই। বেদান্তদর্শনের এই সংস্কার হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নয়; (৪) বেদান্ত দর্শনে কোনও একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রাধান্য পায়নি। এতে ছর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বালোচনার উপর জোর দেওয়া হ'য়েছে বেশী (Which abound in misty metaphysics but put forth little really deserving the name of strictly moral or religious matter)। হেয়ালীর উপর ভিত্তি করে ধর্মজীবন গঠন করা চলে না; (৫) তত্ত্ববোধিনী সভা রামমোহন রায়ের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা একদেশদর্শী। বৈদিক সাহিত্যের কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করে রামমোহন তার জ্ঞানকাণ্ডের উপর স্থায়ী দার্শনিক মতকে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু এই কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করলে চলবেনা এবং এর মধ্যেই যাগযজ্ঞ ইত্যাদি নিরর্থক ক্রিয়াকলাপ এবং সাকার দেবতার উপাসনার বিধান আছে। তবেই দেখা যাচ্ছে বেদান্ত দর্শনের মধ্যে একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান ও অপরদিকে মূর্তিপূজা এই দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদ স্থান পেয়েছে। এমন দর্শন প্রাধান্যকে কি করে স্বীকার করা যায়? (৬) বেদান্ত দর্শনকে বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায় তা শেষ পর্যন্ত সর্বাস্ত্রবাদ বা Pantheism এর পর্যায়ভুক্ত হয়। এই সর্বাস্ত্রবাদের ভিত্তিতে উপাস্ত্র উপাসকের স্তেন ও সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এর সাহায্যে ধর্মজীবন গঠিত হ'তে পারে না ; (৭) তত্ত্ববোধিনী সভা বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলে স্বীকার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনও ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। এই প্রত্যাদেশ সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় এসেছিল, তার নিকটেই বা এসেছিল ? (৮) বেদান্তমতে উপাস্ত্রের একান্ত অভাব। শ্রী এবং শূজের এই শাস্ত্রা-লোচনা নিষিদ্ধ। এমন সঙ্গীর্ণ শাস্ত্র মানা যেতে পারে না ; দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বর্তমানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সভ্যতায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। উক্ত জাতিগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মকেই ইউরোপের আধুনিক প্রগতির কারণ বলে স্বীকার করতে হ'বে। হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে। কাজেই তুলনায় খ্রীষ্ট-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বাঙ্গীকৃত চারটি প্রবন্ধে উপরিউক্ত সব ক'টি আপত্তিরই উত্তর দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগসমূহের ক্রম-অনুসারে সেগুলিকেও যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে : (১) ভারতবাসীর নিকট বৈদান্তিক ত্রক্ষের স্বরূপ যদি অর্থহীন এবং ধারণাভীতই হ'বে, তবে বিদেশী মিশনারীরা সেগুলিকে শাস্ত্রানুসারে যথাযথ ভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হ'লেন কেমন করে ? এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ত্রক্ষের স্বরূপ যে কেউ চেষ্টা করলেই অন্ততঃ বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারেন। ত্রক্ষের নিগূর্ণ বিশেষণটির দ্বারা এইমাত্র বোঝায় যে, মানবোচিত কোনও পরিবর্তনশীল এবং বিচারশীল গুণ বা মনোভাব ব্রহ্মস্বরূপে আরোপিত হ'তে পারে না। তা বলে ত্রক্ষ অন্ধ জড়শক্তি নন। শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করে তত্ত্ববোধিনী দেখিয়েছেন শাস্ত্রানুসারে ত্রক্ষ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্তা, তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। সূর্যের মতই তিনি স্বপ্রকাশ। সুতরাং উপাসকের পক্ষে তাঁকে ধারণা করা মোটেই অসম্ভব নয় ; (২) বৈদান্তিক ধর্মে নীতির স্থান নেই এ'কথা কখনও সত্য নয়। হিন্দু শাস্ত্রে মানুষের কর্তব্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা (ক) ভগবানের প্রতি কর্তব্য, সর্বত্র সর্বদা ভগবচ্চিন্তা করা এবং ঈশ্বর স্বরূপে মন স্থির রাখা ; (খ) নিজের প্রতি কর্তব্য-বুদ্ধিবৃত্তিক

আগরিত করা, কামক্রোধাদি রিপুসমূহকে দমন করা এবং চিত্তবৃত্তিগুলিকে
 বিতুষ্ট রাখা; (৭) অন্যান্য প্রাণের প্রতি কর্তব্য-মনের দ্বারা (পরজীব্যে
 লোভ না করা পরজীবীর প্রতি কামদৃষ্টি না দেওয়া, পরের প্রতি বিবেচ্য পোষণ
 বা পরের অনিষ্ট না করা ইত্যাদি) ; স্বাক্যের দ্বারা (রক্ত ভাষণ না করা,
 অসত্য না বলা, মিথ্যা অভিযোগ না আনা, ইত্যাদি) ; কাথের দ্বারা (পর-
 জীব্য অপহরণ না করা; ব্যভিচার না করা, ইত্যাদি) । এইভাবে চিন্তা
 বাক্য ও কার্যকে যিনি সম্পূর্ণ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারেন, আমাদের
 শাস্ত্রে তাঁকে জিনগী বা আদর্শ পুরুষ বলে প্রশংসা করা হয়েছে। যে ধর্মে
 এত বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম নৈতিক উপদেশ পাওয়া যায় তাকে নীতিহীন বলা
 বাতুলতা মাত্র। উপরন্তু হিন্দুশাস্ত্রে এ কথাও বলা হয়েছে যে উত্তম এবং
 উপযুক্ত অমৃত্যুতাপের দ্বারা সর্ববিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে। “পাপীর
 শাস্তি অনন্ত নরক যন্ত্রণা”—ঐষ্টধর্মের এই বিশ্বাসটি অতি দীর্ঘতম। ন্যায়
 প্রায়শ দয়াবান দৈত্যের ধারণার সঙ্গে বা উচ্চ নৈতিক আদর্শের সঙ্গে তা
 মোটেই খাপ খায় না (...It Cannot be considered as consonant
 to those notions of divine mercy that have been imparted
 to us or to any idea of divine justice that we can form
 that man should be subjected to eternal damnation for
 sins to which he has probably been a victim through
 mere weakness and ignorance) । হিন্দুশাস্ত্রমতে পারলৌকিক
 সদ্গত্যের সকলেই অধিকারী, জন্মচক্রের মধ্য দিয়ে নিজেই সংশোধন করে
 নেবার সুযোগ যোরতর পাপীরও আছে। খ্রীষ্টীয়গণ জন্মান্তরবাদকে ব্যঙ্গ
 করেন, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে তাঁদের যে ধারণা, জন্মান্তরবাদ তার অপেক্ষা
 উদারতর এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ; (৩) ‘ন্যাচারাল
 থিওলজির’ বৃত্তিধারা অগ্রসরণ করে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে তত্ত্ববোধিনী
 যে বেদান্তমত ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কোনও অপরাধ হয়নি। হিন্দু-
 মুসলমান বা খ্রীষ্টীয় যে কোন সম্প্রদায়ের লোক আধুনিক সময়ে নিজ নিজ
 সম্প্রদায়ের মত ব্যাখ্যা করতে গেলে বৈজ্ঞানিক বৃত্তিধারার আশ্রয় না নিয়ে
 পারবেন না। বেকনীয় দর্শনের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের কোনও সহজ স্বাভাবিক
 যোগসূত্রই তো নেই। কিন্তু বাইবেলের ব্যাখ্যায় তার সূত্র ব্যবহার করতে
 খ্রীষ্টীয়গণতো সন্মুখিত হন না! বেকন যদি ইউরোপে না জন্মে তিব্বত

অথবা কামসকাটিকায় জন্মাতেন, তাহ'লে কি খ্রীষ্টীয়গণ সেট অপরাধেই তার যুক্তিশ্রণালীকে বাতিল করতেন? সুতরাং মতস্থাপনের জন্য যদি তত্ত্ব-বোধিনী সভা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিশ্রণালী অবলম্বন করে থাকেন, তা'তে আধুনিক যুগোপযোগী আচরণই করা হচ্ছে। তত্ত্ববোধিনী সভা এর দ্বারা শাস্ত্রীয় বেদান্তমতকে পরিবর্তিত করছেন না বা তার সংস্কার করছেন না। প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুদ্ধার ও প্রচার করছেন মাত্র; (৪) তত্ত্ববোধিনী সভা রামমোহন রায়ের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু সেই মতকে কোনও ক্রমে একদেশদর্শী বলা যায় না। রামমোহন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডকেই তাঁর ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নীরব থাকেন নি। বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং সাকার উপসনাকে তিনি নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে উপযোগী বলেছেন। বেদ যে সময়ে রচিত হয়েছিল সর্বাধিক জ্ঞানবিজ্ঞানের তখন শৈশবাবস্থা; সুতরাং সেই সুপ্রাচীন যুগে সকলের পক্ষে ব্রহ্মোপ-পাসনার দুর্লভ পন্থা অন্বেষণ করা সম্ভব ছিলনা। চিন্তের বিস্তার এবং ধারণাশক্তি অনেকেরই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই শ্রেণীর লোকের মনকে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানের জগৎ প্রস্তুত করবার জন্যই শাস্ত্রে বাহ্য-পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং রামমোহন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে উপেক্ষা করেননি, সে সবেগ যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করেছেন মাত্র। জ্ঞান বিজ্ঞানের অপরিণীম উন্নতির ফলে আধুনিক যুগে নানব্রহ্মের প্রসার এত বেড়ে গিয়েছে যে এখন সেগুলির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রাচীন যুগে বেদের শ্রেষ্ঠ উপদেশ ব্রহ্মজ্ঞানের পাশাপাশি যখন সেগুলি উদ্ভাবিত হয়েছিল তখন সে সবেগ কোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল না। সুতরাং একই শাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরর্থক এই সকল ক্রিয়াকলাপের বিধান থাকতে যে পরস্পর বিরোধিতার অভিযোগ মিশনারীরা করেছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। অগ্রসর হবার সময় সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এইরকম একাধিক ঐতিহাসিক স্তর আবিষ্কার করা যায়। খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্রে খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী যে সকল ধর্মগুরুকে স্বীকার করা হয়েছে তাঁরা কি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অমূরূপ বাহ্যচারের বিধান দেননি, মুসা (Moses) এবং জেরেমির মধ্যে এ'বিষয়ে পার্থক্য কোথায়? বাটবেলের Book of Leviticus অংশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সমতুল্য আচার

অনুষ্ঠানাদির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে ধর্মসাধনার এই বিভিন্ন স্তর পাশাপাশি পাওয়া গেলেও তাে খ্রীষ্টীয়গণ সে গ্রন্থকে অবিরোধিতার অপরাধে বর্জন করেন নি। খ্রীষ্ট প্রবর্তিত বাহ্যক্রিয়াকলাপ বিমুক্ত ঈশ্বরোপাসনাকেই তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ বিধান বলে স্বীকার করেন। তেমনি বৈদিকশাস্ত্রে ধর্মবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং চরম বিধান ; (৫) বেদান্তমত সর্বাত্মবাদ বা Pantheism এর শ্রেণীভুক্ত কিনা সে কথা বিচার করবার আগে সর্বাত্মবাদ কথাটির অর্থ বোঝা প্রয়োজন। যদি তাঁর দ্বারা এই বোঝায় যে ঈশ্বর তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রয়েছেন, সৃষ্ট জীব সমূহ তাঁর থেকেই উৎপন্ন তাঁর মধ্যে বিচরণশীল এবং তাঁর বাহিরে এদের অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহলে বেদান্তমতকে সর্বাত্মবাদ বলতে বৈদান্তিকগণ আপত্তি করবেন না। এই অর্থে বাইবেলেও তাে বলা হয়েছে ...In Him we live move and have our being (Acts xvii. 27) অথবা One god and Father of all who is above all and through all and in you all (Ephesians iv. 6) কিন্তু সর্বাত্মবাদ বলতে যদি এই বোঝায় যে এই বিশ্বজগৎই ব্রহ্ম এবং একে অভিত্রন করে ব্রহ্মের কোনও স্বাভাব্য নেই তাহলে বেদান্তমত সে অর্থে কিছুতেই Pantheism নয় ; অতি থেকে যথেষ্ট বচন উদ্ধার করেই তা দেখানো যায় ; (৬) তত্ত্ববোধিনী সভা বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলে বিশ্বাস করেন বটে কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা বাহ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না।

কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আপুশাস্ত্র কিনা এ'বিষয়ে বাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। বৈদিক কবিদের অধ্যাত্ম উপলব্ধি সমূহ বর্তমান যুগের যুক্তি জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় বলেই ঐগুলিকে প্রত্যাদেশ বলে স্বীকার করা হয়। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত ধর্মানুপ্রাণিত কবিরা এই প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। এর উৎপত্তি সম্পর্কে তদধিক কিছু জানা যায় না, জানবার প্রয়োজনও নেই। যদি ঐতিহাসিক প্রমাণই ঈশ্বরানুভূতির বাথার্থ্যের একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহলে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বাইবেলও কি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে ? মুসা (Mosos) এর রচনাবলী কখন পূর্ণাকারে সংগৃহীত হ'য়েছিল ? দশবিধান

কার দ্বারা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল? কে'ই বা তা লিপিবদ্ধ করেন
 মূল না ঈশ্বর স্বয়ং? মূল লেখসংবলিত মর্মরফলক দুখানি এখন কোথায়
 বর্তমান? এ'সব প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর আছে কি? স্বতন্ত্রাৎ
 কোনও শাস্ত্র প্রত্যাাদিষ্ট কিনা সে প্রশ্নের বিচার উক্ত শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর
 উৎকর্ষের উপর নির্ভর করবে, কোনও বাহ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের
 উপর নয়। প্রত্যাাদেশ কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। দেশকাল-
 নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বর জ্ঞানোদ্ভাসিত মানব হৃদয়ে তাঁর সত্যস্বল প্রকাশ
 করেন। মিশনারিরা যে বলেন ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার ফলে বাইবেলের
 রহস্য একমাত্র তাঁরাই বুঝতে সক্ষম এ'কথা মেনে নেওয়া যায় না, কেননা
 ঈশ্বরের সমদৃষ্টিতে কোনও বিশেষরূপে অল্পগৃহীত জ্ঞানীর অস্তিত্ব থাকা
 সম্ভব নয়। যদি কোনও ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মাহুষ্ঠানে এমন কোনও রহস্য
 থাকে, যা সর্বমানবের বোধগম্য হ'বার সম্ভাবনা নেই তবে তা ঈশ্বর সৃষ্ট
 নয়, মনুষ্য সৃষ্ট। বেদান্তমতের এখানেই জ্যেষ্ঠত্ব যে তা কোনও প্রকার
 অলৌকিকতা বা রহস্যময়তার দাবী করে না; (৭) বেদান্তধর্মে উদারতার
 অভাব নেই। এ'র আবেদন সার্বজনীন। সর্বদেশের সকল জাতির
 আবালবৃদ্ধ নরনারী এই ধর্ম স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন। প্রাচীন
 ভারতের মৈত্রেয়ী প্রকৃতি ব্রহ্মবাদীনার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে
 নারীরও ধর্ম গ্রহণে বাধা ছিলনা। তবে যদি এ'দেশীয় সমাজে পরবর্তী
 কালে নারীগণ ও নিম্নজ্ঞানীর লোকে অধিক সংখ্যায় এই ধর্মে শিক্ষা না
 পেয়ে থাকে, তবে সে' দোষ বৈদান্তিক ধর্মের না ভারতবর্ষীয় সমাজ
 ব্যবস্থার; (৮) ইউরোপীয় সভ্যতার বর্তমান উন্নত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি
 আকর্ষণ করে মিশনারীগণ যে ভাবে খ্রীষ্টধর্মের জ্যেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার
 চেষ্টা করেছেন, তা একেবারেই বিচারসহ নয়। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত
 হ'ওয়ার ঠিক পরের কয়েক শতাব্দী তো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের রাজ্য!
 ইউরোপীয় জাতির সাম্প্রতিক উন্নতির মূলে খ্রীষ্টধর্ম এ'কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা।
 বেকন এবং তাঁর অনুবর্তিগণের নতুন যুক্তিবাদ উদ্ভাবন, ব্যবসা বাণিজ্যের
 প্রসার, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, শিক্ষা বিস্তার প্রকৃতি নানা কারণে ইউরোপীয়
 সভ্যতার বর্তমান উন্নতি সম্ভব হ'য়েছে। এমনকি খ্রীষ্টধর্মের সংস্কার
 ও ঘটেছে প্রধানতঃ ঐসকল ঘটনার ফলে। ইউরোপের স্বাধীন আন্দোলন
 এবং নারীর যুক্তি আন্দোলন প্রকৃতি সংগ্রামও খ্রীষ্টধর্মের কাছে বিন্দুমাত্র

সহায়তা পায়নি (But what explanation will be give of the centuries of darkness and ignorance which follow the introduction of the faith of Christ...? Surely Christianity had but very little influence in bringing about the present state of things in the west....it is to the philosophy of Bacon and his followers, to the extension of commerce, to the invention of the art of Printing and spread of Education and other similar causes that Europe owes its present civilisation. Christianity itself is indobted to those very causes for all seeds of reformation which it has since secured...As to female emancipation of Europe...Christianity has as little hand in it as in promoting the cause of liberty in Great Britain and other kingdoms) ।

(ক্রমশঃ)

সোভিয়েত্‌ এ ভারতীয় ইতিহাস চর্চা

মনোতোষ মণ্ডল ✓

অনেকে জানেন না সোভিয়েতবাসীর ভারতবর্ষকে জানবার আগ্রহ কত গভীর। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারত থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকের যে দলটি সোভিয়েতে গিয়েছিল তারই একজন সদস্য হিসাবে সে দেশকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সোভিয়েতে গিয়ে সর্বপ্রথম যা আমার চোখে পড়েছে তা হল ভারতীয় জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সে দেশের আপামর জনসাধারণের গভীর কৌতুহল। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকদের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিশেষ অশুশীলন লক্ষ্য করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে সোভিয়েতে ভারতে বিষয়ক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

(২)

বিষয় হিসাবে সোভিয়েত্‌ ইন্ডোলজিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় : যথা, (১) বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা, (২) ভারতীয় ইতিহাস-চর্চা, (৩) সংস্কৃত ও পালি বিষয়ক গবেষণা, (৪) ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার চর্চা, (৫) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন, এবং (৬) ভারতীয় সাহিত্যের অন্বেষণ।

(ভারত সম্বন্ধে সোভিয়েতবাসীর আগ্রহ আজকের নয় ; ভারতের সাথে রাশিয়ার যোগাযোগ অনেকদিনের। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বোধহয় এথেনীয়স্‌ নিখিভিন্‌ নামক জনৈক রাশিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত। তিনি ১৪৬৬ থেকে ১৪৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেবের আমলে যেমন ম্যালিনস্কিই নামে অপর এক রুশ বদিক নুরাট বন্দরে নামেন এবং দিল্লী ও আগ্রা পরিদর্শন করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ রাশিয়ান ভাষায় প্রথম ভগবদ্গীতার অনূবাদ হয় চার্লস উইল্কিনস্‌ কৃত গীতার ইংরাজি অনূবাদ থেকে—প্রকাশনার তার বেন্‌ এন, আই, নডিকভ্‌।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন জেরাসিম্ লিবেদেভ্, ফোট উইলিয়মের সামান্য কেরাণী হিসাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা সুপরিচিত। কলকাতায় তিনি এক থিয়েটারের পত্তন করেন। সেখানে অভিনীত হত বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত বা অস্থভাষা হতে অনুদিত নাটকাবলী। তিনি সংস্কৃতভাষাও শেখেন। ১৮০১ খ্রীঃ এ ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর “Grammar of pure and mixed Indian Dialects with Dialogues” নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি রাশিয়ায় গিয়ে জার আলেকজান্ডারের হুকুমে প্রথম দেবনাগরী হরকের পত্তন করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত “An Impartial Survey of the System of Brahmanical East India” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক পি. পেত্রভ রচিত “Principal Dialects of North India” এবং সংস্কৃত ভাষার অভিধান ২৭ খণ্ডে। তারপর উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মিনায়েফ্ (১৮৪০—৯০)। পালি, সংস্কৃত ও অপর কয়েকটি ভারতীয় ভাষার উন্নয়নে তাঁর দান সুপরিচিত। হুংখের বিষয় মিনায়েফ্ সঙ্ঘকে আমরা আজও যথেষ্ট জানিনা। Biblica Buddhica এ প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বিজ্ঞিন্ন প্রবন্ধই তাঁর কার্যাবলীর প্রধান সাক্ষ্য। ভারতের প্রাচীন ভাষায় ও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের উপর যাদের কাজ নগণ্য নয়, তাদের মধ্যে আরও নাম করা যেতে পারে,—কুদ্রিয়ান্স্কি, ওলসেনবুর্গ, রীতার প্রভৃতির। ওলসেনবুর্গ তিব্বতীয় ও সংস্কৃত লিপিত অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পর অস্কাচ্ ক্রেত্রোও যেমন, তেমনি ইন্ডলজির ক্রেত্রোও কতকগুলি নূতন ধারা দেখা যায়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, প্রাক্বিপ্লব যুগে ইন্ডলজির চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র পালি ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে। বিপ্লবোত্তর যুগে আমরা দেখি যে ভারতে জনসাধারণের কথিত প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপরেও সোভিয়েত পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম—একাদেমিসিয়ান্ বারানিকভ্ (১৮৯০—১৯৫৩ খ্রীঃ)। তাঁর বিভিন্ন রচনার সংখ্যা মোট ছুশোর কম নয়। নীচে কেবল কয়েকটি প্রধান রচনার উল্লেখ করা গেল।

(১) উক্রেনের বেল্গ্গাডি ও লিগান ভাষা।

- (২) লালজী লালের 'প্রেমসাগর' এর মূল হিন্দী থেকে রূপ অনুবাদ।
 (৩) তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' এর মূল হিন্দী (বা ঔড়ী) থেকে রূপ ভাষায় অনুবাদ।
 (৪) হিন্দী—রূপ অভিধান। ইহার শব্দসংখ্যা ৩৫০০০। এই ধরনের অভিধান রূপভাষায় প্রথম।
 (৫) হিন্দী—উচ্চ ব্যাকরণ।

বারানিকন্ডের একটা প্রিয় বিষয় ছিল সিগান বা যাবাবরদের ভাষা। অনেকের মতে এরা নাকি ভারত থেকে আসে। বারানিকন্ড প্রধানত এদের ভাষা, শব্দ, ও ব্যাকরণগত পঠনের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্য নিয়ে চর্চা করেন। ছাংখের বিষয় বারানিকন্ডের অধিকাংশ গ্রন্থই রূপভাষায় লেখা। অন্তর্ভাষায় তাদের অনুবাদ হয়নি।

বিংশ শতাব্দীতেই মহাভারতের অনুবাদ করেন (কেবল আদিপর্ব) কালিয়ানভ্। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও কয়েকটা কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন আলেকজান্দ্রোভ্।

ইন্ডোলজি প্রসঙ্গে আর একজনের নাম না করলে কিছুই বলা হয় না। তিনি হলেন ৭৬২ভাত্‌স্কী (১৮৬৬—১৯৪২ খ্রী)। সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনের উপর তাঁকে পাশ্চাত্যের জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বললেও বোধ হয় অত্যাক্তি হয়না। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর মত পণ্ডিত ছিল'ভ। বৈদিক ভাষায় ও পালিতে তিনি সুপণ্ডিত। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি 'হৈহেন্স চরিত' ও 'ভারতীয় কাব্যের মূলনীতি' অনুবাদ করেন জার্মান ভাষায়। তার পর তিনি লিখা করেন—এপিগ্রাফী, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, ও পাণিনির ব্যাকরণ। এপিগ্রাফি প্রসঙ্গে তাঁহার ২য় শিলাদিত্যের (৭ম শতাব্দী) উপর প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

বর্তমান শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় সভ্যতা প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান দলিলপত্র আবিষ্কৃত হয় মধ্য এশিয়ার পূর্বে ও চীনের তুর্কিস্তানে। ৭৬২ভাত্‌স্কী তখন উত্তর বৌদ্ধধর্ম চর্চার দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯০০ সালে তিনি মংগোলিয়ায় গিয়ে ধর্মকীর্তি প্রণীত গ্রন্থ স্তায়বিল্লু অধ্যয়ন করেন।

১৯১০ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং এখানে একবৎসর অতিবাহিত করেন ব্রাহ্মণ, জৈন, ও বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চায়। ১৯১৮ সালে তিনি একাদেমি অফ্

সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তাঁর বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্র (২০ খণ্ড), বৌদ্ধ নির্বাণ সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এবং ঐ সময়েই তিনি ক্রশভাষায় 'দশকুমার চরিত' অম্বুবাদ করেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোভিয়েত দেশে গিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে লক্ষ্য করলাম যে ভ্রমণকারী এথেনীয়স্ নিমিত্তিৎ থেকে শুরু করে লেবেদেভ, পেত্রভ, মিনায়েক, ব্লেজেরভাতস্কী, বারানিকভ, প্রকৃতি ভারত ও সোভিয়েত দেশের মধ্যে যে ভাববিনিময়ের ধারা বয়ে চলেছিলেন, তার সূত্র আজও ছিন্ন হয়ে যায়নি : পরস্পর নয়। সোভিয়েত দেশ তার জের টেনে চলেছে নয়। উঠবে।

এর প্রথম নিদর্শন সোভিয়েত দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়গুলির Oriental Faculty বা প্রাচ্যভাষা শিক্ষণ বিভাগ। এই প্রসঙ্গে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ও উজ্জবেকোস্তান এর বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriental Faculty গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার লেনিনগ্রাদের প্রাচ্যভাষা শিক্ষা বিভাগ অপেক্ষাকৃত পুরানো এবং সুগঠিত। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হলো প্রধানত প্রাচ্যভাষা শিক্ষা, প্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন, এবং প্রাচ্যের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্য ক্রশভাষায় অম্বুবাদ করা। অস্তান্ত সকল প্রচেষ্টার মত এই অম্বুবাদ প্রচেষ্টাকেও ব্যক্তিগত খামখেয়ালি-পনার উপর তেড়ে না দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় ও একাদেমী অফ সায়েন্সের মত সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর ভার পড়েছে একে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত করতে। অম্বুবাদ ভিন্ন এখন পর্যন্ত প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের উপর স্বাধীনভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়নি। কেবল লেনিনগ্রাদের অধ্যাপিকা দেয়া নভিকোভা বন্ধিমচন্দ্রের উপর একটা সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন ক্রশভাষায়। তবে অম্বুবাদ-সাহিত্যের ভাঙার তাদের প্রচুর। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখক কমলাল গোস্বামী, পরিচয় গোস্বামী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী ইত্যাদি, হিন্দিভাষায় মুলকবাঈ, প্রেমচাঁদ, কিশোরচাঁদ ইত্যাদি ওদের সুপরিচিত এবং আংশিকভাবে অম্বুদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা ও শরৎচন্দ্রের 'রাসের স্মৃতি' ওদের খুব প্রিয়। এ ভিন্ন ইতিহাসে ও অর্থনীতিতে ভূপেন দত্ত, সোপাল হালদার, ডাঙ্গ, রজনী পাণ্ডী দত্ত, রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদেরও কয়েকটি গ্রন্থ অম্বুদিত হয়েছে। সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একটি প্রচেষ্টা চলেছে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রধান প্রধান

রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার এবং এইজন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও ডাঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘ভারতের ইতিহাস’ সম্প্রতি অনূদিত হয়েছে।

মস্কো, লেনিন্‌গ্রাদ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাচ্যভাষা শিক্ষা-বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অল্প—শতকরা জনও নয়। তবে তাদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত প্রাচ্যভাষা শেখান হয় সেগুলো হল—সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, উর্দু, ফার্সী, বাংলা, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, ও মারাঠি। তবে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা—যথা, তামিল, তেলেগু, কানারী ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দেওয়া এখনও ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ ভিন্ন আদিবাসীদের ভাষা যেমন সাঁওতালী ও বিভিন্ন ট্রাইব্যাল ভাষা শিক্ষা এখনও এরা আরম্ভ করতে পারেনি। প্রাচ্যভাষা শিক্ষার পক্ষে এদের প্রধান অন্তরায় যে যাদের ভাষা তাদের কাছে এরা শিখতে পায় না। কলে এদের উচ্চারণে জড়তা থেকে যায়, কথাবার্তা হয়ে যায় বই বোবা; জনৈক অধ্যাপক এদের বাংলা কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে এরা তো কথাবার্তা বলেনা; এরা কথপোকথন করে!

অত্যন্ত অল্পসংয়ের মধ্যেও এরা এদের পাঠাগারকে মোটামুটি সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। লেনিন্‌ শাইবেরীতে ভারতীয় ভাষায় বইএর সংখ্যা ৪২০০। অধিকাংশ বই-ই অবশ্য ইতিহাসের উপর মূল দলিল-পত্রাদি সংক্রান্ত। মূল সাম্রাজ্যের উপর এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর তাদের যে দলিল পত্র সংগ্রহ তা আমাদের দ্রষ্টব্য জগায়। এর কিছুটা আভাস অধ্যাপক দিয়াফভ্‌ রচিত ভারতের জাতীয়তাবাদ বহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি নামক গ্রন্থের শেষে bibliography বা গ্রন্থপঞ্জী দেখলেই পাওয়া যাবে। হিন্দি, বাংলা, উর্দু সংগীত ও ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা দেওয়া অবশ্য এই বিভাগের অত্যাবশ্যক কর্ম নয়। তবুও, প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যচর্চা ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহিত করে প্রাচ্য দেশীয় নৃত্য, সঙ্গীত, ও শিল্পকলা শিক্ষায়।

ভারতের প্রতি সোভিয়েত বাসীর আগ্রহের দ্বিতীয় নিদর্শন তাদের ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় অর্থনীতি, ও ভারতীয় ইতিহাস চর্চার। ভারতীয়-

দর্শন সম্বন্ধে এদের প্রধান কাজ অবশ্য বুদ্ধ দর্শনের উপর। এ ভিন্ন জৈন, ও হিন্দু দর্শনের উপরও এদের কাজ আছে। এদের পাঠাগারে বেদ, উপনিষদ, পাতঞ্জলদর্শনও পাওয়া যায়। মক্কা থেকে ফেরা আবার জৈনক বন্ধু গল্প করছিলেন যে লেনিন লাইব্রেরীতে তিনি নাকি একবার পতঞ্জলির বই খুঁজেছিলেন। উহার লাইব্রেরীয়ান অত্যন্ত ছুখের সাথে জানান যে মাত্র তিন কপি বই তাদের ছিল, কিন্তু তিনটিই বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ, লাইব্রেরীতে এই সব বই ওরা কেবল সংগ্রহই করেনি, পড়েও বটে। কেবলমাত্র, মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় অর্থনীতি অধ্যয়ন করে এরকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছু'শের অধিক। আর ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে ২৫০এর অধিক ছাত্রছাত্রী। এ ভিন্ন একাদেমী অফ সায়েন্সেসও অনেক এরকম ছাত্রছাত্রী আছে। সোভিয়েতদেশে শিক্ষা পদ্ধতির অদ্ব্যতন বৈশিষ্ট্য যে ওখানে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ডিপ্লোমা বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী Candidato of Science পেতে হলে নিজস্ব রচনা দিতে হয়। এই প্রকার রচনা ১৫০ থেকে ১০০০পৃষ্ঠা পর্যন্ত হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের উপর যে টাইপকরা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা প্রতি বছরে ১০০ থেকে ৫০০। এর মধ্যে বাছাইকরা রচনাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এ ভিন্ন অধ্যাপকদের রচিত গ্রন্থও আছে। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক রেইসুনাব ও অধ্যাপক দিয়াকভ্।

ভারতের ইতিহাসকে সোভিয়েত ইতিহাসকারগণ মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগের ভিত্তি হোল উৎপাদন প্রথা।

(১) দাসপ্রথা—(সোলন্সকি রচিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বিভাজন জটব্য।)

(২) কিউডালবুগের প্রথম ভাগ (৬—১১শ শতাব্দী)

(৩) কিউডাল বুগের পরবর্তী ভাগ (১১শ—১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত)

(৪) ধনতন্ত্র

ধনতন্ত্রের গঠন ও ক্রমবিকাশকে আবার আরও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) ধনতন্ত্রের সূত্র (১৭শ—১৯শ শতাব্দী)

(খ) ১৯শ শতাব্দী—১ম মহাবুদ্ধ

(গ) ১৯১৮—বর্তমানকাল

—ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংকট।

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা মার্ক্সীয় পদ্ধতিতেই করেছেন। এখনও অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকের ধারণা যে ভারতের ইতিহাস নাকি শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম থেকে মুক্ত। এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যেও প্রবেশ করেছে তার প্রধান কারণ অভ্যস্ত দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ইতিহাসের উপর ভারতীয় মাস্কবাদীদের রচনা অভ্যস্ত নগ্ন। এবং সাধারণমাত্র মনকে সম্রাটের লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছে। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কতকগুলি থাকলেও প্রত্যেকদেশের ইতিহাসেরই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে, ভারতীয় ইতিহাস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বাইরে কোন নিছক খপচাড়া, আত্মগোঁড় নিয়ম মেনে চলে না। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনই সোভিয়েতে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার প্রথম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্বই নয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ নতুন উপাদানও জুগিয়েছেন, যে গুলার ব্যবহার ভারতীয় ঐতিহাসিকরা করেননি। বেহেরভাতকী, এল্‌দেনবুর্গ ইত্যাদির বৌদ্ধদর্শনের উপর আধিক্যের কথা বাদ দিয়ে কেবল দুটো নতুন উপাদানের কথা এখানে বলবো। এক, মিনায়েফ, সহকে আমরা জানি কেবল *Bibliotheca Buddhica* তে লেখা তাঁর কতগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ থেকে। সম্প্রতি তাঁর একটি আড়াইশো পৃষ্ঠার মত ডায়েরীও -আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা লেনিন্‌ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। দুই, যেমন ম্যালিন্‌স্কিইর (তাঁর কথা আগেই বলেছি) লেখা কোন বিবরণ আমরা পাইনি। কিন্তু গত শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে তাঁর এক বিবরণী উদ্ধার করা হয়েছে, এবং মস্কোর Archives এ সেটা রক্ষিত আছে। শীতার দি গ্রোটের প্রবন্ধের উপর ম্যালিন্‌স্কিইর ১৬ বৎসরের সাক্ষ্য বালক সেমেনেকের যে উক্তর তারই উপর ভিত্তি করে এই বিবরণী রচিত হয়েছে।

নীচে সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতীয় ইতিহাসের উপর মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের একটি তালিকা দিচ্ছি।

- (১) ভারতের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ ও ফিউডাল যুগ।
(মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ভারতের ইতিহাসের একটি পাঠ্যপুস্তক।
এর অপর অংশগুলো তৈরী হচ্ছে।)
- (২) পশ্চিম ভারতে কৃষিসমস্যা ও ১৯ শতকের কৃষক বিদ্রোহ--দিয়াকভ্
- (৩) ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রেরণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি
- (৪) ভারত—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে
- (৫) বালগঙ্গাধর তিলকের বিচার
- (৬) মুঘল সাম্রাজ্যের শেষার্ধ্ব ও তার গঠনবিদ্যাস (Composition)
—রেইসনার
- (৭) অস্পৃহাদের অবস্থা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি
- (৮) প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ভারতে শ্রমিক জাগরণ
- (৯) ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বাংলায় কৃতিগত শ্রেণীবিদ্যাস
(agricultural relations) এবং গ্রামের গঠন—কুমারত
- (১০) প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা
- (১১) আকবরের সময় (১৫৫৬—১৬০৫) মুঘল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ব
ও সামাজিক গঠন—আনতোনভা। এর অংশবিশেষ Isens (জুলাই ১৯৫৪)
এ অনুদিত হয়েছে।
- (১২) মিনায়েফের ডায়েরী—আর, এ, শোরোশেভ
- (১৩) “ইতিহাসের সমস্যা” academy of science এর একটি
পত্রিকা। ইহাতে নিয়মিতভাবে ভারতীয় ইতিহাসের উপর প্রবন্ধ বাহির হয়।
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ভারতীয় ইতিহাসের উপর একটি পত্রিকা
প্রকাশিত হয়।

(৫)

ভারতের ইতিহাসের সাথে মধ্যএশিয়ার ইতিহাসের যোগাযোগ অনবদী-
কার্য—বিশেষত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগে। সুতরাং মধ্য এশিয়া
সংক্রান্ত উজবেকীস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কথা ভারতের ইতিহাস
অলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সোভিয়েত আমলের গোড়ার দিকে একটি বিশেষ কমিটি সরকার নিযুক্ত
করেছিলেন। এর কাজ ছিল “মধ্য এশিয়ার রেনেসাঁ” অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার

মধ্য—যুগের সভ্যতার লুপ্ত স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে বার করা। এ ভিন্ন পরে আরও কয়েকটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্ভব হয়, তার কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করলাম।

(১) তাইমুরের আমলে সমরখন্দ নগরীর একটি নক্সা আবিষ্কার

(২) উলুঘবেগের বিখ্যাত 'পোলিস'লেন প্রাসাদ' আবিষ্কার

(৩) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পুরাতন khwarizm এর উপর অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম শতক থেকে ১০ম শতক (এদের সাল অল্পব্যাপী) পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের অনেক মনুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। এই স্মৃতিচিহ্নগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ khwarizm এর উপর কোন সিদ্ধি তথ্য নেই।

(৪) বুখারা মরুভূমির পশ্চিমপ্রান্তে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং আরও পাওয়া গেছে অনেক দিনের পুরানো কয়েকটি মনুমেন্টের অবশেষ। বুখারার দশম শতকের ঐতিহাসিক নারহামের বিবরণীতে এগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৫) এ ভিন্ন তারমেন্জ (আমুরদরিয়ার তীরে অবস্থিত, মধ্য এশিয়ার পুরাতনতম নগরী—এরও ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে গ্রেকো-ব্যাক্ট্রিয়ান আর্টেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

বর্তমানে উজবেকিস্তানে গবেষণা চলেছে পারস্যের শিল্পের সঙ্গে উজবেক শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপরে।

(৬)

উপরের প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে ভারত সম্বন্ধে রাশিয়া ও পরে সোভিয়েত দেশের আগ্রহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারত সম্বন্ধে ওদের এখনও অনেক কিছু জানবার আছে। ভারত সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। ওদের গবেষণার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হল উপযুক্ত মালমালার অভাব। রুশ পাঠাগারে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতির উপর যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হয়নি। এই দিক থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারগুলোর সাথে ওদের বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারগুলোর যদি সংযোগ-স্থাপন হয়, তাহলে উভয়পক্ষেরই সুবিধা।

ওদের তরফ থেকে ওয়া ওদের ইতিহাসের উপর মালমশলা আঘাতের পাঠাতে রাজী আছে এবং নিজেদের গবেষণা-লব্ধ গ্রন্থও পাঠাতে ইচ্ছুক। এই দিকে ইতিহাস পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—স্বাধীনভাবে তাদের তরফ থেকে যদি মূল্যপত্রাদি আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সোভিয়েত ইন্ডলজিষ্টদের কাজ আজও সম্যকরূপে আলোচিত হয়নি—একরকম অনাদৃতই পড়ে আছে। অধিকাংশ গ্রন্থ অসুদৃশ্য হয়নি। ইতিহাস পত্রিকার অসুতম আদি-পরিবর্তন ছিল বিদেশী ঐতিহাসিক সাহিত্য মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করা। ইতিহাস পত্রিকায় যদি এই রাশিয়ার ইন্ডলজির অসুবাদ ও আলোচনার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে, তবে সাধারণ পাঠক বড়ই উপকৃত হবে।

১

(বর্ষীয় ইতিহাস পরিষদের আলোচনা সভার পরিত)

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

বড় হুগ্ধ করিয়া বহিমস্ত্র একদিন বসিয়াছিলেন, “যে জাতির পুঙ্গু বাহ্যোন্নয়ন ঐতিহাসিক দৃষ্টি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরকার চেষ্টা পায়, হারাটলে পুনঃপ্রাণের চেষ্টা করে। বাঙ্গালী আজকাল বড় চাইতে চায়—হার! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক দৃষ্টি কই!”

যে সকল জাতি ভাগ্যদান তাহার ইতিহাসের মধ্য নিরাচর যন্ত্রণ উপলব্ধি করে “ত বিভিন্ন দেশ-কাল হইতে বিভিন্ন রসধারা আহরণ করিয়া আপনাদিগের ইতিহাসকে নিরবধি সজীবিত করে।” বাস্তব সত্তা ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে জড়িত, সমাজের সঙ্গে সমাজের মিলন ও মৈত্রী সাধনা ইতিহাসের মধ্য নিরাচর সম্পদ হয়। চর্চাপ্রাক্ষণ্যে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই।

ব্যক্তিগত সংস্কার, জাতিগত স্বার্থ ও ভাবগত আবেগের উর্ধ্বে উন্নয়ন প্রবর্তন এবং ও দৈর্ঘ্য লব্ধি ইতিহাসের তথ্য অন্বেষণ করা; নিরপেক্ষ, নির্মোহ ও অযত্নপূর্ণ আলোচনা ও তথ্য পরীক্ষা করা; মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যকে জনসাধারণের অঙ্গুরে প্রতিষ্ঠিত করা—এই তিনটি উদ্দেশ্য লব্ধি আচার্য্য শ্রীযুক্তনাথ সরকার মহাশয়ের পুস্তকোপলব্ধি এই পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদ বাংলাভাষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচনা, ঐতিহাসিক সমাজপ্রচার এবং ঐতিহাসিক সমস্ত সংক্রমে আলোচনার সুবিধা করিয়া জনসাধারণের মনে ইতিহাস বিষয়ে অল্পসংস্কৃত প্রভাব ছেঁদে। এতদ্ব্যতীত এই পরিষদ ঐতিহাসিক সংস্কার উৎসাহ কোণারূপে এবং সার্থক প্রবেশ্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করিতে যত্নবান হইবে। সমাজের সকল স্তরে বাংলাতে ঐতিহাসিক সচেতনতা কংকত হয় তাহার জন্য এই পরিষদ সর্ববিধ উপায় চেষ্টিত হইবে।

পরিষদ এবং ইহার যুগপৎ “ইতিহাস” পত্রিকা জাতিসংস্কৃতি-সম্প্রদায় নিকটস্থ বাংলা-ভাষাভাষী জনসাধারণের কণ্ঠ উন্মুক্ত থাকিবে। আলোচনা প্রবেশ্য বা রচনা কোন বিশেষ দেশ, সভ্যতা বা কালের গড়িতে আবদ্ধ রহিবে না। কোন বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন বা দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন পরিষদ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত।

যে মহান ত্রুট উপস্থাপনের ভার আমরা লইয়াছি তাহা সাধারণের অর্থ, সমর্থনা ও উৎসাহ ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। মাতৃভাষা এবং ইতিহাসের প্রতি বাহ্যিকের অল্পসংস্কৃত প্রভাব তাহার সকলকেই এই সমবেত সাধনায় যথাসাধ্য যোগ দিতে আহ্বান করা হইতেছে। যদি উদ্দেশ্য শুদ্ধ এবং সাধনা আনুষ্ঠানিক হয় তবে এই প্রয়াস সফল হইবে না।

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাগণের বার্ষিক টানা ১০০ জন টাকা মাত্র। ইতিহাসছাত্রী যে কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পারেন। সভাগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন। বাহ্যিক পরিষদের সভ্য নহেন তাহাদের পক্ষে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। স্থান, কলেজ, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারে।

টাকাভাড়া, চিঠিপত্র প্রভৃতি নিয়মিত টিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবাসের সের

৫-এ, বতিদাল বেহেজ রোড,

কলিকাতা-২২

শ্রীমুরেরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদিত)

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মসচিব)